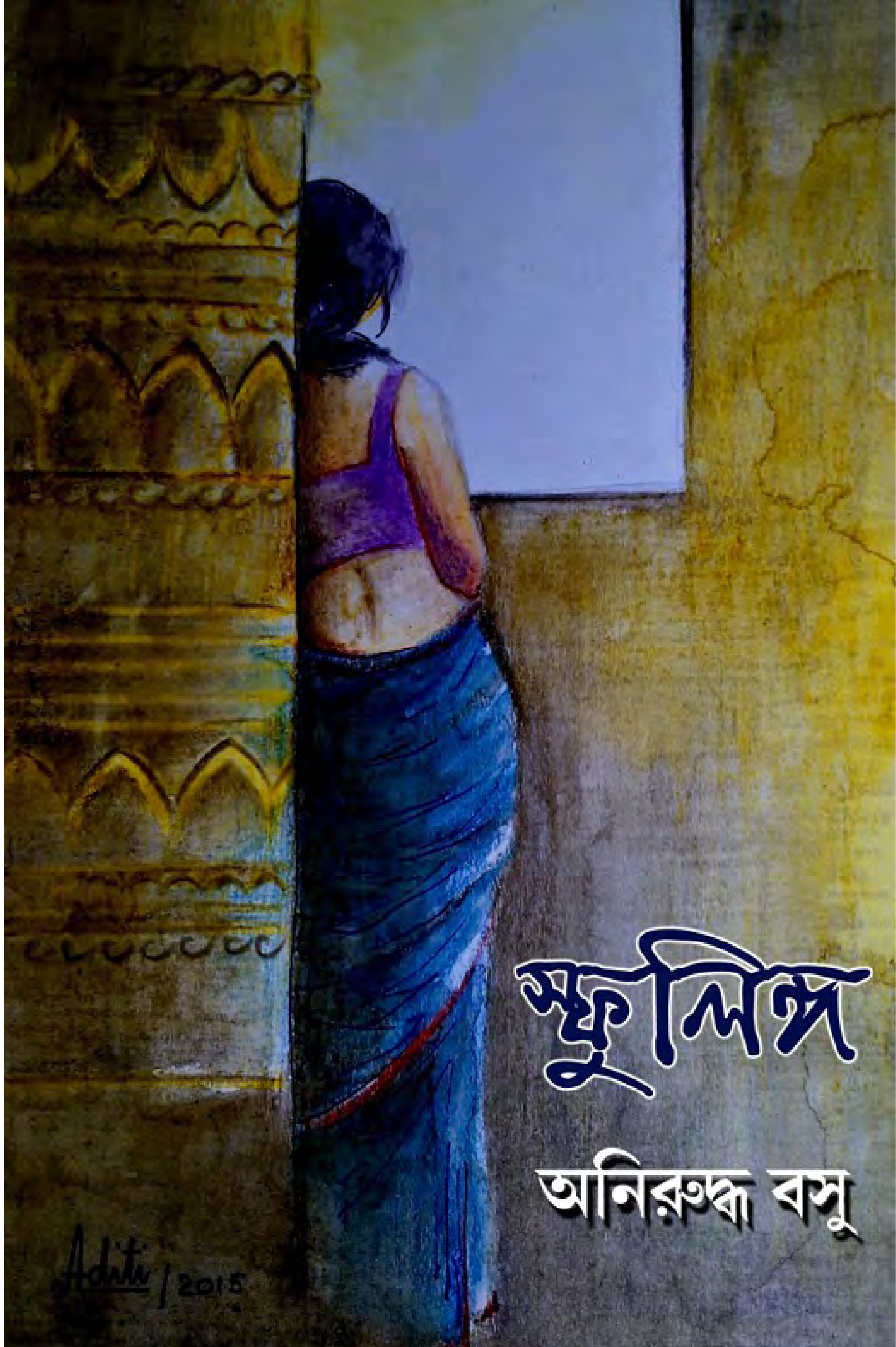

স্ফুলিঙ্গ
অনিরুদ্ধ বসু
Aditi / 2015


স্ফুলিঙ্গ
অনিরুদ্ধ বসু
Aditi / 2015

স্ফুলিঙ্গ

অনিরুদ্ধ বসু



স্মৃতি পাবলিশার্স

SFULINGA
A Bengali Novel by ANIRUDDHA BOSE
Published by **SMRITI PUBLISHERS**
Website : www.smritipublishers.com

প্রথম প্রকাশঃ সেপ্টেম্বর ২০১৫
প্রথম ই-বুক প্রকাশঃ সেপ্টেম্বর ২০১৫

প্রচ্ছদপটঃ অদিতি চক্রবর্তী
অলংকরণঃ স্বপন দত্ত
ISBN No : 978-93-82303-63-3

প্রকাশকঃ
স্মৃতি পাবলিশার্স
'ওয়েসিস' সি এফ - ৪১ সেক্টার ১
সল্ট লেক সিটি
কলকাতা ৭০০০৬৪

Table of Contents

আমার দাদা

স্বপন গুহ কে...

যাদের সহায়তা এই লেখাকে সমৃদ্ধ করেছে :

আশিস কুমার চট্টপাধ্যায়
অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়
শান্তনু চক্রবর্তী
স্বপন দাস

ভূমিকা

অনিরুদ্ধ বসুর নতুন উপন্যাসটির ভূমিকা লেখার আগে পাণ্ডুলিপিটি পড়ে শেষ করলাম। পাণ্ডুলিপিটি পড়ার সময় এবং পরে এক অদ্ভুত অনুভূতি হল। এক কথায় অনুভূতিটা বোঝানো যাবে না। বিরক্তি, রাগ, দুঃখ, হতাশা এবং আশা, সব কিছু আবেগের আঁচে আর যুক্তির ছুরিতে তালগোল পাকিয়ে গলার কাছে একটা অব্যক্ত কান্নার দলা হয়ে আটকে গেল।

সত্যি কথাগুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে রীতিমতো সাহস লাগে। সর্বক্ষেত্রে বাঙালির পিছিয়ে যাওয়াটা দুঃখের, কিন্তু ভয়ের নয়। সাময়িক পিছিয়ে পড়াটা জাগতিক নিয়মের মধ্যেই পড়ে। পিছিয়ে পড়লেও আবার এগোনো যায়, যদি ...

এই যদিটাই এক বিরাট প্রশ্নচিহ্ন। এই যদিটা যখন মানসিক ক্লীবত্বে পরিণত হয়, তখনই হয় ভয়। বাংলা এবং বাঙালির ভবিষ্যতের জন্য ভয়। মানসিক জড়তা জন্ম দেয় এক আশ্চর্য উন্নাসিক কূপমণ্ডুকত্ব। তার প্রধান লক্ষণ অতীতকে আঁকড়ে ধরে ভবিষ্যতকে অস্বীকার করা। 'এই বেশ ভালো আছি' মানসিকতা যখন মিশে যায় 'ওল্ড ইজ গোল্ড' আর 'আমি বা আমরাই শ্রেষ্ঠ' মনোভাবের সঙ্গে, তখনই ঘটে একটি ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ বা জাতির অবক্ষয়। তখন কেউ এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করলে তাকে প্রথমে উপেক্ষা, তারপর বিদ্রুপ এবং তারপর ছোট করার চেষ্টা করা হয়।

অনিরুদ্ধ বসু তার নতুন উপন্যাস **'স্ফুলিঙ্গ'**-তে এই কঠিন অপ্রিয় কাজটি করার চেষ্টা করেছে। কলা বা কৃষ্টি ক্ষেত্রে বাংলা ও বাঙালি যে ক্রমাগত পিছিয়েই যাচ্ছে, মধ্যমেধার রাজত্বে যে নতুন প্রতিভাকে অঙ্কুরেই বিনাশ করে দেওয়ার একটা ঘোর চক্রান্ত চলছে, অনিরুদ্ধ বসুর সাহসী কলমে তা উঠে এসেছে।

কিন্তু অনিরুদ্ধ বসু শুধু কালো রঙটাই দেখায়নি। ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন শ্মশানভূমি থেকে আলোর পাখি ফিনিক্সের উঠে আসার মতো তার উপন্যাসের প্রটাগনিস্টের লড়াই করে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার গল্পও শুনিয়েছে।

আজ অনিরুদ্ধ বসুর উপন্যাসটির ভূমিকা লিখতে বসে একটাই কামনা করছি, এই কাল্পনিক **'স্ফুলিঙ্গ'** সত্যের দাবানলে পরিণত হয়ে বাংলার কৃষ্টিজগতের পুঞ্জীভূত জঞ্জালে খাণ্ডবদহনের সৃষ্টি করুক, যাতে সেই পোড়ামাটির গর্ভ থেকে ফিনিক্সের মতো নতুন প্রজন্মের প্রতিভাশালী অঙ্কুরগুলি জন্মায় এবং কালক্রমে মহীরূহে পরিণত হয়।

দুর্গাপুর আশিস কুমার চট্টোপাধ্যায়
আগস্ট ২০১৫

অনিরুদ্ধ বসু সম্বন্ধে কিছু কথা...

অনিরুদ্ধ বসুর জন্ম ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৫৫, কলকাতায়। পেশায় প্রখ্যাত প্লাস্টিক সার্জন। লেখাটা তার নেশা। ২০০৬ সাল থেকে উপন্যাস লিখতে শুরু করেন।

প্রথম উপন্যাস **'অন্বেষণ'** আলোড়ন সৃষ্টি করে বাংলা সাহিত্য মহলে। ছুঁয়ে যায় আপামর বাঙালি মন। তথাকথিত উচ্চবিত্ত সমাজের পঙ্কিলতা ঘেঁটে আসল ঘরের অমোঘ সত্যটা গণিতের Venn Diagram Theory - র ওপর ভিত্তি করে মানুষের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হয়। পরে তার ইংরেজি ভাবান্তর **'Quest'** নামক উপন্যাসে প্রকাশিত হয়।

তার দ্বিতীয় উপন্যাস 'নিঃশব্দে' বর্তমান সমাজের বিরাট ক্যানভাসে আঁকা, আজকের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দোদুল্যমান খণ্ডিত সময়, পূর্ণতার আস্বাদ নিয়ে, এক সাধারণ মানুষের অসাধারণ জীবনদর্শনের উপাখ্যান। শুধু বহুদিন ধরে বেস্টসেলারই হয়নি, লন্ডন বুক ফেয়ারে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন হিসেবে বিশেষ সাক্ষর রাখে।

তৃতীয় লিরিক্যাল উপন্যাস **'দেখা'** তার পৃথিবী পরিক্রমা ও জীবন দর্শনের এক নিভৃত আরাধনা। পশ্চিম দেখছে পুবের জাগতিক দৈন্যের পিছনের এক বিশাল ঐতিহ্যকে। নাকি পুব দেখছে পশ্চিমের বৈভবের আড়ালে এক অনন্ত হাহাকারকে? কী ভাবে দেখছে? অণুবীক্ষণে না দূরবীক্ষণে? না কী, বিহঙ্গ দৃষ্টিতে! এই উপন্যাসও বেস্টসেলারের খাতায় নাম লেখায়। উপন্যাসটি ইংরেজিতে প্রকাশিত হয় **'The Vision'** নাম নিয়ে।

সে বারবার তার রচনাশৈলী ও চিন্তাধারাকে সাজাতে চায় নতুন আঙ্গিকে, নতুন দর্শনের বিন্যাসে।

যার ফলস্বরূপ তার চতুর্থ চাঞ্চল্যকর খুনের উপন্যাস **'চক্র'** প্রচলিত দেশি ও বিদেশি প্রথার বেড়া ভেঙে পরিবর্তন এনেছে মৌলিক চিন্তাধারায়। যুক্তি বিদ্যা ও আধুনিক প্রযুক্তি বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে এক নতুন আঙ্গিকের রহস্য কাহিনি, যা খুন এবং খুনির বিবর্তন ঘটিয়েছে এই উপন্যাসটিতে। এটিও বেস্টসেলারের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যা পরে ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়েছে **'Fulcrum'** নাম নিয়ে।

পঞ্চম উপন্যাস **'তোমাকে...'** - তে একটি গূঢ় বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে উপস্থাপনা করেছে প্রেমের ছন্দোময় পত্র-উপন্যাসে। নামহীন দুজন মানব মানবী, আধুনিক জীবনের গোলোকধাঁধায় কানামাছি খেলতে খেলতে কখন পৌঁছে যায় সময়ের অন্দরমহলে, যেখানে সময় হয়ে ওঠে উল্লম্ব, নিয়ে যায় তাদের তুরীয় লোকে। আগের মতোই বেস্টসেলারের তালিকায় এটিও অন্তর্ভুক্ত হয়। পরে তা প্রকাশিত হয় ইংরেজি উপন্যাস **'The Moment'** নামে।

ষষ্ঠ বাংলা উপন্যাস **'ক্যানভাসে'** মানব চরিত্রের রং-এর খেলা। প্রিজমের মধ্য দিয়ে চলা সাদা আলোর রঙিন বর্ণালীর মতো প্রতিটি মানুষের চরিত্রই নানা রং-এর। কখনো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে একটি বিশেষ রং, আর কখনো বা ঝলসে ওঠে অন্য কোন রং, আসলে সবই তো সেই জীবন নামক প্রিজমের খেলা। একই জন, বিভিন্ন প্রকাশ। কেন্দ্রীয় চরিত্র নন্দিনী জীবনকে প্রীজম দিয়ে নানা রঙে ভেঙে অবশেষে পৌঁছে যায় রঙের ওপারে ...

তার প্রথম স্বরচিত ইংরেজি ইন্টারন্যাশনল অ্যাড্রিনালিন চার্জড থ্রিলার **'Pursuit'** এক অনন্য চিন্তাশৈলীর উদাহরণ। অনেক রহস্যময় মৃত্যুর ফাঁকে উঠে আসে বর্তমান জগতের কঠিন জিও-ইকনমিক্স। আর নিভৃতে ফল্গুধারার মতো ব্যাকগ্রাউন্ড মিউসিকের মতো বেজে চলে বিশ্বশান্তির অমৃতবাণী। উঠে আসে মানুষের উত্তরণের অমোঘ মন্ত্র, যা পরিণতি পায় তার আগামী ইংরেজি উপন্যাসে।

প্রতিটা লেখায় সে নিজেকে ভেঙে, নতুন ছাঁচে সাজাবার চেষ্টা করে। নিজেকে নতুন নতুন ভাবে প্রকাশ করার মধ্যেই তার সৃষ্টির তৃপ্তি। জীবনের শান্তি খুঁজে পায় স্ত্রী স্মৃতি বসুর মধ্যে।

এক

"ফিফটি-ফিফটি"

একটা পথ, অন্যটা রথ। রথে চড়তে গেলে, পথকে তো সাথি করতেই হবে। রথ তো আজকের এম্পায়ারে তাকে রানির আসনে বসিয়ে দিতে পারে। তা বলে পথকে ফিফটি পারসেন্ট? তার থেকে টুয়েন্টি-এইট্টি কিংবা থারটি-সেভেন্টি হলে ঠিক হত না? দেওয়ালি ভাবল, রথের থেকে পথের দাম বেশি হয়ে যাচ্ছে না তো? রথে চেপে বিজয়ের পথে হাঁটতে গেলে, ভেদাভেদ না করেই এগোতে হবে, এটা দেওয়ালির জানা।

"বালিতে এক উইক। চার দিন শোভন রায়চৌধুরির সঙ্গে। তিনদিন আমার সঙ্গে" কোনও রকম ভণিতা না করেই বলল দিগ্বিজয় ভট্টাচার্য।

মিডিয়া জগতের সেলিব্রিটি দিগ্বিজয় উপলক্ষ মাত্র। শোভন রায়চৌধুরিই আসল। ম্যাগনো ইন্ডিয়ার কর্ণধার বলে নয়। আসলে ম্যাগনো ইন্ডিয়া চালায় ওর দাদা পুরুষোত্তম রায়চৌধুরি। সেই বিশাল সাম্রাজ্যের অকর্মণ্য ওয়ারিশ শোভন এখন বাঙালি কৃষ্টির কর্ণধার হয়ে 'নারী উত্তমে' ভূষিত হতে চাইছে। হয়ত কালেদিনে 'বঙ্গোত্তম'-ও জুটে যেতে পারে, ঠিক মতো তদবির করতে পারলে। না... না... না... নিজের প্রতিভার ব্যাপ্তিতে নয়। ওর দাদার 'পাঁচ মেশালি অধ্যবসায়'-এ, বাঙালি সংস্কৃতির দিকপালরা ওর হরির লুঠের অর্থ গিলতে, ক্রীতদাসে রূপান্তরিত হয়েছে। সেই হরির লুঠ থেকে দেওয়ালিও বঞ্চিত হবে না, সে জানে।

মৃদু স্বরে কিছুটা আমতা করে, শ্যামলা চোখ মেলে, ভ্রুটাকে ওপরে তুলে বলল "কত?"

"যাওয়া থাকা আনন্দ ফুর্তি সব অন দ্য হাউস। প্লাস দু লাখ টাকা দিনে" দিগ্বিজয় উত্তর দিল।

মানে সাতদিনে চোদ্দ। একটা বাংলা সিনেমায় উদয়াস্ত পরিশ্রম করে দেওয়ালি এর ধারে কাছেও পৌঁছতে পারে না। নামেই হিরোইন। পয়সার ব্যাপারে লবডঙ্কা। ওই 'হিরোইন' তকমাটা আছে বলেই তো এত টাকার জোগান, এত ফরেন ট্রিপ। রোজগারের বাজারে নামলে কী বাছ বিচার করা চলে? এটাও তো এন্টারটেনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি। তফাতটা শুধু নামের - পাবলিক, না প্রাইভেটে এন্টারটেনমেন্ট। এর কী কোনও রূপ আছে? পাবলিক অর প্রাইভেট? যেখান থেকে টাকা আসছে, সেটাই আজকের এন্টারটেনমেন্ট-এর ব্যাখ্যা। স্বার্থক বিনোদন।

"কবে?"

"নেক্সট উইকে এনি শুটিং শিডিউল?"

মোবাইলের অ্যাজেন্ডা হাতড়ে দেওয়ালির নাঃ... ফ্রি। কয়েকটা ফিতে কাটা ছাড়া... সেটাও ইজিলি ক্যান্সেল করে করে দেওয়া যায়। তার কম্পেনসেশন... না।

"কত?"

"তিনটে ফিতে কাটা মানে সেভেন্টি ফাইভ..."

"ঠিক আছে। শোভনকে বলব, আরও এক লাখ এক্সট্রা দিতে। তাহলে কনফার্মড?"

মাথা না নেড়ে কী কোনও উপায় আছে? 'না' হলে এই ইন্ডাস্ট্রিতে টিকে থাকতে পারবে না। শোভনের অর্থজালে রাঘববোয়াল থেকে চুনোপুঁটি - সবাই বসে আছে। এই চক্রব্যূহ ছেড়ে পালাবে কোথায়?

"আমরা তিনজন, না অন্য কেউ আছে?" সন্দেহ নিয়ে দেওয়ালি প্রশ্ন করল। বলা যায় না তো। এরা আবার কাকে ভিড়িয়ে নেবে!

ভারতের বাইরে বালির সমুদ্রতটে কে কী করছে, সে খবর বাংলায় চট করে কেউ রাখে না। সঙ্গে অন্য কেউ থাকলে আবার মুস্কিল। ইন্ডাস্ট্রিতে গসিপ ছড়াতে দেরি হবে না। চেনা দুনিয়ার বাইরে অলক্ষ্যে কে কী করে বেড়াচ্ছে, সে খবর রাখতে না-পারলেও, একটা মসলা পেলে তাকে রং চড়িয়ে ফলাও করে গল্প ফাঁদার লোকের অভাব নেই। কম্পিটিশনের বাজার। কাদা ছিটিয়ে, নিজের লাইন ফিট করে নেওয়ার মতো 'বন্ধু' তো কম নেই! ছোট হলেও, এই দুনিয়ায় তার তো একটা ইমেজ আছে। সেটা যাতে কেউ এক্সপ্লয়েট করে ফায়াদা না লুটতে পারে, তাই সাবধান।

"না... না... আমরা তিনজনই। আসলে বালির উদয়ন ক্রিকেট ক্লাবের অ্যাডভাইসর হিসেবে ওরা আমায় ডেকেছে। মিটিং অ্যাটেন্ড করতে যাচ্ছি। ওখানে যখন ব্যস্ত থাকব, শোভন তোমায় কম্প্যানি দেবে" দিগ্বিজয় আশ্বাস দিয়ে বলল।

"একেবারে সচিন থেকে উদয়ন!" দেওয়ালি মুচকি হাসল।

"প্রাচীন থেকে নবীন" মুখের কোণে শুকনো হাসি। চোখ দুটো অপলক, স্থির, শীতল। ওই চোখের দিকে তাকালেই দেওয়ালির অস্বস্তি হয়। একটু বেফাঁস হলেই চোখটা সাপের মতো ছোবল মারবে। মানুষ দিগ্বিজয় চোখের মধ্যেই নিজেকে জানান দেয়।

দেওয়ালি-ই শুধু ওর আসল রূপটা দেখতে চায় না। দুধ কলা একত্র হয়ে ধান্দার তাগিদে সমুদ্রতটে কিছুদিন কাটানো যায় বটে, ওর ছোবল থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে। তবে ওই পর্যন্তই। রথে চড়তে গেলে, পথের ওপর দিয়েই তো যেতে হবে। পথের ধারে চাটাইয়ে শুয়ে পড়লে তো আর রথে চড়া হবে না।

টলি ক্লাবে দিগ্বিজয়ের সঙ্গে লাঞ্চ সেরে আর সময় নষ্ট করল না দেওয়ালি। বালিতে নয় অনেক রাতের ঘুম যাবে, কিংবা ক্ষেত্র বিশেষে না-ও হতে পারে। কিন্তু এখনকার ঘুমটাকে মাটি করতে চায় না। শুটিং থাকলে তো বড় একটা ঘুমের সুযোগ হয় না। গলফ রোডের ঘরে এসি চালিয়ে তার সাদা স্ল্যাক্স, লাল টপসটা ছুড়ে দিল ক্লোজেটে। জি স্ট্রিংস আর ব্রা। খাটের দিকে এগোতে গিয়ে চোখ গেল শ্যামলা তন্বী দেহটার দিকে।

টিপিক্যাল বাংলা টাচ। খুব কী পাল্টেছে?

যখন সাইন্স কলেজে কেমিস্ট্রি পড়ত, বয়স আরও কম ছিল। অনেক বেশি ছিপছিপে। নদীয়া থেকে আসা শ্যামলা রং-এর মেয়েটি যে কাউকে খুব আকৃষ্ট করতে পেরেছিল, এমনও নয়। কাজল কালো চোখ দিয়ে অন্য মেয়েদের দেখত, বয়ফ্রেন্ডের মোটর বাইকে চেপে হুস করে বেরিয়ে যেতে। শিথিল পায়ে বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকত। কখন বাস আসবে। ঠেলাঠেলি, গুঁতোগুঁতি করে লেডিস সিটটা ম্যানেজ করতে পারলে নিশ্চিন্তি। হস্টেলে ফিরে ক্লান্ত ঘেমো গা'টাকে শাওয়ারে চুবিয়ে ফ্যানের তলায় বসতে পারলেই একটু সোয়াস্তি। উইকএন্ডে বাবা-মাকে দেখতে যাওয়া। কষ্ট থাকলেও, সামনে একটা স্বপ্ন ছিল। না... না... - তারকা হওয়ার নয়। ভাল ছাত্রী হওয়ার। শুধু টাকা রোজগার করার নয়, প্রকৃত মানুষ হওয়ার।

আজ বিছানায় গা এলিয়ে দিতেই মোবাইলটা বেজে উঠল। সিএলআই-তে নামটা দেখেই চমক। এতদিন পর রাজাদিত্য!

নিঃস্পৃহ গলায় "হ্যালো"

"কেমন আছ?"

"ঠিকই আছি" দেওয়ালি সংক্ষিপ্ত। রাজা নিশ্চয়ই এই ভর দুপুরে কুশল জানতে ফোন করেনি। কারণটা কী!

"কোথায় আছ? শুটিং?"

"নাঃ... ঘুমোতে যাব"

"এই ভর দুপুরে!"

"অফ টাইমে না তো কখন!" বাঁ হাতটা আপন মনে নাভির চারপাশে বোলাতে বোলাতে জবাব দিল।

এবার আর কোনও ভণিতা না করেই রাজাদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায় বলল "তোমার সঙ্গে একটু দরকার ছিল..."

"বল" দেওয়ালির বাঁ হাতটা অভ্যাসবশত জি স্ট্রিং-এর মধ্যে খেলতে লাগল। একা থাকলেই নিম্নাঙ্গ নিয়ে খেলার সূক্ষ্মতা রপ্ত করে ফেলেছে।

"দেখা হলে ভাল হত"

"এ উইকে শুটিং-এর ডেটস আছে। নেক্সট উইকে দেশের বাইরে"

"একদিনও কী সময় করতে পারবে না?"

"এখন হবে না। বরং ফিরে তার পরের উইকে জানাব"

"বেশ... তাই..."

সময়ের সঙ্গে অনেক কিছুই না পাল্টে যায়। আজ দেওয়ালি স্বপ্নের সিঁড়ি বেয়ে ওঠার চেষ্টা করছে রাজ সিংহাসনে বসতে। আর রাজাদিত্য অতীতের ঝাঁপি নিয়ে আজ দেওয়ালিকে বাঁধতে চাইছে। যখন চলমান জীবনটা ধীরে ধীরে বর্তমানের শূন্যতায় ডুব দেয়, তখন ফেলে আসা অতীতকে কেন বারবার ফিরিয়ে আনা।

খেলতে খেলতে কখন যে তলাটা ভিজে গেছে, খেয়ালই করেনি। এই সোয়াস্তি ঘুমে বেশ সাহায্য করবে। অন্য কেউ থাকলে ঘুমটা ঠিক মতো হয় না। নিজের ঘরে, নিজের বিছানায় আনায়াসেই নিজের মতো ঘুমিয়ে পড়া যায়। পৌঁছনো যায় স্বপ্নের সেন্টার স্টেজে।

বেশ কয়েকদিন ধরে একটা স্বপ্ন ঘুমের ঘোরে বারবার ফিরে আসছে। কখনও তেমন গুরুত্ব দেয়নি, কিন্তু স্বপ্নের টুকরোগুলো কেমন যেন। একটা অন্ধকার গুহার মধ্যে সে একা দাঁড়িয়ে, গাঢ় অন্ধকারে। কোথাও এক ফোঁটা আলো নেই। সে পথ খুঁজছে বেরবার। কোনও পথ নেই! ক্রমশ সেই গুহার পাথরগুলো সরে যাচ্ছে। তার মধ্যে ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে অথচ চোরাবালি নয়! নীচে জ্বলছে অগ্নিপিণ্ড। তা থেকে উল্কার মতো স্ফুলিঙ্গ ছিটকে আসছে। তারপরই... ঘুমটা ভেঙে যায়। আজও আচমকা সেভাবেই ছিটকে উঠল নিজে।

অন্ধকারের মধ্যে ফ্যালফ্যাল করে সিলিঙের দিকে চেয়ে। কোথায় যেন একটা তীব্র যন্ত্রণা পরিত্রাণ খুঁজছে এত পাওয়ার মধ্যেও। তৃপ্তির মধ্যে অতৃপ্তিটা কোথায় জানে না দেওয়ালি। সামনে জীবন্ত তারার মেলা

হাতছানি দিচ্ছে। আর কয়েকটা ধাপ পেরলেই তো সাকসেসের গোল্ডেন ক্রাউন। যার মোহে তার চারপাশের চরিত্রগুলো সকাল থেকে সন্ধে পাগলের মতো ছুটছে একটু লাইমলাইটের নেশায়। তবু কেন নাছোড়বান্দা স্বপ্নটা সময় পেলেই গ্রাস করতে চায়!

আর অন্ধকার নয়।

বেড সুইচটা অন করতেই বেডরুমে একটা মায়াময় পরিবেশ। এর থেকে বেশি আলোর কী কোনও প্রয়োজন আছে? এই আলো আঁধারির খেলা বেশ মোহময়। একটু শীত করছে। এতক্ষণ এসি চলছে, ঘরটা ঠান্ডা। এসিটাকে অফ করে মিউট মোবাইলটা নিয়ে মিসড কলগুলো স্ক্যান করতে লাগল।

প্রচুর! পরে দেখা যাবে।

বেডসাইড টেবিলে রাখা প্যাকেট থেকে সিগারেট ধরাল। এই আলো-আঁধারির মধ্যে কোনও কৃত্রিমতা নেই। তার জীবনটাও তো ডাঃ জেকিল আর মিঃ হাইডের মতো ডুয়ালিটিতে ভরা। আলোর রোশনাইয়ে সে উজ্জ্বল তারকা। আবার একই মানুষ অন্ধকারের আস্তিনে পা ফাঁক করা লাখ টাকার এসকর্ট। নিজের অস্তিত্বটা চারপাশের মতোই মোহময়। হিপক্রিসির মনুমেন্টে বসে নিজেকে সাজাচ্ছে নানা আভরণে।

একা ঘরের এই শ্যাডোয়ি অ্যাটমসফিয়ারে তার সেমি-ন্যুড প্রোফাইল অনেক বেশি ন্যাচারাল। শ্যামলা দেহটাই যেখানে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু নয়, সেখানে সে অনেক বেশি স্বাভাবিক। যেমন ছিল ছোটবেলায় তার সাহিত্য পরিষদ স্ট্রিটের ভাড়া বাড়িতে।

নামটা বাবা-মা-ই রেখেছিল দেওয়ালি। কালীপুজোর দিনে জন্ম, তাই। দিয়া হয়ে জ্বললেও দেওয়ালির ফুলঝুরির মতো মনে স্বপ্ন ভাসত একদিন রোশনাই হওয়ার। হাজার আলোর মাঝে নক্ষত্র হয়ে... আলোর বন্যায় ভরিয়ে দিতে নিজেকে।

বাবার কাছে শুনেছে, তাদের আদি ভিটে বাংলাদেশের ফরিদপুরে। সেই একাত্তরে যখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হল, বাবা-মা ভিটেমাটি ছেড়ে পেট্রাপোল পার হয়ে পালিয়ে আসে কলকাতায়। তারপর বাঘাযতীনের উদ্বাস্তু কলোনি থেকে ঠাই করে নেয় মহানগরীতে। যদিও দেওয়ালির শিক্ষায় কোনও খামতি রাখেনি। অনেক স্কলারশিপ পেয়েছিল। লরেটো বউবাজার থেকে ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট করায় বিদ্যাসাগর কলেজে কেমিস্ট্রিতে অনার্স।

কাজের তাগিদে বাবাকে চলে যেতে হয় নদীয়ায়। দেওয়ালিকে সল্ট লেকের সুইমিং পুলের পাশে একটা পিজি অ্যাকমডেশনে রেখে। খোলামেলা জায়গায় শহরের ঘিঞ্জির বাইরে কিছুটা হলেও প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যেতে পারত। হয়ত স্কুপ বা গঙ্গোত্রীতে বসে কারও সঙ্গে আড্ডা মারেনি, তবুও একাকী জীবনে ঘরে বসেই দেখত, উলটো দিকের মাঠে, অন্যরা বয়ফ্রেন্ড নিয়ে ফুচকা, ভেলপুরি খাচ্ছে। ওই মডার্ন ছেলেমেয়েদের অনাড়ম্বর শ্যামলা তন্বী দেওয়ালির দিকে ফিরে তাকানোর সময়ও ছিল না। তাই একা পিজি অ্যাকমডেশনে আর পাঁচটা মেয়ের মতো আরেকটা স্বভাবিক অনাড়ম্বর জীবন।

ওই কাজল কালো চোখ দুটোর মাদকতাকে বোঝবার মতো কোনও পুরুষ সামনে এসে দাঁড়ায়নি। নিবিড় হয়ে বলেনি 'তোমাকে চাই'। নারীত্বের সংজ্ঞাটা মিশে গেছিল না-পাওয়ার দাবি মেটাতে।

তবুও 'আজকের ভালবাসা'-র মায়াবী অন্ধকার ভেদ করে মোবাইলটা বেজে উঠল। এবারে রণদীপ।

"চক্কর কেয়া হ্যয়? দিনভর বহতবার ফোন কিয়া, ফোন রিসিভ নেহি কি?" বিরক্তিটা স্পষ্ট।

"সো গয়া থা" আমতা আমতা উত্তর।

"আজ কেয়া শুটিং নেহি হ্যয়?"

"নেহি। আজ হলিডে"

"ফির তো সাম মে আর রহে হ?"

"কাহাঁ?"

"জার্মান কনসলেট কে পার্টি মে..."

ভুলেই গেছিল, সন্ধেবেলা জার্মান কনসলেটে পার্টি। কার্টসি রণদীপ ভুটোরিয়া। সোশালাইট। প্রায়শই এরকম কনসলেটের পার্টিতে দলবল নিয়ে উপস্থিত হয়। নিজেও আইটিসি সোনার থেকে হায়াত রিজেন্সি অথবা তাজে রেগুলার পার্টি চলে। সেখানে কেউকেটাদের ছড়াছড়ি। লোকটার যে কীসের ব্যবসা কে জানে। কী একটা ট্রাস্ট আছে। আগে দেওয়ালির এসব জায়গায় ডাক পড়ত না। ইদানীং দেখা যাচ্ছে, প্রায়ই ডাক পড়ছে। বোধহয় র‍্যাট রেসে জাতে উঠছে। এসব পার্টিতে থাকা মানেই কলকাতায় স্ট্যাটাস সিম্বল। যদিও শুনেছে, পরখ করার দুর্ভাগ্য হয়নি। এই স্ট্যাটাসের অন্তরালে পার্টিগুলো মানেই, কলকাতার উঁচু মহলের রাতের সঙ্গী নির্বাচনের স্বয়ম্বর সভা।

বিয়ে তো এখনও হয়নি। আপাতত করার ইচ্ছেও নেই। তবে মাঝেমাঝে স্বয়ম্বর সভায় বসে লাভটাই বা কী? একা ঘরে, পা ফাঁক করে শুয়ে নিজেকে নিয়ে খেলা করার মধ্যে আত্মতৃপ্তি থাকতে পারে, কিন্তু সোয়াস্তি ছাড়া মালকড়ি নেই। কলকাতার হোমরাচোমরাদের দামি ফ্ল্যাটে রাত কাটালে অনেক, অনেক, অনেক বেশি...

আত্মতৃপ্তির কোন জায়াগাই নেই। যদি না, অর্থটা মাপকাঠি হয়।

"ভুল গয়া থা। ওকে... আই উইল বি দেয়ার বাই এইট থার্টি টু নাইন"

"পসিটিভ" ফোনটা কেটে দিল রণদীপ ভুটোরিয়া।

শেষের শব্দটার মধ্যে আবেদনের থেকে হুকুমের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত। 'সেলিব্রিটি'-র রাজমুকুট পড়তে গেলে এমন অনেক হুকুমের দাস হতে হয়। এক সময় চুনমুনদি থেকে অনুশ্রীদি অনেক করেছে। শুনেছে, অনুশ্রীদি এই করে তদানীন্তন পুলিশ কমিশনারের কাছ থেকে সানি পার্কে একটা ফ্ল্যাটও বাগিয়ে নিয়েছে। সো-বিজ দুনিয়ায় মধ্য গগনে বিরাজ করা পদ্মপর্ণাদি, এখনও প্রদীপ গোয়েঙ্কার মিস্ট্রেস। দেওয়ালি কোন ছাড়... বিকিকিনির বাজারে, মধ্যরাতের 'ভালবাসা'র কী কোনও অভাব?

ফোনটা কেটে দেওয়ালির মনে হল, কোনটা ভাল জীবন? কেমিস্ট্রি মাস্টার্সে গোল্ড মেডেল পাওয়ার পরে পিএইচডি-তে ঢুকে, স্বামী বাচ্চা নিয়ে ঘর সংসার করে আর পাঁচটা মেয়ের মতো নর্মাল জীবন কাটিয়ে দেওয়া, নাকি খ্যাতির সপ্তম স্বর্গে রাজরানি হয়ে থাকতে গিয়ে অলিখিত স্লেভারি?

এখন ভেবে আর কী হবে? ভাগ্য যে পথ বেঁধে দিয়েছে, সেই পথেই চলতে হবে। দেওয়ালি আর পেছন ফিরে তাকাতে চায় না। পেছনের দিকে হাঁটতে গেলে, পিছিয়ে পড়া ছাড়া আর কিছুই হয় না। তার থেকে, সামনের দিকে তাকানোই শ্রেয়। ফর গুড অর ফর ওয়ার্স। ঈশ্বরের দেখানো পথে বাধা দিতে গেলে অশান্তি ছাড়া আর কিছুই জুটবে না। যেমন রাজাদিত্য। হঠাৎ এতদিন পর ফোন করল কেন?

দেওয়ালি যে আর পেছনে হাঁটতে চায় না। রাজা অতীত। আজ রণদীপ ভুটোরিয়া কিংবা দিগ্বিজয় ভট্টাচার্য বা শোভন রায়চৌধুরি। ওরাই বাংলা কৃষ্টির ধ্বজাধারী। আর সবার মতো ওই পথেই হাঁটতে চায় দেওয়ালি। অত ভাবার সময় নেই, শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে ঠেকবে। ইট ইজ বেটার টু লিভ ফর টুডে, দ্যান থিংক অ্যাবাউট টুমরো।

আলো-আঁধারি ঘরে বাড়তি আলো না জ্বালিয়ে, পর্দাটা খুলে দিল। বাইরে, নতুন সাজে সাঁঝের কলকাতার সারি সারি ত্রিফলা আলোর রোশনাই হাতছানি দিচ্ছে। এই শহর তাকে চুম্বকের মতো টানে। উপেক্ষিত শান্ত স্নিগ্ধ রূপমাধুর্য, তন্বী শ্যামলা দেহের অনাবিষ্কৃত যৌবন পাখনা মেলে ভেসে বেড়াতে চায় কলকাতার আকাশে বাতাসে, দিনে রাত্রে, রূপকথার পরি হয়ে...

সব কিছুই তো তার ভবিতব্যের নিয়মে চলেছে, কেবল আসল স্ফুলিঙ্গটা ছাড়া।

দুই

"আর কদ্দিন ফেলে রাখবেন অঞ্জনদা?"

ম্যাগনো ইন্ডিয়ার সল্ট লেক সেক্টর ফাইভের অফিসে অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে কফিটা এগিয়ে দিয়ে বলল শোভন রায়চৌধুরি।

ঝাঁ চকচকে অফিসের ঘরটা কাঠের প্যানেলে মোড়া। মেহগনি টিকের ডেস্ক ছাড়িয়ে ওপাশে একটা ছোট্ট লাউঞ্জ। ওধারে বাথরুম। ডেস্কে ফাইলপত্র না থাকলেও অত্যাধুনিক কম্পিউটার। লাগোয়া অ্যানেক্সে একটি বোর্ড রুম। বাইরে, সুন্দরী মহিলারা কম্পিউটারে বসে টাইপ করে যাচ্ছে। এরা কেউই ম্যাগনো ইন্ডিয়ার প্রকৃত কর্মী নয়। এরা শোভনের সংস্কৃতি ব্যাপ্তির সহায়ক। তার নামের সৃষ্টিকে জনসমক্ষে পৌঁছে দেওয়ার জন্য মাইনে করা কর্মচারী। এদের কাছে অঞ্জনবাবুর পরিচয় 'অঞ্জন স্যার' - শোভনের সাহিত্য বিন্যাসের মুল কান্ডারি।

যখন কলকাতার রথী-মহারথীদের নীচের তলার বিশাল ব্যাঙ্কয়েট হলে লাঞ্চে ডাকা হয়, কিংবা অঞ্জন স্যারের লেখা, শোভনের নামে প্রকাশিত বই-এর ঘটা করে ওপেনিং হয়, এরাই অতিথি আপ্যায়ন থেকে বইয়ের উন্মোচন, যাবতীয় কাজ, মুখে হাসি ছড়িয়ে করে। পেছনে সেই হাসিটা তির্যক হলেও, সামনে কিন্তু এরা উজ্জ্বল বিনম্র। তথাকথিত 'জ্ঞানীগুণী' ব্যক্তিদের আতিথ্যে সদা তৎপর। এরাই শোভনের সংস্কৃতি বিন্যাসের নেপথ্যে ম্যাগনো ব্রিগেড।

দু-ভাইয়ের বেশ কিছুদিন ধরেই ফলাও কারবার। ম্যাগনো ইন্ডিয়ার দুর্বার বৃহত্তর ব্যাপ্তির নেশায়, সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য, উচ্চপদস্থ শিক্ষিত সম্প্রদায়কে হাতে রাখতে হয়। তাই পুরুষোত্তম রায়চৌধুরি ওদের চাকরিতে শামিল করতে এতটা ব্যস্ত। রিটায়ার্ড উচ্চপদস্থ আমলারা অরগ্যানাইজেশনের সঙ্গে যুক্ত থাকলে এক্সপ্যানশনে অনেক সুবিধে। ছোটভাই শোভন তখন ম্যাগনো ইন্ডিয়া নিয়ে সময় নষ্ট না করে, কলকাতার সাংস্কৃতিক ব্রিগেড নিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠায় মশগুল। লোকে নয় পুরুষোত্তমকে চিনুক তার কর্মদক্ষতার জন্য, শোভনকেও লোকে চেনে, এই সংস্থার ঔদার্যের জন্য। পার্টি হোক, কি সুন্দরী নায়িকা থেকে গায়িকা, কেউ বলবে না, শোভনের দিল নেই। খোস মেজাজে দিলখুশ হয়ে, ম্যাগনোর ম্যাগনাম অ্যামাউন্ট উদার হস্তে বিলোতে কার্পণ্যই করে না।

অস্তিত্ব সঙ্কট?

মধু না ছেটালে কি মৌমাছি আসবে?

"লিখছি তো বেশ কিছুদিন ধরে। লিখতে গেলে তো পড়াশোনা করতে হয়" অঞ্জনদা হাফ টাকে পাকা চুলটা পেছনে সরিয়ে, কফিতে চুমুক দিল।

"আর কদ্দিন? সামনে এতগুলো অনুষ্ঠান - গোদের মতো বিলেত অ্যামেরিকার বং-সং, নর্থ আমেরিকান বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশনের ফাংশন, তার ওপর বিষফোড়া কলকাতা বুক ফেয়ার তো আছেই"

অঞ্জন হেসে লাট- "কিচ্ছু চিন্তা করো না। সব ঠিক সময়মতো হয়ে যাবে"

"রাজীব বলছিল, বই শুকতেও তো সময় লাগবে..." শোভনের দ্বিধা কাটছে না।

“ঠিক হয়ে যাবে। আমি রাজীবের সঙ্গে কথা বলে নেব” অঞ্জন কনফিডেন্ট।

প্রকাশক রাজীব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে অঞ্জনের অন্য একটা অঙ্ক আছে। রাজীব চট্টোপাধ্যায়ের মিত্রভারতী প্রকাশনার লভ্যাংশের কর্ণধার অঞ্জন। রবীন্দ্রনাথের জীবনে যত মহিলা এসেছেন, তাঁদের চর্বিতচর্বণ করে কিছু অর্ধসত্য মিশিয়ে, বাজারে ছাড়তে ওর জুড়ি নেই। সেই শূন্যতা বিক্রি করাই অঞ্জনের প্রতিষ্ঠার মূল। এ ব্যাপারে সে নিজেকে সিদ্ধহস্ত ভাবে। সেখানে কেউ বাদ যায় না। ওর নিজস্ব শূন্যতা ভরাতে রবীন্দ্রনাথ থেকে বিবেকানন্দ, সব অ্যান্টিক মশলাই মজুত। অন্তরালে ঘটনা যাই থাক না কেন, তা অবান্তর। নামী লোকেদের বাংলাবাজারে দামি করে তুলতে ওস্তাদ।

সেই রসালো কেচ্ছা নতুন প্রজন্ম গোগ্রাসে গিলে বলে, ‘আগে তো এমন রবীন্দ্রনাথকে জানতাম না। অঞ্জনবাবুর লেখা পড়েই তো ব্যাপারটা জানলাম’। এর মাঝে পাবলিসিটির জন্য টাকা আর শোভনের সাংস্কৃতিক মহিলা ব্রিগেড। সেই যজ্ঞে আড়াল থেকে ঘি ঢালেন ‘ঋত্বিক’ অঞ্জন। একেবারে যে বোঝে না শোভন, তাও নয়। কিন্তু কিছুই করার নেই। ওদের ছাড়া, সে তো অসহায়।

“আগেরবার যখন তোমার জন্য ভারতীয় গীতাঞ্জলি লিখে দিয়েছিলাম, ঠিক সময় শেষ করিনি?”

“তা করেছিলে। কিন্তু তখন তো এতগুলো প্রোগ্রাম ছিল না”

“হলেই বা। আমিও তো তোমার সঙ্গে যাব। শেষ না করলে কি তুমি আমায় নিয়ে যাবে?”

বড় গাছের সঙ্গে অজস্র পরজীবী লতাগুল্ম জড়িয়ে থাকাও প্রকৃতির এক অমোঘ নিয়ম। অত্যাধুনিক জীবনযাপনও তাকে এড়িয়ে যেতে পারে না। নগরসভ্যতা প্রকৃতি থেকে এতটাই বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে, সেটুকুও টের পাওয়ার উপায় নেই।

ধুরন্ধর অঞ্জন জানে কী ভাবে শোভনের কাছ থেকে পণ্যমাশুল আদায় করে নিতে হয়। দেয়ার ইজ নো ফ্রি লাঞ্চ। শুধু ক্যাশে নয়, কাইন্ডেও। চুলটা কী এমনি এমনি পেকেছে? কম ঘাটের জল তো খেল না। তাইতো এখনও জলে ভাসছে - রঙিন না সাদা, সে শুধু স্তাবকরাই বলতে পারবে। ভাসতে ভাসতে নিজের জীবনের নোঙরটাই জমি খুঁজে পেল না। এখন ওই কচি-কাঁচাদের নিয়ে ফুর্তিতেই আনন্দ।

মিষ্টি হেসে মোলায়েম করে শোভন বলল “নিশ্চয়ই যাব। এক যাত্রায় কি পৃথক ফল হয়?”

ধান্দার জগতে কখনই নয়।

সঙ্গে সাংস্কৃতিক জগতের কচি থেকে মাঝবয়সি অনেক দিকপালই যাবে, যদি প্রোগ্রামের অফার পায়। ওখানে ফ্রি খাওয়া-থাকা-আপ্যায়ন। বাকি খরচ ম্যাগনোর সৌজন্যে। এমনি এমনি সবাই শোভনকে পাত্তা দেয় না। এদের আশীর্বাদে ধন্য শোভন যাদুকর ইমেজে তাই বঙ্গ বরেণ্য, আজকের বাজারে অনন্য। খালি একটু ফাঁকি রয়ে গেছে। এখনও কোনও ভূষণ-শ্রী জুটিয়ে উঠতে পারেনি। ঠিক জায়গায় ঢালতে পারলে সেটাও যে কোনোদিন জুটে যাবে। সেই আশাতেই দিন গোনা।

“আজকে কোনও ডিনারের নেমন্তন্ন নেই?” অঞ্জন প্রশ্ন করল।

“নাঃ... আজকে কোনও পার্টি নেই”

“তাহলে ছোট করে একটা হয়ে যাক। চল আজকে আমরা চারজনে মিলে তাজের সুকে খেয়ে আসি”

“আর দুজন কারা?”

“ইমা আর অবন্তী”

খুবই পরিচিত নাম। পরিচিত মুখ।

কিন্তু খাওয়ার পরের অংশটার কথা মনে হতেই, শোভনের সারা গা রি রি করে উঠল। ইমা উঠতি রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীদের মধ্যে অন্যতম একজন হলেও, ওই লিকপিকে মেয়েটার সঙ্গে শোয়ার কথা মনে হতেই, শোভন আবার একবার ভিরমি খেল। দু-একবার যে কিছু করেনি, তা নয়। কিন্তু ওই শুটকি মাছের মতো দেহটাকে ভোগ করার মধ্যে কোনও মজা নেই। অঙ্গটাকে চাঙ্গা করতেই সারা রাত কত রঙ্গ করে পার হয়ে যায়।

টাকা ঢালব আমি। আর আমার দিকে রদ্দি মাল ছুড়ে ভোগ করবে তুমি? এ না হলে অঞ্জনদা! লেই-এর মধ্যে ক্ষীরটা তুলতে ওস্তাদ। এত চেষ্টা করেও অঞ্জনদার মতো পাক্কা খেলোয়াড় হতে পারল না। ঠিক সময়মতো হয়ত তাজের সুইটেই চিত্রতারকা অবন্তীকে নিয়ে সটকে পরবে। অবন্তীকে নিয়ে তো আর তার এঁদো নাকতলার বাসায় রঙিলা হওয়া যায় না! তাজের সুইটের বিলটাও ভরতে হবে সেই শোভনকে। অথচ অঞ্জনদাকে চটানোও যাবে না।

“বেশ। দেখো ওরা ফ্রি আছে কি না” নিরুৎসাহে অঞ্জনদার দিকে কথাটা ছুড়ে দিল।

ভবিতব্যটা বুঝতে পেরেই তৎক্ষণাৎ শোভন বলল “অত দূরে কেন আবার অঞ্জনদা? তার থেকে চল না হায়াতে একটা সুইট বুক করে নিই। নিরিবিলিতে ঘরে বসে খাওয়া-দাওয়া করা যাবে”

“তুমি যা বলবে” অঞ্জনদা প্রতিবাদ না করেই সায় দিল। রাতে অন্তত পাঁচ তারার সুইটে সুখভোগ করে নেওয়া যাবে। কষ্ট করে আর নাকতলার স্যাঁতস্যাঁতে বাড়িতে ফিরতে হবে না। আনলিমিটেড হুইস্কি অ্যান্ড লেডিস কম্পানি, বাই কার্টসি অফ ম্যাগনো...

মনে মনে ভাবল শোভনের মতো শয়ে শয়ে মালদার লেখক বাজারে আসুক। নিজের উপেক্ষিত প্রতিভাকে আবার জাগ্রত করতে পারবে এদেরই ঔদার্য, অসহায়তার সৌজন্যে। অস্তিত্বহীন নিজেকে ফিরে পেতে এরাই তো তার বার্ধক্যের পেনশন। এই বয়সে শুধু পঞ্জিকার কিঞ্চিত পেনশনের ওপর ভরসা করে টেনশন নিতে চায় না অঞ্জন।

কফির কাপটা টেবিলে নামিয়ে মোবাইলের কন্ট্যাক্ট লিস্ট খুঁজে বোতাম টিপল।

“ইম আজকে কি কোনও প্রোগ্রাম আছে?”

“না অঞ্জনদা। কেন?”

“চল, ডিনারে যাই”

“শুধু আমি?”

“শোভন-ই হোস্ট করছে। অবন্তীকেও ডেকে নিচ্ছি...”

শোভনকে না বলতে পারবে না ইমা। এর আগে মাঝরাতে হুইস্কি খেয়ে, কাব্যিক হয়ে, তাকে অনেক কবিতা হজম করতে হয়েছে। ইমা জানে, আজও তাকে হজম করতে হবে। দিনে রবীন্দ্রনাথ, রাতে সত্যনাথ। আজকের দিনে নাথ ছাড়া যে কেউ চলতেই শেখেনি। অনাথের দিন নয় অদ্য। কোনও এক নাথের কৃপা না হলে আজকের যুগে কোথাও পৌছনো যাবে না। এতএব নিজেকে রবীন্দ্রনাথের মোড়কে মুড়তে হলে, আজকের গতি সত্যনাথ, থুড়ি শোভনকে, সঙ্গ দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। এই মন্দার বাজারে শোভনই একমাত্র ভরসা। চিটফান্ড চক্কর স্ক্যানারে আসার পর থেকে স্পনসরশিপগুলো ঝপাঝপ বন্ধ হয়ে

গেছে। কেউ রবীন্দ্রসংগীতের জন্য পয়সা ঢালতে রাজি নয়। শোভনের দয়া দাক্ষিণ্যে যে কটা প্রোগ্রাম পাওয়া যায়।

যেদিন লিলুয়ার নিম্নবিত্ত পরিবারের একরত্তি মেয়েটা সকাল সন্ধে গানের রেওয়াজ করত। পরে রবীন্দ্র ভারতীতে একনিষ্ঠায় গানের সাধনা। সেদিন ভাবেনি কোথায় পৌঁছবে। বুক ভরা স্বপ্ন। মন জুড়ে আশা। সেই আশার সিঁড়ি ধরে অতর্কিতে একদিন তারা বাংলায় একটা ব্রেক। জীবনের আরেক অধ্যায়। রেওয়াজের নিষ্ঠা ছেড়ে খ্যাতির শিখরে পৌছনোর অদম্য তাড়না। নাম, যশ, অর্থ, প্রতিপত্তি ছোটার ইচ্ছেটা বহু গুণ বাড়িয়ে দিল। ক্রমাগত দিনের রেওয়াজ আর রাতের ঘুম কেড়ে নিতে লাগল গতির সঙ্গত।

টপ... টপ... টপ...

অ্যান্ড টু দ্য টপ।

টাকা আর নামের নেশা মাঝরাতের খ্যাপা কুকুরের মতো তাড়া করে। বোধোদয় হয়নি। নিশ্চিন্ত শান্তি মোহময় স্বপ্নের আঁতুড়ঘরে আর নেই।

অঞ্জনদা, শোভন, পার্টি, দেহ দান - এ এক আশ্চর্য তারকা খচিত মহল। খ্যাতি আছে। মূল্যের বিনিময়ে কেনাবেচায় শান্তি হারিয়েছে, শৃঙ্গে পৌছনোর অসাধ্য সাধনায়। বাজারে টিকে থাকতে হবে। এটাই রীতি, এটাই নীতি। ওপরে ওঠার সংস্কৃতি। ইমার একটাই রাস্তা। হ্যাঁ বলা, না হয়, পথ দেখা। সাজানো বাগান কি কেউ ফেলে যেতে পারে?

"কোথায় যাব?"

"হায়াত। ঠিক আটটায়। পরে রুম নম্বর বলে দেব"

অঞ্জনদা ফোন কেটে দিল। ভাবল, শোভনের, টাকার ভেল্কি, নাকি মাধুর্য। অনেক অনিচ্ছুককেও তাহলে বাগে আনা যায়। আজকাল মহিলারা রূপে-গুণে চট করে মুগ্ধ হয় না - হয় চাঁদি, নয় খ্যাতির মোহ। সারা জীবন লেখালেখি করে তো একটাকেও রাখতে পারল না। দুটো যদি বা কাছাকাছি এসেছিল, শেষ পর্যন্ত টিকল না। অবশ্য দুজনের কেউ-ই ওর পাণ্ডিত্যের লেভেলটা বুঝতে পারল না। মায়ের প্রতি দায়বদ্ধতাও নয়। সব মহিলারাই নিজের সুবিধে আর চাঁদি চেনে।

চমকালেই স্তুতি। না হলে বিস্মৃতি।

এমনকী সরকারবাবুও জ্ঞানের পরিধিটা বুঝল না। লাথি মেরে বার করে দিল বড়বাজার থেকে। অথচ কী না করেছিল বড়বাজারের জন্যে? বড়বাজারকে, কে বাজারে বিকিয়েছে? মুনাফা নিয়েই বাবু খালাস। অঞ্জন যদি মাঝখানে ভাগ বসিয়ে টু পাইস কামায়, তাতে বাবুর কীসের গোসা? সবাই কামাচ্ছে, শুধু সে কামালেই রাগ?

ভাগ্যিস সঞ্জয় বোস ঠাই দিয়েছিল তার পত্রিকায়। তা না হলে তো প্রফেসর, সাংবাদিক, সাহিত্য ও নারী রসিক এবং ছলনাময়ীদের অপরূপা সাজিয়ে বেচনেওয়ালা অঞ্জন বিলুপ্ত হয়ে যেত। ঠাই হত অচিনপুরের ঠিকানায়। যদি না বয়সকালে ফোকাসটা ঠিক করত। নারীকে বিকৃত রূপে সাজাবার সীমাহীন ক্ষমতা যে শেষমেশ কোথাও ঠাই পাবে, ভাবতেও পারেনি। যদি না, কর্ণ ঘোষ সহকারী হিসেবে ভেড়াত সঞ্জয় বোসের কাগজে। কর্ণ ঘোষের মৃত্যুর পর, সেই তো এখন অলিখিত বাদশা। যদ্দিন শোভনের মতো দিলদরিয়া

সংস্কৃতিসেবী আলোকিত করবে বানভাসি কালচার, ততদিন তার বিকৃত রতির গতিপথে বেঁচে থাকবে ইমা, অবন্তী।

শোভনের দিকে চেয়ে বলল "ময়ূর পাখনা মেলতে প্রস্তুত। তুমি আছ তো?"

অঞ্জনদাকে সন্তুষ্ট করা ছাড়া, শোভন ইমা সম্বন্ধে ইন্টারেস্টেড নয়। ইমা না হয়ে, পদ্মপর্ণা হলে, তবু পয়সা উসুল হত। কাউকে হাতে রাখতে গেলে, মাঝে মাঝে, দুধের স্বাদ ঘোলেও মেটাতে হয়। সেই ঘোলের নিমের রস শুটকি ইমা। কী আর করা যাবে? কেউকেটা হতে গেলে তো এদের বরণ করে নেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

শোভনকে চুপ করে থাকতে দেখে, অঞ্জন বলল "দাঁড়াও দেখি অবন্তী কোথায়?"

কন্ট্যাক্টস খুঁজে অবন্তীকে ফোন "ব্যস্ত?"

"না, মেক আপ রুমে। শট-এর এখনও দেরি আছে"

"সন্ধেবেলা ফ্রি আছ? শোভনের সঙ্গে কোথাও বসা যেতে পারে..."

"প্যাক আপ করতে করতে দশটা হয়ে যাবে"

"চলে এস হায়াতে। বেরোবার আগে আমাকে বা শোভনকে ফোন করে নিও। সুইট নম্বরটা বলে দেব"

"ঠিক আছে" ফোনটা কেটে দিল অবন্তী।

সাধারণত এইসব ছোটখাটো চুনোপুঁটি নিয়ে সময় নষ্ট করা ধাতে নেই অবন্তীর। বাংলা সিনেমায় এখন সেরা কমার্শিয়াল পাঞ্চ। ভরা যৌবন। বিবাহ বিচ্ছেদের পর ঝাড়া হাত-পা। এই সব ইনসিগ্নিফিকেন্ট মুরগি নিয়ে সময় নষ্ট করতে মন চায় না। রাত কাটাতে হলে প্রদীপ গোয়েঙ্কার মতো মালদার পার্টির দিকেই ঝোঁক। এরা তো খাইয়ে, ফুর্তি করেই খালাস। শুনেছে প্রদীপ মালকড়িও ছাড়ে। ভাগ্যক্রমে কয়েকটা সিটিং দিতে পারলে, পদ্মপর্ণাদির মতো মনি স্কয়ারে একটা ফ্ল্যাটও বাগিয়ে নিতে পারবে। বাংলা সিনেমার যা দুর্দশা!

চিটফান্ডের ধাক্কায় প্রায় পঞ্চাশখানা ছবি আটকে। যেগুলো রিলিজ করে, সেগুলোও চলে না। কে জানে, কদ্দিন কাজ থাকবে? তার আগে সব গুছিয়ে নিতে হবে। কৃষ্ণনগরের মধ্যবিত্ত ঘরে বড় হওয়া অবন্তী, এর থেকে আরে বেশি কী-ই বা আশা করতে পারে? তাই বাংলাবাজারের ব্যাপারিদের চটাতে চায় না। উলটোসিধে লিখে দিতে পারে। এই লাইনে থাকতে গেলে সব্বাইকে গুড হিউমারে রাখতে হবে। বিগড়ে গেলেই সর্বনাশ। কে যে কোথা থেকে কী বাঁশ দিয়ে দেবে, বলা তো যায় না।

"সব ফিট করে দিলাম। এবার সুইটটা বুক করে ফেল"

"হু" আমসত্ত্বের মতো মুখে শোভন সুইট বুক করতে তৎপর।

ঘরে গিয়ে ধুমসি মোটা বউ-এর পাশে সিরিয়ালের সামনে বসে থাকার চেয়ে তো অনেক ভাল। তবু তো, এই সব কচিকাঁচাদের দেখা, ছোঁয়ার মধ্যে, কিছুটা তৃপ্তি আছে। এখনও তো বুড়িয়ে যায়নি। বউ-এর মধ্যে ভ্যারাইটি না থাক, এই ছুকরিগুলোর মধ্যে তো অন্তত কিছুটা আছে।

দুধ না থাকে, থাক। নেই মামার চেয়ে, কানা মামা ভাল।

তার জন্য দেওয়ালিকে নিয়ে বালি ট্রিপটা তো দিগ্বিজয় ফিট করে ফেলেছে। তখন শ্যামলা গাইয়ের দুধের স্বাদ উপভোগ করা যাবে। আপাতত ঘোলের মধ্যেই...

তিন

লেক টেরেসের লাল-মেঠো বাড়ির বারান্দায় বসে গাছের ফাঁক দিয়ে পড়ন্ত সূর্যর দিকে চেয়ে ছিল শুভ্রা। সূর্যের শেষ রশ্মির মতো, তার সংগীত জীবনের খ্যাতিও কী এখন অস্তগামী? মন মানতে না চাইলেও আপাত দৃষ্টিতে তাই তো মনে হচ্ছে।

একদিন সৃজিত গোস্বামীর কবিতায় সুর ঢেলে বাজার মাতিয়ে দিয়েছিল। রাতারাতি নাম, যশ, প্রতিষ্ঠা। রবীন্দ্রসংগীত থেকে আধুনিক। নিজস্বতার জন্য, গলার বৈশিষ্ট্যে, খ্যাতির পারদ তরতর করে চড়ছে তখন। কণ্ঠের ব্যঞ্জনায় অকৃপণ ভাবে অর্থের ঝোলাও ভরতে লাগল। খ্যাতির শিখরে। এক নামেই পরিচয় - শুভ্রা মিত্র।

সে তো এখন ফেলে আসা অতীত। নাম খ্যাতির সঙ্গে ব্যবসাও গ্রাস করল শুভ্রাকে। প্রফেশনল সিঙ্গার। পয়সা ফেললেই গান। কে সুর দিচ্ছে, কী দিচ্ছে, সে সুরে আদৌ রেকর্ডিং করা উচিত কি না - সে সব ভাবার সময় কোথায়? লোকে নাম শুনেই টাকা ফেলে যাচ্ছে। ডিমান্ডের সঙ্গে রেটও হু হু করে উঠছে। যতদিন দম আছে কামিয়ে নাও। দিন ফুরিয়ে গেলেও নাম বেচে ভেল্কি। না হলে, হারিয়ে যাও। হারতে চায় না শুভ্রা।

"তোমার জন্যে একটা সুর দিয়েছি। শুনবে?" স্বনামধন্য মিউসিক ডিরেক্টর স্বামী জয়ন্ত সরকার মুখের দিকে তাকিয়ে।

"রেডি করে রাখ। আজকে বিকেলে দুটো প্রোগ্রাম আছে। রেস্ট নিচ্ছি। পরে শুনব" জয়ন্তকে থামিয়ে দিল।

"বেশ... যখন সময় পাবে বোলো" চুপসে গেল জয়ন্ত। পিড়াপিড়ি করতে গেলে, মুখঝামটা খাবে। শুভ্রার টেম্পার তার থেকে আর কে ভাল চেনে?

প্রোগ্রাম দুটো যে খুব দূরে, তাও নয়। বাড়ির কাছেই। প্রোগ্রামটা খুব বড় নয়। উদ্যোক্তারা এই বাজারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটা পিজিআর-এর ব্যানারে, যেখান থেকে তার সবচেয়ে বেশি অ্যালবাম বেরিয়েছে। জি ডি বিড়লা সভাঘরে। ওর কর্তা নাদিম সাহেব-ই এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা। তার এত বছরের সংগীত জীবনের অদৃশ্য কান্ডারি। উনিশ-বিশ হলেই বিপত্তি। বাকি প্রোডাকশনগুলোও থামিয়ে দেবে। তবুও ওকে খুশি করে চলতে হবে। হার চিপ্পু। রেকর্ড কম্প্যানির লোকেরা যেমন, চিরকাল।

রয়ালটি চাইতে গেলেই বলে "কোথায় আর আপনার সিডি বিক্রি হচ্ছে? কিছুই তো হচ্ছে না"

"বন্ধু বান্ধবদের কাছে খবর পাচ্ছি প্রচুর সেল হয়েছে"

"ওরা আপনাকে খুশি করার জন্য বলছে। কিসসু বিক্রি হয়নি। বিক্রি না হলে রয়ালটি আসবে কোত্থেকে?"

তার প্রাপ্য না দিয়ে একাই লুটবে। তবুও কিছু বলা যাবে না। এ নতুন কিছু নয়। আগেকার যুগের নামী গায়ক গায়িকাদের নিয়ে একই খেলা খেলেছে। তখন অবশ্য ওদের উপায় ছিল না। বেশি রেকর্ড কম্পানিও

তো ছিল না। যে ক'টা ছিল, তারা নামী গায়ক-গায়িকাদের দুইয়ে ভিখিরির মতো কিছু টাকা ছুড়ে দিত। যুগ পাল্টেছে। কিন্তু সেই ট্র্যাডিসন আজও চলিয়া আসিতেছে ।

শুভ্রা মিত্র কোন ছাড়!

তবুও মিউসিক প্রোডাকশন জগতের একচ্ছত্র অধিপতি ওই নাদিম সাহেবই। চটালেই বিপদ। অন্যটা, নজরুল মঞ্চে গোদাফোনের বাৎসরিক সর্ব শিল্পীর সমন্বয়। ভালই মালকড়ি দেয়। কখন স্টেজ পাবে, কোনও গ্যারান্টি নেই। বসে থাকতে হবে হাসিমুখে। ওরা বিগড়লে নেক্সট বার ছাঁটাই - অ্যাসিওরড ইনকাম গন। কোথায় এদের তুষ্ট রাখা - আর কোথায় জয়ন্তর আবিষ্কৃত সুর!

এত বছরে, প্রাধান্যের মাপকাঠি বুঝতে শিখেছে শুভ্রা। আর সময় পেল না? ঠিক এই সময়-ই জয়ন্ত তার নতুন সুর শোনাতে এসেছে। নিকুচি করেছে সুরের। এই সব বড় বড় অরগ্যানাইজারদের খুশি রাখা গানের থেকে অনেক বেশি ইম্পরট্যান্ট। এরাই তো শুভ্রা মিত্রকে নামে, মানে, ধনে, সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

ওরা ইম্পরট্যন্ট? না, জয়ন্তর সুর?

ঘরের লোক - ফ্রি টাইমে শুনে নিলেই হবে।

“আপনাকে আমি প্রথম দিকে স্টেজ দেওয়ার জন্য অ্যারেঞ্জ করে দিয়েছি, যদিও শেষের দিকে হলে, প্রোগ্রামটা বেশি জমত। আপনাকে তো আবার গোদাফোনের প্রোগ্রামে যেতে হবে” নাদিম সাহেব একগাল হেসে শুভ্রা মিত্রকে অভ্যর্থনা জানাল।

বিক্রি না থাকলে কি নাদিম সাহেব এত খাতির করে? মুখে যাই বলুক না কেন। এ দুনিয়ায় যার বাজার কাটতি বেশি, তার খাতির, আদর-আপ্যায়ন, সম্মান, কথার গুরুত্ব, প্রাধান্য পায়।

শুভ্রা মিত্র তার মনমোহিনী হাসি ছড়িয়ে বলল “নাদিম সাহেব আপনার এই ঔদার্যের জন্যই তো আমরা বেঁচে আছি”

কী বুঝল নাদিম সাহেব, কে জানে? নাদিমকে চুপ করে থাকতে দেখে বলল “ডিটিভির ‘পামাগারেসা’ তে আমাকে জাজ করার ব্যাপারে কথা বলবেন?”

“নিশ্চয়ই। আপনাকে তো আগেও বলেছি বন্দোবস্ত করে দেব”

রয়ালটি না চাইলেই হল। অন্য যেখান থেকে পারে কামিয়ে নিক, তাতে নাদিম সাহেবের কী আসে যায়? রিয়ালিটি শো না মাথা। শালা সব বাপ-মায়েরা, ছেলে-মেয়েদের ইস্টার না করে ছাড়বে না। এই এত বছর তো দেখছে। কই? এই রিয়ালিটি শো থেকে কি কোনও স্টার উঠে এসেছে? দু-একজন ছাড়া। বাকিরা কিছুদিনের জন্য মিডিয়া পাবলিসিটি কামিয়ে সুড়সুড় করে ল্যাজ গুটিয়ে গর্তে ঢুকবে। যতসব আকাটের কনসার্ট। তবে বাজারে স্পন্সর থাকলে, দু-একটা প্রোগ্রাম জুটেও যেতে পারে। নয়ত ওই যে কী সব বিগ-বস ভাটের মনোরঞ্জন টিভি স্পন্সরদের দৌলতে চলছে, ওখান থেকে কালেভদ্রে কিছু কামিয়ে নিতে পারে।

ব্যস। ওইটুকুই। আর বিশেষ কিছু হবে না। শুভ্রা জাজ হয়ে বেশ কিছু কামিয়ে নিতে পারবে।

করুক গে। তার লাভের ভাগে হাত না বসালেই হল।

শুভ্রা একটু আক্ষেপ করে বলল “কবে থেকে বলে রেখেছি। এখনও কনফার্ম করতে পারলেন না...”

“আরে হবে হবে। ঠিক সময়মতো করে দেব। আমার এই ফাংশনটা উতরে দিন”

সাহস করে জিজ্ঞেস করতেও পারল না, এই ফাংশনে গাইবার জন্য দক্ষিণা পাওয়া যাবে কী না। নাদিম সাহেবকে এতদিনে হাড়ে হাড়ে চিনে গেছে। ফোকটে গান গাইয়ে টিকিট বিক্রির টাকা পকেটস্থ করতে ওর জুড়ি নেই। তবু বাঁচোয়া, অন্তত গোদাফোন অতটা চিপ্পু নয়। আগেই মালকড়ি দিয়ে গেছে।

জয়ন্ত চুপিসারে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। টাকা আর ধান্দার কাছে সৃষ্টির কোনও দাম নেই। শুভ্রাকে বোঝানো বোকামি।

গাছের ফাঁক দিয়ে সূর্য নয়, রাস্তার ওপারে সারি সারি আদ্যিকালের বাড়িগুলো। সেগুলো হয়ত অতীতের সাক্ষর বহন করছে, কিন্তু তাও শুভ্রার কাছে ম্লান।

এক সময় কতই না স্বপ্ন দেখত নামী শিল্পী হওয়ার। হয়েছেও। কিন্তু এ যুগে তেমন সুরকারও নেই, গীতিকারও নেই। জয়ন্ত যে এত এক্সপেরিমেন্টাল সুর দেওয়ার চেষ্টা করে, সেটাও তো ধোপে টেকে না।

ধ্যত। সুর সাধনা করে কী হবে?

টাকা চাই।

কত, সে নিজেও জানে না। নতুন কিছু নিয়ে বসার সময়ও নেই। অত সময় নষ্ট করে কী হবে, যখন পুরনো গান পারমুটেসন-কম্বিনেশন করেই লক্ষ্মী ঘরে আসছে।

হয়ত তাই দিয়ে আরও বেশ কিছুদিন চালিয়ে যেতে পারত। বাধ সাধল গানের পাইরেসি। ইউ-টিউবে গান আপলোড করে পুরনো গান শুনে নেওয়া। মিউসিক ওয়ার্ল্ড বন্ধ হয়ে গেল। কমে গেল সিডির কাটতি। চাহিদা থাকলেও সামর্থ্যের অভাবে ফাংশনের জোয়ারে ভাটা পড়ল। চিটফান্ড স্ক্যাম আর ইকনমিক রিসেশন ফাংশনের স্পন্সরশিপে ঘা দিল। এক ওই বিদেশের বং-সং সম্মেলন ছাড়া তেমন বড়সড় কামাই নেই।

বিক্রির অভাবে রেকর্ডিং কম্প্যানির রয়ালটিও ক্রমশ কমতে লাগল। আগে তবু সিনেমাগুলোতে প্লে-ব্যাক করে কিছু আসত। এখন চিটফান্ড হাত গোটানোয় সেখানেও খরা। হলে সিনেমা চলছে না। আবার তাদের মতো নামী, দামি, প্লে ব্যাক শিল্পীকে ভিড়িয়ে এক্সট্রা খরচ! নৈব নৈব চ। জুনিয়ার কাউকে ফোকটে চান্স দিয়ে কৃতার্থ করেই খালাস।

বাজার মন্দা। রিসেশন। পুঁজির সংকট, সেইসঙ্গে সভ্যতারও।

সর্বাণীর পথেই হাঁটার ভাবনা নিয়ে নিজের প্রোডাকশন কম্পানি খুলে পুরনো গানের সম্মিলিত প্যাকেজ। সেও তো বাজারে কাটল না। তবু টিকে থাকতে হবে। আউট অফ সাইট, আউট অফ মাইন্ড। নাঃ, স্রোতার মাইন্ড থেকে নিজের প্রতিষ্ঠাকে খোয়াতে রাজি নয় শুভ্রা। রাজীব চট্টোপাধ্যায় বইমেলায় মিত্রভারতী স্টলে তার প্রোডাকশনের সিডি রাখলেও বিক্রি নেই।

তখন অঞ্জনদা-ই প্রোপসালটা দিল “চল না একসাথে মিলে কিছু প্রোগ্রাম করি”

“স্পন্সর করবে কে?”

“কেন শোভন করবে? ওর টাকার কী কমতি আছে!”

শোভনের স্পন্সরশিপে নিজের অস্তিত্বরক্ষা। এছাড়া আর উপায় কী? শোভনের মতো কিছু মালদার লোক এখনও টাকা ঢালতে প্রস্তুত বলেই শুভ্রা, সর্বাণী, ইমার মতো কিছু শিল্পী এখনও বাজারে টিকে আছে।

অঞ্জনদা বলল “বাজারে এখন রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ খাচ্ছে। ওগুলোর প্যাকেজ করে গীতি-আলেখ্য লিখছি। ভিড়ে যাও আমাদের সঙ্গে। ওটাই খাবে”

মিডিয়ার লোক অঞ্জনদা। পত্রিকার এডিটর। সৃষ্টি করতে না পারুক, এত বছর ধরে কী খাওয়াতে হবে, সেটা ভালোই রপ্ত করেছে। মনে পড়ে, লুল্লু নামের ভূতটিও কেবলমাত্র গাল পাড়ার যোগ্যতাতে এডিটরির মতো লোভনীয় প্রস্তাব পেয়েছিল।

দিগ্বিজয় ভটচাযের বউ মায়া বলে 'ওটাই ব্র্যান্ড... অঞ্জনদার ব্র্যান্ড ওটা বিক্রি করেই হারিয়ে যাওয়া অঞ্জনদার আবার লাইমলাইটে ফেরা'

আজকাল সবাই, সব কিছুই ইনস্ট্যান্ট চায়। ইনস্ট্যান্ট প্রেম, ইনস্ট্যান্ট সেক্স, ইনস্ট্যান্ট কালচার। অঞ্জনবাবুর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ বাঙালি। নিজের যখন কিছু বলার নেই, তখনও টিকে থাকাটাই আসল কথা। সৃষ্টি কৃষ্টি গৌণ। বলেই বা শুনছে কে? তবু বলছি, এটাতো বোঝাতে হবে।

"ঠিক আছে অঞ্জনদা। আপনি স্ক্রিপ্ট লিখুন। আমাকে কী গাইতে হবে, বলে দেবেন" শুভ্রা সম্মতি দিল।

"বেশ। লিখে ফেলছি"

এত মনীষী থাকতে রবীন্দ্রনাথ আর বিবেকানন্দ কেন বাজারে খায়, এটা শুভ্রার বোধের বাইরে। কোথাও এক অদৃশ্য মার্কেটিং পাওয়ার এদের লাইমলাইটে নিয়ে এসেছে। অত ভেবে কী হবে? যা খাচ্ছে, তাতেই নিজেকে ভাসিয়ে দাও। এখন আর কষ্ট করে নিজেকে রিমডেল করতে চায় না। যেমন চলছে চলুক।

কখন দুপুর পেরিয়ে বিকেল ফুরিয়ে সন্ধে গড়িয়েছে, খেয়াল করেনি। গিটার হাতে জানলার বাইরে ফ্যালফ্যাল করে চেয়েছিল জয়ন্ত। অন্ধকার হয়ে এসেছে। আলো জ্বালানো হয়নি। শুভ্রা কখন যেন বেরিয়ে গেছে। দুটো প্রোগ্রাম শেষ করে ফিরবে।

কত কিছুই না পালটে যায় সময়ের সঙ্গে। সেই কবে আলাপ। সংগীত অ্যাকাডেমি থেকে বেরচ্ছিল শুভ্রা। হঠাৎ এক রোগা পাতলা ছেলে, মুখে একরাশ দাড়ি, কোথা থেকে উদয় হয়ে বলল "কয়েকটা সুর দিয়েছি। শুনবেন?"

তুমি কে হে হরিদাস পাল? কোত্থেকে উদয় হলে বাবা? পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল শুভ্রা। ছেলেটি নাছোড়বান্দা, পথ আগলে, "একবার শুনেই দেখুন না..."

বাসন্তী দেবী কলেজে পড়ার সময়, যে দু-একটা ছেলে আলাপ জমাতে চায়নি, এমন নয়। কলেজের ফাঁকে বন্ধুদের সঙ্গে শাড়ির দোকানগুলোতে উইন্ডো শপিং করে দিব্যি সময় কেটে যেত। পরে অবশ্য রোজগারের তাগিদে শাড়ির দোকানে একসময় চাকরি নিয়েছিল। সিলেক্ট স্টোরসের পাশের রকে গুলতানি করা কিছু ছোকরা আলাপ জমাবার চেষ্টা করত- "প্রিয়াতে নুন শো লেগেছে। চলুন না দেখে আসি" ওদের উদ্দেশ করেই বলা।

"চল না, সবাই দল মিলে দেখে আসি" মৌমিতার বেশি চুলকানি "কণিকা ম্যামের ক্লাস করে কী হবে? আবেগে গদগদ হয়ে আবার ডায়াস থেকে উলটে পড়বে"

কণিকা ম্যাম একটু বেশি আবেগপ্রবণ। বিদ্যাপতি পড়াতে পড়াতে ডায়াসের চৌহদ্দি ভুলে বেশ কয়েকবার আছড়ে পড়েছিল। কণিকা ম্যামের ক্লাস না হয় ডুব মারা গেল। তা বলে এই অচেনা ছোকরাগুলোর সঙ্গে সিনেমা দেখা! ভাবতেই পারে না শুভ্রা!

"তোর বেশি চুলকানি হয়েছে তো তুই যা না। সবাইকে ভেড়াচ্ছিস কেন?" শুভ্রার মুখঝামটা দিয়ে থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা।

"কারণ টার্গেট তুই। আমরা সব ফাউ। তুই গেলে ওরা আমাদের সকলকে ফ্রিতে সিনেমা দেখাতে পারে" মৌমিতা নাছোড়বান্দা।

"তুই ভিড়ে যা। আমি শাড়ি দেখি"

কলেজ জীবনে এসব হয়েই থাকে। তা বলে সোজা পথ আগলে সুর শোনাবার চেষ্টা। এ তো উঠতি কবিদের থেকেও বেশি উৎপাত।

"একবার শুনেই দেখুন না। ভাল না লাগলে চলে যাবেন"

কী আর করা। টালিগঞ্জের সংগীত অ্যাকাডেমির সিঁড়িতে বসে শুনতেই হল উঠতি সুরের ঝলক। মন্দ নয়। কিন্তু এসব শুনে কী হবে? কোথায় গাইবে? কাকে শোনাবে?

প্রোপসলটা জয়ন্তই দিয়েছিল "চলুন না সবাই মিলে একটা ব্যান্ড তৈরি করি। আমার নাম জয়ন্ত। গিটার বাজাই। আমাকে না চিনলেও, আমার বাবার নাম নিশ্চয়ই শুনছেন - অভিষেক সরকার"

এই তাহলে অভিষেক সরকারের সুপুত্র। এবার ভাল করে দেখল জয়ন্ত সরকারকে। টিপক্যাল আঁতেল মার্কা চেহারা। খোঁচা খোঁচা দাড়ি। কাঁধে শান্তিনিকেতনি ব্যাগ। কবি কবি ভাব। যদিও ছন্দের খুব একটা অভাব নেই।

"লিখেছে কে?"

"আমারই এক বন্ধু মৈনাক"

এমনিতেই স্বর্ণযুগের পর আর তেমন কিছু খাচ্ছে না। দু-একজন জীবনমুখী গান গেয়ে কিছু ঝটকা দিয়েছে বটে, তবে সেভাবে কিছু হয়নি। বিশেষ করে নারীকণ্ঠ তো আসেইনি। কোথাও সেভাবে ব্রেক নেই।

পাশে পড়া গিটারটা তুলে নিল জয়ন্ত। দুজনের জুটির প্রথম হিট কী ভুলে গেছে শুভ্রা? 'ছোটবেলার বৃষ্টি' গানটা সারা ফেলেছিল। এই সংগীতের হাত ধরেই তো ডানপিটে ডাঙাগুলি খেলা মেয়েটাকে, ছাদনাতলায় বসাতে সক্ষম হয়েছিল জয়ন্ত। সে কবেকার কথা। দেখতে দেখতে চোদ্দটা বছর পার করে দিল। এই রক অ্যান্ড রোল জীবন সমুদ্রে, সাকসেস আর ফেইলিওর, হাতে হাত মিলিয়ে চলেছে। তখন কত সময় ছিল শুভ্রার, তার নতুন ভেঞ্চার শোনার। কবেকার কথা। সে সময় কত স্বপ্ন। নতুন কিছু করার... নাম হল। প্রতিষ্ঠা হল।

সময়ের সঙ্গে মানসিকতার কত পরিবর্তন হয়েছে। তখন ছিল নতুন সৃষ্টির মাধুর্যের স্বপ্ন। এখন খালি টাকা। তিমিরদা যেদিন স্বপ্নময় গোস্বামীর কবিতা নিয়ে নতুন গান ফাঁদল। রাতারাতি সুপারহিট।

ঘরের বাড়তি আসবাবের মতো জয়ন্তর সৃষ্টিও এখন বাড়তি। অন্ধকার ঘরে গিটারের স্ট্রিং-এর ওপর এলোমেলো হাত বুলিয়ে যাচ্ছে। চেনা কর্ডটা কী বেসুরো লাগছে? নাকি কোনো বিট-ই আর লাগছে না। নিজের কেরিয়ারের বিটটা কেমন ছন্নছাড়া, অফ-বিট।

কায়দা করে অনেকগুলো সিনেমার মিউজিক ডিরেক্টরের কাজ বাগিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু কোনও গানই তেমনভাবে লাগল না। হিট-এর থেকে ফ্লপ-এর সংখ্যা অনেক বেশি। নেহাৎ নেটওয়ার্কিং আর মিডিয়া হাইপের জেরে এখনও চালিয়ে যাচ্ছে। শুভ্রা তবু ফাংশন করে রোজগার করতে পারবে। কিন্তু তার কী হবে? তার দেওয়া সুর যদি হিট না করে তো ফোরসড রিটায়ারমেন্ট ছাড়া কোনও গতি নেই।

আর্তনাদের মতো মোবাইলটা বেজে উঠল। “ফ্রি আছিস? চলে আয় আমার ফ্ল্যাটে। দিব্যেন্দু, শুভব্রত, সুদীপ্তরাও আসছে। জমিয়ে আড্ডা মারা যাবে। ছোড়দা একটা সিঙ্গল মল্টের বোতল দিয়ে গেছে। গ্লেন মর‍্যাঙ্গি” মৈনাক উত্তেজিত।

ধুস, নিকুচি করেছে সুরের। খাও পিও মস্ত রহ। ফির জো হোনা ওহি হোগা। পার্সটা পকেটে পুরে, গাড়ির চাবি নিয়ে পায়ে চটি গলিয়ে বেরিয়ে গেল।

চার

"ইতনে জলদি কেয়া? রাত তো অভি বাকি হ্যায়। কাম অন... ফর মাই সেক হ্যাভ আনাদার পেগ"

অবন্তীর দিকে হুইস্কির গ্লাসটা এগিয়ে দিল গজেন্দ্র ধনি। হো চি মিন সরণিতে, গোল্ডেন পার্ক হোটেলের উলটো দিকে, গজেন্দ্র ধনির ফ্ল্যাটে সন্ধের আসর জমতে শুরু করেছে। কাল মর্নিং শিফটে কোনও শুটিং নেই। অবন্তী ভাবছিল বাড়ি গিয়ে নিশ্চিন্তে লেট মর্নিং পর্যন্ত ঘুমবে। দুপুর থেকে কন্টিনিউয়াস শিফটে কাজ।

এখন সে গুড়ে বালি। গজেন্দ্র ধনি বললে তো আর চলে যাওয়া যায় না। বাংলা কমার্শিয়াল ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির একচ্ছত্র অধিপতি। শুধু কী তাই? কতদিন আগে, যখন তার মাত্র দশ বছর বয়স। গজেন্দ্র ধনির প্রোডাকশন হাউস চামুণ্ডেশ্বরী ফিল্মস প্রথম সিনেমাতে তাকে শিশু শিল্পী হিসেবে ব্রেক দেয় 'স্বপ্ন বন্ধন' ছবিতে। তা না হলে আসাই হত না, এই রুপালি পর্দার দুনিয়াতে। তাও যে সে লোকের সঙ্গে কাজ নয়। শুভ্রজিৎদা আর পদ্মপর্ণাদি। আধুনিক বাংলা ছবির দিকপাল। কৃষ্ণনগরে থাকাকালীন যাদের ছবি দেখে বড় হয়েছে। শুভ্রজিৎদা তখন তার কাছে হার্টথ্রব। অবশ্য তখন বাজারে কাটতি চিত্র পরিচালক নিরঞ্জন সাহার ছবিগুলো। চামুণ্ডেশ্বরীর পয়া পরিচালক। আজ সেই নিরঞ্জন সাহা কোথায়? চামুণ্ডেশ্বরী ফিল্মস আর গজেন্দ্র ধনি আজও জ্বলজ্বল করছে। অথচ নিরঞ্জন সাহা কোথায় হারিয়ে গেছে। আজকের দিনে টিকে থাকতে গেলে তো গজেন্দ্রর আবদার গিলতেই হবে।

একগাল মিষ্টি হাসি ছুড়ে, হুইস্কির গ্লাসটা হাতে নিয়ে বলল "লাস্ট পেগ ধনি সাহাব। কাল সারে দিন শুটিং হ্যায়। জ্যাদা রাত নেহি কর পাউঙ্গি"

এখন অঙ্কটা স্পষ্ট - মালকড়ি ছাড়ো, তবে রাত কাটাতে পারি।

তার দেহের বুঝি কোনও দাম নেই?

স্পষ্ট বুঝিয়ে দেওয়া, আজকে রাতে, কারও মেহমান হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। বাজারে নিজের কাটতি বুঝে এখন আর ফোকটে রাত কাটবার কোনও মানে নেই। দু-চার খেয়ে ফষ্টিনষ্টি করতে পারি। তার বেশি কিছু নয়। এক সময় কেরিয়ারের স্বার্থে অনেক কিছু করতে হয়েছে। তবে এখন মোটামুটি টপে পৌছনোর পর নায়িকার রেটের মতো, তার দামও বেড়ে গেছে।

"ডোন্ট ইউ ওয়ারি। মেরা ড্রাইভার তুমহে ঘর তক ছোড় আয়েগা"

"জরুরত নেহি। মেরা ড্রাইভার হ্যায়"

"ফির শোচনে কা কেয়া? এনজয়... মেক ইওরসেলফ অ্যাট হোম। দ্য নাইট ইজ স্টিল ইয়ং"

তেরো বছর আগে, তখন আর কতই বয়স, বড়জোর বছর পনেরো। এই চামুণ্ডেশ্বরী ফিল্মস-এর মনিকান্ত মোহতা তাকে আবার ডেকে নেয়, তাদের 'উইনার' ছবিতে হিরোইন করে। আরেক নতুন শিল্পী রোহিত-এর বিপরীতে। সুপার-ডুপার হিট। হঠাৎই যেন টিমটিম করে জ্বলা, কৃষ্ণনগরের মফসসলের মেয়েটা, একটা ছোট্ট শহরের চৌহদ্দি ছেড়ে এসে পড়ল প্রখর আলো ঝলমলে জগতে। ইনস্ট্যান্ট সাকসেস!

কিন্তু জীবন কখনও সরলরেখায় চলে না। নদীর মতো এঁকেবেঁকে বয়ে যায় অনির্দিষ্টের পথে।

"আপনার উইনার তো দারুণ হিট করেছে"

অবন্তী গদগদ। সিনেমা পাড়ায় কেউ তাকে নামে চিনে তারিফ করছে, তার কাছে এটা বিরাট ব্যাপার। যেখানে পদ্মপর্ণাদি, অনুশ্রীদি, শুভ্রজিৎদার মতো উজ্জ্বল তারকারা টলি আকাশে নক্ষত্রের মতো জ্বলজ্বল করছে, সেখানে তার মতো নগণ্য হিরোইনের সঙ্গে কেউ দু-দণ্ড কথা বলতে পারে, ভাবতেই বুকটা কেঁপে উঠল। স্টার না হলেও কেউ তো তাকে চিনতে পেরেছে। এটাই বা কম কী!

কোনো প্রত্যুত্তর না দিয়ে মুচকি হাসল "আপনি?"

"সঞ্জীব। সঞ্জীব বিশ্বাস"

এই প্রথম অবন্তী ভালভাবে তাকাল সঞ্জীবের দিকে। চৌকো মুখ। রোগা হলেও বেশ ভারিক্কি চেহারা। মাথা ভর্তি চুল। হিরো হওয়ার মতো চেহারা না হলেও দেখতে মন্দ নয়।

"আমি অবন্তী। অবন্তী চ্যাটার্জি" ঘনঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। বুকের ভেতরে কী রকম যেন করছে। এর আগে কোনও ছেলের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে তো এমন হয়নি।

বুকের ধড়ফড়ানি বাড়িয়ে সঞ্জীব বলল "চা খাওয়ার ফুরসত আছে? চলুন তাহলে ক্যান্টিনে গিয়ে বসি"

ভাবার সুযোগ না দিয়ে টেকনিশিয়ান স্টুডিওর ক্যান্টিনের দিকে পা বাড়াল। ফিরেও দেখল না অবন্তী পেছনে আসছে কি না। সঞ্জীবের মেয়ে পটাবার কনফিডেন্স দেখে আশ্চর্য হল অবন্তী। যেন ধরেই নিয়েছে, অবন্তী তার পেছন পেছন আসবে।

"আপনি বুঝি হিরো হতে এসেছেন?"

"হিরো? এই থোবড়া দেখে কেউ আমায় হিরো করবে?"

পর্দার হিরো আর জীবনের হিরোর মধ্যে যে অনেক তফাত, ষোড়শীর বোঝার ক্ষমতা ছিল না।

"তাহলে এখানে জিরো হয়ে ঘুরঘুর করছেন কেন?" অবন্তী মুচকি হাসল।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল "মুম্বাইতে বেশ কিছুদিন অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরের কাজ করছি। ভাবছি এবার ছবি বানাব"

"এখানে? মুম্বাইতে নয় কেন?"

"মুম্বাইতে অনেক বড় বাজেটের ফিল্ম হয়। কেউ আমায় সুযোগ দেবে না। কলকাতায় পেলেও পেতে পারি"

"আহা রে। আমি যদি করিয়ে দিতে পারতাম। আমি তো পদ্মপর্ণাদি, অনুশ্রীদি, শুভ্রজিৎদার মতো তারকা নই। প্রথম হিরোইন হিসেবে ছবি হিট করে গেছে। কে আমার কথা শুনবে?"

"আমি তো বেশ শুনছি" সঞ্জীব মুচকি হাসল।

"আমার ভাগ্যি। আমায় তো কেউ গুরুত্বই দেয় না"

"আমি তো দিচ্ছি। তাই তো চা খেতে এলাম"

বেশ লাগছে ছেলেটিকে। বয়েসে তার থেকে বড় হয়েও তাকে কত গুরুত্ব দিচ্ছে। স্টুডিও পাড়ায় অবন্তীর তেমন খাতির নেই। নেহাৎ একটা ছবি হিট করে গেছে বলে দু-একজন একটু কনগ্র্যাচুলেট করেছে। ব্যস, ওই পর্যন্ত। ওদের কাছে এখনও বাচ্চা মেয়ে। বাচ্চাদের লজেন্স-চকলেট দেওয়া যায়, পাত্তা নয়।

ভালোলাগার রেসটা কখন যে ভালোবাসার আকার নিল বুঝতেই পারেনি। সিনেমার স্বপ্ন ভুলে তখন অনিকের দেখভাল, সঞ্জীবের ঘরসংসার সামলানো। সতেরো বছর বয়সেই অবন্তী পাক্কা গিন্নি। সংসার

টানতে, জীবিকার টানে সঞ্জীব ফের মুম্বাইতে।

যত রাত বাড়ছে, গণ্যমান্যরা নাইটকে রঙিলা করতে একে একে ঢুকছে। গজেন্দ্র ধনি হাসিমুখে আপ্যায়নে ব্যস্ত। ড্রিঙ্কসের ফোয়ারা ছুটছে, সঙ্গে স্ন্যাক্স, খাবার। হিসেবি হাসি, মাপা কথা। পরিচিত মুখগুলো। যাদের প্রত্যেক পার্টিতেই দেখা যায়। যাদের ছবি রোজ সকালের পেজ থ্রি, ট্যবলয়েডে।

অবন্তীর মাঝেমধ্যে মনে হয়, এরা তো ভিখারির চেয়েও অধম। এরা কি কখনও বাড়িতে রান্না করে খায়? পরের ঘাড় ভেঙে খাওয়াটা এদের মজ্জাগত। জাত সেলিব্রিটি। মিডিয়া খুশিমতো সেলিব্রিটি তৈরি করতে পারে, কিন্তু জিনিয়াস নয়। অবন্তীও সেই অভ্যাস এতদিনে রপ্ত করেছে। বিগশট হোস্টরা এদের সাকসেসের মাপকাঠি। টাকা খসিয়ে তো ওদেরই ধন্য করছে! শুধু মেধাহীন অবসরযাপন নয়।

প্রথম প্রথম বুঝত না। মোদ্দা কথা, টিকে থাকতে গেলে, সার্কিটে থাকতে হবে। যত মুখ দেখাতে পারবে, তত ছবিতে চান্স। বেশি সুযোগ। যত বে-আব্রু দেখাবে, তত কাটতি। নাম হওয়ার সঙ্গেই দাম বেড়ে গেছে। খোলার রেট এখন অনেক।

আগে তো খবরের কাগজে সাপ্লিমেন্টে ছবি বার করতে হলে রিপোর্টারদের সঙ্গেও শুতে হত। এখন দিন পাল্টেছে। ওসব সি গ্রেড লোকেদের পাত্তাই দেয় না। ডিরেক্টর হলে এক রেট, প্রোডিউসার হলে আরেক। ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট শোভন রায়চৌধুরির মতো মালদার পার্টি হলে, অনেক বেশি। অবন্তী আজকাল এদেরই প্রেফার করে। এমনিতেই সিনেমার বাজার মন্দা। লাইনের অনেকেই পলিটিক্সে ঢুকে পড়েছে পার্মানেন্ট ইনকামের জন্য। অবশ্য সবাই পড়তি। রূপ গেছে, যৌবন ধুঁকছে, দেহের কদরও নেই। কারও আবার ডিভোর্স হয়ে গেছে। বাচ্চা বড় হওয়াতে খরচ আরও বেশি। স্ট্যটাস মেন্টেন করতে গেলে টাকা চাই।

অবন্তীর অত খারাপ অবস্থা নয়! সাড়ে পাঁচ ফিট নিটোল দেহে, এখনও ভরা যৌবন। ভরাট বুক, নিতম্ব। গজদাঁতের ফাঁকে মিষ্টি হাসি। এখনও ফুরিয়ে যায়নি যে, খাতায় নাম লেখাবে। চিটফান্ড ধুঁকলে হবে কী। ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের কী টাকার অভাব! পা ফাঁক করে, যা পারো কামিয়ে নাও। ব্যাপারটা সিম্পল। বউ হয়ে সঞ্জীবের সঙ্গে শুলে, খাওয়া-পরা ফ্রি। অন্যদের সঙ্গে শুলে, কাঁড়ি কাঁড়ি মালকড়ি।

অনীক হওয়ার পর সিনেমা কোথায়? পাঁচ বছর কোনও ছবিই করেনি। শুধু হেঁসেল ঠেলা, ফাই-ফরমাস খাটা, অনিকের দেখভাল। আর মাঝরাতে সঞ্জীবের মনোরঞ্জন। পাকা গিন্নির মতো তা-ই তো করছিল। আর ঘরে বসে মুটিয়ে, টিভি দেখে, সময় কাটিয়ে, হাঁপিয়ে উঠছিল। সঞ্জীবের তখন রোজগারপাতি তেমন নয়। তাই যখন অংশু গাঙ্গুলি টেলিফিল্মের অফার দিল, সঞ্জীব আপত্তি জানাতে পারল না। সংসার চালাতে গেলে টাকার দরকার। পরে 'তাড়াহুড়ো প্রেম' আর 'নায়িকার গপ্প' দুটো টেলিফিল্ম জুটে গেল। অ্যাক্টিং কী করেছিল, নিজেই জানে না। কিছু আমদানি। ক্ষতি কী?

সব-ই তো বৃহত্তর মনোরঞ্জনের অঙ্গ। সঞ্জীব-ই তো তার পরিধি দেখিয়েছে রুপোলি পর্দার বাইরে।

"আপকা লাস্ট প্রোডাকশন তো বক্স অফিস মে কামাল কর দিয়া" একগাল হেসে ওয়াইনের গ্লাস হাতে দীপশিখা গজেন্দ্র ধনির দিকে মন্তব্য ছুড়ে দিল।

নায়িকা হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে বেশ কয়েকটা সিরিয়াল করার পর, জয়ন্ত রাজার পরিচালনায় দু-একটা ছবিতে হিরোইনও হয়েছিল। শুনেছে, ঝগড়াটে বদ-মেজাজের জন্য ইন্ডাস্ট্রি ক্রমশ একঘরে করে দিয়েছিল। তারপর

মুম্বাইতে গিয়েও কিছু করতে পারেনি। ফেরত এসেছে। নায়িকার চেহারা নেই। এখন যদি গজেন্দ্রকে মস্কা মেরে আর কিছু পাওয়া যায়।

পার্টি নয়তো, ধান্দার মজলিস। বেশ কিছু পড়তি তারকা খিলখিল করে হাসছে। আসলে হাউই। দম ফুরিয়ে গেছে। ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় বুকের আঁচল খসে পড়ছে। কারণে-অকারণে পুরুষের গায়ে ঢলাঢলি। যদি কিছু হয়...

এসব ব্যাপারে অবন্তী খুব ডিসক্রিট। এসব ওর পোষায় না। চান্স দাও। তোমার বাগানবাড়িতে নাইট ডিউটি দেব। মালকড়ি ছাড়ো। আমি প্রস্তুত। এসব পাবলিক বেলেল্লেপনা অসহ্য। কমপ্লিটলি আনপ্রোডাক্টিভ।

"কেমন আছিস? কাজকর্ম ঠিকঠাক চলছে তো?" শুভ্রজিৎ ঢুকেই অবন্তীকে জিজ্ঞেস করল।

একগাল হেসে মাথা নাড়ল অবন্তী। এই শুভ্রজিৎদার সঙ্গেই তো তার প্রথম ছবি 'স্বপ্ন বন্ধন'। এখনও শুভ্রদা তাকে সেই ছোট্ট খুকিটি মনে করে। বিয়ে হল, বাচ্চা বড় হচ্ছে, নামী হিরোইন হল, তবু শুভ্রজিৎদার কাছে সে 'স্বপ্ন বন্ধন'-এর সেই ছোট্ট মেয়েটা।

"শুনছি ভালো কাজকম্ম করছিস। চালিয়ে যা..." শুভ্রজিৎদা কদ্দুর তার আর সঞ্জীবের খবর জানে, বোঝা গেল না। এড়িয়ে গেল। অবশ্য আশা করেনি পাবলিকলি এসব ডিসকাশন করবে।

ঝানু লোক শুভ্রজিৎদা। এতদিন ইন্ডাস্ট্রিতে আছে। মেপে কথা বলে। সকলের সঙ্গে সদ্ভাব। কিন্তু তলে তলে গোটা ইন্ডাস্ট্রিটাকে কবজা করে রেখেছে ও আর গজেন্দ্র ধনি। ওদের পথে না হাঁটলে, সন্তর্পণে চেপে ছেঁটে দেবে। গজেন্দ্র, বিজিত মুখার্জি ও অন্যান্যরা ওর সঙ্গেই ভিড়ে গেল। বোঝাই যায়, ওদের টিকিও ধরে রেখেছে অলক্ষ্যে।

গজেন্দ্র বেয়ারাকে ইঙ্গিত করল। ডবল সিঙ্গল মল্ট হাতে তুলে নিয়ে পুরু গোঁফের ফাঁক দিয়ে মুচকি হাসি। বিজিতের দিকে তাকিয়ে বলল "তোমার নতুন স্ক্রিপ্ট কদ্দুর?"

"নামিয়ে এনেছি"

"কী নিয়ে?"

"এবার নটি বিনোদিনীর ওপর"

"চলবে?"

"তোমার আশীর্বাদ থাকলে সুপার-হিট হবে"

কোনও জবাব না দিয়ে মুচকি হাসল। বাংলা ছবির একচ্ছত্র নায়ক হলেও অবন্তীর মতো ইন্ডাস্ট্রির অনেকেই জানে, পুরো ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক কন্ট্রোল করে শুভ্রজিৎদা আর চামুণ্ডেশ্বরীর দুই কর্ণধার, গজেন্দ্র আর মনিকান্ত।

সব সম্পর্ক শুধু ধান্দার আলিন্দে ঘোরাফেরা করে। অল্প বয়সে যখন বিয়ে হয়েছিল, তখন কি বুঝতে পেরেছিল? সে বয়সে জীবনের কতটুকুই বা দেখেছে। বিয়ে হওয়ার পরই প্রেগন্যান্ট। ঘর সংসার আর অনীকের দেখভাল নিয়ে বেশ কেটে যাচ্ছিল। এক সঞ্জীব ছাড়া, ফিল্মি দুনিয়ার সঙ্গে খুব একটা সম্পর্ক নেই। হঠাৎ এক দুপুরে, পাঁচ বছর পর, তার প্রথম হিট ছবির পরিচালক মনি কিনাগির ফোন "সিনেমা করবে?"

বুকটা কেঁপে উঠল। আড় চোখে দেখল অনীক দিব্যি ঘুমচ্ছে। আশাও করেনি, কোনও পরিচালকের কাছ থেকে ডাক পাবে। হয়ত প্রথম ছবিটা হিট হয়েছিল বলেই মনির তাকে মনে পড়েছে।

আমতা আমতা করে বলল “জানি না”

“জানো না মানে? দারুণ স্ক্রিপ্ট। সালজবারগে বেশ কিছু আউটডোর শুটিং আছে”

আউটডোর শুটিং-এর কথা শুনে, আরও ঘাবড়ে গেল। তখন সে ঝাড়া হাতপা। এখন বিয়ে হয়েছে, বাচ্চা আছে। দুম করে ঘরসংসার, ছেলে ছেড়ে চলে যাওয়া যায় নাকি!

“সঞ্জীবকে জিজ্ঞেস করতে হবে”

“বেশ। জিজ্ঞেস করে আমাকে ফোন কোরো”

ভেতরে চাপা উত্তেজনা। প্রপোসালটা একঘেয়ে জীবনে এক নতুন হাওয়া এনেছে। ডাক দিচ্ছে ফেলে আসা জগৎ। বাইরের টান, সঙ্গে বিদেশে যাওয়ার প্রথম সুযোগ। এই টানাটানির সংসারে মুফতে তো কেউ টাকা দেয় না। ঘরে বসেও রোজগার হয় না। সঞ্জীবের স্বল্প রোজগারে যদি একটু সাহায্য হয়, মন্দ কী?

সঞ্জীবকে কথাটা পাড়তেই বলল “না... না... সিনেমা করবে কেন, সংসার ফেলে”

অবন্তী বোঝাবার চেষ্টা করল “তোমার এখন রোজগারপাতি ভালো নেই। কিছু টাকা তো ঘরে আসবে। অনীককে মানুষ করার জন্যও তো টাকার দরকার”

রাতে শুয়ে কথাটা ভাবতেই সঞ্জীবের মনে হল, ভুল তো কিছু বলেনি। মুম্বাইতে কাজ করে, হাতে যে কটা কাজ ছিল, তাও প্রায় শেষ। সামনে রোজগারের পথও নেই। হপ্তাখানেকের তো বাইরে কাজ। সে ঠিক অনীককে ম্যনেজ করে নিতে পারবে। মনির নতুন ছবি ‘লাভ’ সই করল অবন্তী। ঘর গিয়ে দাঁড়াল বাইরে।

সালজবারগ!

অবন্তীর কাছে স্বপ্নের দেশ। আসার আগে সঞ্জীব বলেছিল, এটা নাকি মোজার্ট-এর জন্মভূমি। মোজার্ট-এর নাম শুনছে মাত্র। তাঁর বাজনা শোনা হয়নি। অত বিদেশি গান বোঝে না। তবে রোমাঞ্চ লাগছে এই ভেবে, যেখানে এক সময় ‘সাউন্ড অফ মিউজিক’-এর শুটিং হয়েছিল, সেখানেই কাজ করার সুযোগ পেয়েছে। অ্যাল্পসের আন্টারসবারগ পাহাড়ের কোলে টেক। ওই ঠান্ডায় ঘনঘন কস্টিউম পালটে কোট ছাড়া শট দেওয়া রীতিমতো কষ্টকর। তবুও ভূস্বর্গের মনমোহিনী সৌন্দর্য, সবকিছু ভুলিয়ে দিয়েছে। গা গরম রাখতে, শটের ফাঁকে ক্রু-র লোক ব্র্যান্ডি দিচ্ছে।

নতুন নায়ক কিরণ চ্যাটার্জি বেশ মিশুকে।

উঠেছিল হোটেল টরেনার হফে। সস্তার হোটেল। খুব পরিষ্কার, তাও নয়। সেটাই অবন্তীর কাছে স্বর্গ। ইউনিটের এত লোক নিয়ে বাংলা ছবির প্রযোজক এর থেকে আর ভালো আর কোথায় রাখতে পারে? ডবল বেডেড রুম। যদিও ইউনিটে সে একা মহিলা, এক নতুন অ্যাকট্রেসের জন্য আলাদা ভাড়া খরচ করলে বাজেট বেড়ে যাবে। তাই নায়ক কিরণ তার সঙ্গে।

“ভালো শট দিয়েছ” কিরণ বলল।

“ঠিক হয়েছে তো! জুতো পরে বরফের ওপর নাচা... পা স্লিপ করে যাচ্ছিল। এসব পাহাড়ি এলাকায় তো আগে কখনও আসিনি” অবন্তী স্বাভাবিক ভাবেই বলল।

“ভয় নেই। ঠিক মতো করে যাও। ধরার জন্য তো আমি আছি” কিরণ মুচকি হাসল।

বিয়ের আগে, কোনও পুরুষের সঙ্গে থাকতে হয়ত ইতস্তত করত। কিন্তু এখন ওসব জড়তা কেটে গেছে। কী আর এমন হবে? বড়জোর সম্ভোগ করবে, ব্যস। কতদিন সঞ্জীব সহবাস করেনি। ও কি ভুলে

গেছে বউয়েরও খিদে থাকতে পারে? শেষের দিকে তো বেশিরভাগ সময়টাই মুম্বাইতে। এই ঠান্ডায় যদি কেউ গা-টা একটু গরম করে দেয়, মন্দ কী। করলও।

অবন্তীর চাওয়া বুঝতে অসুবিধা হয়নি কিরণের। এই কনকনে শীতে, রামচন্দ্রের উষ্ণ ছোঁয়ায়, অহল্যা যেন তার হারানো তৃপ্তি ফিরে পেল। শুটিংয়ের কাজটা আরও সহজ হয়ে গেল।

যত রাত বাড়ছে পার্টি তত জমে উঠছে।

ঢলাঢলি... কোলাকুলি... আলাপ... সংলাপ... বিলাপ... প্রলাপ...

যে যার মতো হিসেব বুঝে নিচ্ছে। শো-বিজ আজব পৃথিবী।

অবন্তীর দম বন্ধ হয়ে আসছে। ‘লাভ’ হিট করার পর ওকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। খুব ভালো করেই জানে, যতদিন বাজারে কাটবে, অফারের কমতি থাকবে না। জায়েগা বুঝে প্রয়োজনে সিটিং দিয়ে যাও। এসব পার্টি স্ক্যামের মধ্যে থাকতে চায় না। বেফাঁসে মিডিয়া কিছু লিখে দিলে, তার লাভলি গার্ল, সহজ সরল ইমেজটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সঙ্গে আগামী ছবির সম্ভাবনাও।

গজেন্দ্রর ভিড়ে উঁকি মেরে বলল “জানা হ্যায়। কাল শুটিং”

“কুছ খায়া তো?”

“থোরা বহুত”

রাতের অন্ধকারে গাড়ির ব্যাক সিটে গা এলিয়ে মনে হল, এই সাত বছরে অনেক পথ পার হয়ে এসেছে। একদিকে পাওয়া, অন্যদিকে হারানো। এই খেলা চলতেই থাকবে। কালকে দুটো সিনেমা ঝুলে গেলেই ফাঁকা। মেক হে হোয়াইল দা সান শাইনস।

অভাবের দুনিয়াটাকে মফস্সলের মেয়েটা খুব কাছ থেকে দেখেছে। সেখানে আর ফেরত যেতে চায় না। সে গ্ল্যামার থাকুক, চাই না থাকুক। ভবিষ্যৎকে বেঁধে ফেলতে হবে ক্ষণিকের স্টারডমে। সেখানেই পূর্ণতা।

পাঁচ

বহু ফ্ল্যাশের ঝলকানি জানান দিল, দেওয়ালি এসেছে। একটু দেরি হয়েছিল। সাজের কোনও খামতি নেই। জার্মান কন্সলেটের পার্টি বলে কথা। রণদীপ ভুটোরিয়ার বিশেষ আমন্ত্রণে হাজিরা। কালো ফুল-লেংথ গাউনের ওপর মুক্তর সেট। শ্যামলা চেহারায় অন্য মাত্রা দিয়েছে।

কী আশ্চর্য!

বিদ্যাসাগর কলেজে কিংবা সল্ট লেকে পিজি অ্যাকমডেশনে থাকাকালীন তো কাউকে এভাবে আকৃষ্ট করতে পারেনি। আকর্ষণের ব্যাপারটাই জানত না। ইট ইজ নট হাউ ইউ লুক, বাট হাউ ইউ ক্যারি ইওরসেলফ। শো-বিজ দুনিয়ায় ঢুকে, সেটাই শিখেছে। নিজেকে কী করে আকর্ষণীয় আর দামি করে তুলতে হয়, ম্যাগ্নেটিজমের মূলমন্ত্র। আনকোরা দেওয়ালিকে সেটাই শিখিয়েছিল মনি কিনাগি।

অবজ্ঞা থেকেই মাথায় ভূত চেপে গেছিল জনমোহিনী হওয়ার। কী করে রাজাবাজার সাইন্স কলেজের স্নাতকোত্তর কেমিস্ট্রিতে রিসার্চ ছেড়ে অভিনেত্রী হয়ে গেল, নিজেই জানে না। ছোটবেলায় কিছু নাটক করেছিল। ক্লাসিক্যাল নাচও শিখেছিল, তবে ছবিতে অভিনয় করার কথা কোনদিনও ভাবেনি। সাব-কন্সাসে উপেক্ষাই বোধহয় জেদটা বাড়িয়ে দিয়েছিল।

"সিরিয়াল করবি?" দেওয়ালির মনের ইচ্ছেটা জেনেই তপতী কথাটা পাড়ল।

বারো বছর আগের কথা এখনও ভোলেনি। "কে নেবে?"

"আমার মামা, সিরিয়ালের বড় ডিরেক্টর অবিনাশ সেনগুপ্ত"

একেই বলে কপাল। 'জুয়াখেলা' সিরিয়ালে চান্স পেয়ে গেল। রিসার্চের স্বপ্ন শেষ। শুরু হল জীবনের আরেক অধ্যায়। প্রথম সিরিয়ালে তেমন কোনও দাগ ফেলতে পারেনি। কিন্তু দ্বিতীয় সিরিয়াল 'লগ্নের অতিথি' সুপারহিট। ছয় বছর ধরে চলল। তারপর আর ফিরে তাকাতে হয়নি। চাঁদের আলোয়, মায়া, অধরা - একটার পর একটা মেগা। বদমেজাজি দীপশিখা যত সিরিয়াল থেকে বাদ পড়ছে, দেওয়ালির কদর তত বাড়ছে।

"দেওয়ালিদি একটু এদিকে..." মিডিয়া নানা অ্যাঙ্গেলে। আগামী দিনের জন্য। বেশ কয়েকটা ট্যাবলয়েড ছবিগুলো বিক্রি করে কিছু কামিয়ে নেবে।

পেজ থ্রি-তে ছবি না বেরলে কী সেলিব্রিটি হয়! না হলে কী লোকে ফিতে কাটার জন্য গ্যাঁটের টাকা খরচ করে ডেকে নিয়ে যাবে? কন্সিউমার সোসাইটিতে সব-ই ইন্টার রিলেটেড। দেওয়ালি কন্সিউমারিজমের একনিষ্ঠ পূজারি।

বাংলা টিভির প্রোগ্রামিং ডিরেক্টর মৃন্ময় ঘোষ এগিয়ে এল "একটা স্লট পাওয়া যাবে? ইন্টারভিউ নিতাম"

মিষ্টি হেসে জবাব "দু মাসের মধ্যে কোনও ফুরসত নেই"

"একটু যদি সময় দাও..."

যতদিন স্টার হয়নি, অফুরন্ত সময় ছিল। মিডিয়াতে ফোকটে বকবক। এখন সময় মানে কামাই। নয়তো রেস্ট। ফোকটে পাবলিসিটির পেছনে সময় নষ্ট করার মানেই হয় না।

"আমি তো আপনাদের মধ্যেই আছি। সময়মতো দু-চার কথা রেকর্ড করে নেবেন। আলাদা করে সময় বের করা মুস্কিল"

ধুরন্ধর মৃন্ময় ঘোষকে পাশ কাটিয়ে গেল। চেনা পাপী। আগে 'হেরিটেজ অফ ইন্ডিয়া' পত্রিকার সাপ্লিমেন্টারি ট্যাবলয়েড দেখত। পাবলিসিটির নামে কত টাকা বাঁ হাতে আত্মসাৎ করেছে আর কত মেয়ে নিয়ে মুফতে ফুর্তি করছে, দেওয়ালি ছাড়াও অনেকের জানা। দেওয়ালি সে পথ কোনদিনও মাড়ায়নি। একমনে কাজ করে গেছে। কপালে থাকলে নাম হবেই। সেদিন যদি মৃন্ময় ঘোষকে প্রয়োজন না হয়ে থাকে, আজ-ই বা সময় নষ্ট করবে কেন?

সিরিয়ালে সহজেই চান্স পেয়েছিল। রুপোলি পর্দার ঝক্কিটা অনেক বেশি। জমি পাওয়া ততটা সহজ ছিল না।

তৃষ্ণা রায়ের ছবিতে যদিও বা প্রথম সুযোগ জুটল, মুক্তি পেল আট বছর পরে। তখন তো সে প্রতিষ্ঠিত। ন-বছর আগে মনি কিনাগির 'অগ্নিকন্যা', পরের বছর দিবানাথ চক্রবর্তীর 'গণ্ডগোল', তারপরে 'তোমায় ভালবাসি'। সবগুলোতেই সাইড রোল। নায়িকা হওয়ার সুযোগই পাচ্ছিল না। তবু হাল ছাড়েনি। স্থায়িত্বের জন্য ধৈর্য আর অধ্যবসায় প্রয়োজন।

শেষমেশ 'অবেলায়' ভাগ্যের ক্যাসিনো জ্যাকপট দিল। নতুন ঝংকার। অসাধারণ অভিনয় দক্ষতা তাকে সহ-নায়িকা থেকে নায়িকার আসনে বসিয়ে দিল। আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। কোনও এক কারণে বেশ কয়েকটা ছবি আজও মুক্তি পায়নি।

বিবর্তনের ঘূর্ণিঝড়ে যখন জীবনের উড়োজাহাজটা মাঝ-আকাশে টালমাটাল, ঠিক সেই সময়, ছবি করতে গিয়েই, রাজাদিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা, অন্তরঙ্গতা। সে আরেক কাহিনি। আজ রাজাদিত্যর ফোন পেয়ে দেওয়ালির মনে হল, এখন তো তার এগোবার সময়। কেন-ই বা রাজাদিত্য। অতীত স্মৃতির ব্যাকড্রপ।

"আরে ইধর তো জরা আও" রণদীপ ভুটোরিয়া ভিড়ের মধ্যে থেকে ঈগলের মতো তুলে আনল দেওয়ালিকে "পহচানতে হো?"

"কলকত্তে মে প্রদীপ গোয়েঙ্কা কো কৌন নেহি পহচানতে?" ওয়াইনের গ্লাস হাতে গোয়েঙ্কা সাহেবের সামনে।

কাঁচাপাকা গোফের ফাঁক দিয়ে সাহেবের স্মিত হাসি "পরদে মে কই বার দেখা। মুলাকাত নেহি হুয়া। ইউ আর এ ফাইন অ্যাক্ট্রেস"

"থ্যাঙ্ক ইউ" মনমোহিনী হাসি।

ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, রণদীপ তাকে এর সঙ্গে ভিড়িয়ে দিল কেন। কলকাতার অন্যতম ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট প্রদীপ গোয়েঙ্কা। নাম জানলেও, পরিচয় হয়নি। ইন্ডাস্ট্রিতে কানাঘুষো, ব্যবসা এবং রুলিং পার্টিকে তোষামোদ করা ছাড়া, মেয়েদের প্রতি দুর্বলতার কথাও। কিন্তু পদ্মপর্ণাদি থাকতে আবার সে কেন?

নাও তো হতে পারে।

ছয়

ধ্যত, সময়টাই ঠিক যাচ্ছে না। কিছুই ঠিক লাগছে না।

এখন আবার আরেক উটকো ঝামেলা। কোন হিরোইন কোন চিত্রপরিচালক-নাট্যকার-বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে হোটেলে ফষ্টিনষ্টি করতে গিয়ে হাত কেটে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছে, তার পেছনে ছোটো। কভার স্টোরি কর। মশলা মিশিয়ে বাজারে ছাড়ো।

মিডিয়ার চাকরি বলে কথা...

একেবারে খোদ মালিক ধূর্জটি রায়ের ইন্সট্রাকশন। এখনও কোনও প্রফিটের মুখ দেখেনি। বিবিপি-র সঙ্গে টেক্কা দিয়ে পেরে উঠছে না। সেলস আরও বাড়াতে হবে। লসে রান করা চ্যানেল জাস্ট অ্যাবাউট, ব্রেক ইভেন করে টিকে আছে, স্টাফদের মাইনে দিয়ে। অ্যাড থেকে সেরকম প্রফিটেবল এক্সপেন্স উঠছে না। অতএব সেলস, প্রোগ্রামিং সব মাথাদের সজাগ করে দেওয়া।

মৃন্ময় ঘোষের ত্রাহি দশা। দেওয়ালির ফোকটে টাইম দেবার মতো সময় নেই। যেটুকু পাবলিসিটির দরকার ছিল, হয়ে গেছে। এখন নো মানি, নো টাইম। তাই মৃত্তিকা-ধীমানের কাহিনির পেছনে ছোট। নিউ টাউনের হোটেল থেকে অ্যাপোলো। টিমকে ভিড়িয়ে দাও রসালো কাহিনি ফাঁদতে।

“গুছিয়ে স্কুপটা বানাতে হবে। এমন কিছু চাই যা অন্য মিডিয়ার আগেই বাজারে যাবে” সৈকত ঘরে ঢুকে বলল।

বাংলা টিভির সিইও সৈকত চ্যাটার্জিও চিন্তিত। খুব ভালো করেই জানে, প্রোডাক্টিভ না হলে যে কোনও সময় বালির ভিতে নড়বড় করা চ্যানেলটাই উঠে যেতে পারে। বালি সরলেই, গভীর খাদ। ধূর্জটি রায়ের কী? ও জানে টুপি পরিয়ে, নতুন করে কী করে আবার বিজনেস ফাঁদতে হয়। সৈকত তো মিডিয়া ছাড়া আর কিছুই জানে না। চ্যানেল বন্ধ হলে খাবে কী? আগামী সিনেমাগুলোর প্রোডিউসারও হারাবে।

ধূর্জটি পাত্তি বোঝে। টিকে থাকার জন্য, ভেনচার ক্যাপিটায়ালিস্টদের ভাঁড়ারে মুনাফা গুঁজে দেওয়া। না হলে অন্য বিজনেসের ফাইন্যান্স পাবে কোত্থেকে? স্কুটার নিয়ে ফেরি করা লোক-ই জানে, রাস্তায় নামার কষ্টটা। সে সৈকত হোক, আর যেই হোক আবেগ, বিবেকের কোনও ব্যাপার নেই।

“রূপসা, রিঙ্কু, মহুয়া, অরিন্দম সব্বাইকে লাগিয়ে দিয়েছি। এক দল সুইসওটেলে গেছে, আরেক দল অ্যাপোলোতে” মৃন্ময় সৈকতকে চায়ের কাপটা এগিয়ে দিল।

“তোমার”

“তুমি খাও না। আমি আরেকটা অর্ডার দিচ্ছি” বস বলে কথা। সৈকতদাকে আগে না দিয়ে খাওয়া যায়?

বেশি দিনের আগের কথা নয়।

‘হেরিটেজ অফ ইন্ডিয়া’ থেকে ছাটাই-এর পর ত্রাহি অবস্থা। যা উপরি কামিয়েছিল, এ এম আর আই-তে মায়ের চিকিৎসার জন্য সব নিঃশেষ। একটা গ্যাস্ট্রিক প্রবলেম থেকে ব্রেন ডেথ। বাঁচার কোনও আশাই ছিল না। ডাক্তাররা জবাব দিয়ে দিয়েছিল। শুধুমাত্র ডাঃ বিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতযশে মাকে ফিরিয়ে আনতে পেরেছে। এতদিনের হারামের কামাই মায়ের চিকিৎসায় সদব্যবহার করে পাপক্ষালন। চব্বিশ ঘণ্টার নার্স। চাকরি নেই। সংসার চলবে কোত্থেকে?

শালা ডাঃ অরিজিৎ বসুর চিঠিতেই চাকরিটা গেল। কী আর এমন করেছিল? বিশ্বজিৎদার দেখানো পথে, বাঁ হাতে সেও টু পাইস কামিয়ে নিচ্ছিল। অনেকেই তো এমন কামায়। আদর্শবাদী অরিজিৎ বসুর সেটা সইল না।

বাঁশ!

নিজে না দিলেও, সেভাবেই এসেছিল।

সে সময় মিডিয়ার পুরনো ঝানু খেলোয়াড় সৈকতদাই তো বাংলা টিভিতে সুযোগ দিয়ে সংসারটাকে বাঁচিয়েছিল। সেকথা ভোলে কী করে মৃন্ময়?

“অ্যাফেয়ারের কথা অনেকদিন ধরেই জানি। মৃত্তিকা একটা চিজও বটে। সব সময় লাইম-লাইটে থাকতে চায়। ফর রাইট অর রং রিজন্স”

“ভালোই তো। না হলে, আমাদের চলবে কোত্থেকে? পলিটিক্যাল স্ক্যাম আর সেলেব বিক্রি করেই তো চ্যানেল চলছে। না হলে কবে বন্ধ হয়ে যেত। অবশ্য তোমার ব্যাপারটা একটু আলাদা। মাঝেমধ্যে সিনেমা করে, উপরি কিছু হয়”

“চলে কোথায়? ওই নামকেওয়াস্তে। বুড়ি ছুঁয়ে রাখা। হতে চেয়েছিলাম ফিল্ম ডিরেক্টর। হয়ে গেলাম টিভি ডিরেক্টর”

“তবুও তো সিনেমার নামে প্রোডিউসারের ঘাড় ভেঙে কিছু কামিয়ে নিতে পার এধার-ওধার থেকে। আমার তো তাও নেই। কেবল মাসমাইনে ছাড়া”

এক সময়, মৃন্ময় ঘোষেরও অনেক উপরি ছিল। খেলাটা শিখেছিল লেট বিশ্বজিৎ দাসগুপ্তর থেকে। যখন ওরা দুজনেই ‘হেরিটেজ অফ ইন্ডিয়া’ তে কাজ করত। স্বর্গত বিশ্বজিৎ দাসগুপ্তই বাজারে প্রথম খবরের কাগজের সাপ্লিমেন্টের কনসেপ্টটা আনে। চনমনে রসালো কেচ্ছা। আধা-নগ্ন ছবি দিয়ে ভরিয়ে দাও আট পাতা সাপ্লিমেন্ট। বাজারে ছাড়তেই কেল্লা ফতে। রমরম করে খেয়ে নিল পাবলিক। এই পাবলিসিটির কত ডিমান্ড। উঠতি সেলেবরা ছবি বার করতে যে কোনও মূল্য দিতে প্রস্তুত। নেক্সট দিনে ছবি ছাপাবার জন্য দিনেরাতে পা ফাঁক করে শুয়ে পড়তে উদগ্রীব। শুধু দর হাঁকো, বান্দা হাজির।

দিনে সেলেব, রাতে ধান্দার সওদাগর।

অজান্তাকে আজও ভুলতে পারে না মৃন্ময়। আচমকা একদিন বিশ্বজিতের ঘরে হাজির। ওর ঘরেই মৃন্ময় কফি খাচ্ছিল। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছিল অজান্তার দিকে। উপচে পড়া বুক, পরিপূর্ণ নিতম্ব, উচ্ছ্বল যৌবন।

“একটা ছবি যদি বার করেন...” আমতা করে অনুনয়।

“রোজই তো কত মেয়ে আসে। সবাইকে দিয়ে গ্ল্যামারের কাজ হয় না” বিশ্বজিৎদা ওকে পাত্তাই দেয়নি।

"আমাকে দিয়ে হবে" অজান্তা নাছোড়বান্দা।

"তুমি কী ভাবে স্পেশাল?"

টপসের বোতাম দুটো খুলে বলেছিল "বিশ্বাস না হলে পরখ করে দেখে নিতে পারেন"

মৃন্ময়কে দেখে গম্ভীরভাবে অজান্তাকে বলেছিল "ওখানে গিয়ে বস। এটা অফিস"

মৃন্ময় কী করবে বুঝতে না পেরে, ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে উঠে পড়েছিল "আসি বিশ্বদা। পরে কথা হবে" কফিটা শেষ না করেই বেরিয়ে এসেছিল।

বাকির অংশটুকু অনুমান করা কঠিন নয়। ভোগ কী জিনিস, বিশ্বদার কাছ থেকেই শেখা। শেষ পর্যন্ত স্ক্যামে ট্যাবলয়েড ছাড়তে বাধ্য হল। তার গদিতে উঠল মৃন্ময়।

ফর মেন মে কাম অ্যান্ড মেন মে গো, বাট আই গো অন ফর এভার - মানুষ পাল্টাতে পারে, কিন্তু মিডিয়ার খেলা পালটায় না। চলতেই থাকে এক নিয়মে। 'হেরিটেজ অফ ইন্ডিয়া'-র মসনদের পদে থাকা যে মানুষই হোক না কেন, খেলে চলে বিশ্বজিৎদার নামাবলি পরে।

বিশ্বদার শেষ, মৃন্ময়ের শুরু।

গুরুর প্রসাদ পায়নি বটে, গুহ্যবিদ্যাটা ভালোই শিখিয়েছিল। শুধু শেখায়নি লাইফ লাইন। গদিতে বসে সদর্পে সেই খেলা খেলতে গিয়ে যে দু-একবার যে হোঁচট খেতে হয়নি, এমন নয়। তাতে কী? এই টেরা পথে একটু হোঁচট খাবে না, তা কি হয়?

চিত্রশিল্পী রিয়া ঘোষাল তাদেরই একজন। মাঝরাতে টালিগঞ্জে ফষ্টিনষ্টি করতে গিয়ে কষে সপাটে চড়।

"গেট আউট অফ মাই কার, ইউ স্কাম" রিয়ার চিৎকার আজও ভোলেনি।

কেউ না জানলেও, অতীতের এমন টুকরো স্মৃতি মাঝেমধ্যে আর্কাইভ থেকে উকি দিতে চাইলেও, আমল দেয়নি। লটঘট করতে গেলে এমন একটুআধটু মুখ ঝামটা গা ঝেড়ে উড়িয়ে দিতে শিখেছে। ট্যাবলয়েড মানে পাবলিসিটির নামে মেয়েমানুষ আর টাকা। ডাক্তার, উকিল থেকে পাবলিসিটি হাংরি মানুষ মানেই, পাত্তি ফেল, তবেই খবর।

তবে দিগ্বিজয় ভট্টাচার্য বা বিমান চাটুজ্জের কাছে তা নেহাৎ কম। অ্যাচিভমেন্ট? সোজা কথা। নিজের ঘরের নিভৃত থেকে জনসমক্ষে আসতে গেলে মালকড়ি ফেল। তবেই সেটা খবর।

বিমানদা তো শুধু গুছিয়ে খবর লিখেই খালাস। দিগ্বিজয় এক ডিগ্রি ওপরে। ব্ল্যাকমেলিং-এ মাস্টার। তার কুমড়োর মতো গিন্নি, মায়া ভট্টাচার্য নেট-ওয়ার্কিং করে ক্লায়েন্ট ধরে। অনেক সময় টাউট দিয়ে উইক পয়েন্ট খুঁজে বার করে তাকে কাজে লাগায় আমদানির জন্য। ব্যালেনশড ইকোয়েসশন।

আহাঃ!

মৃন্ময়েরও যদি ওরকম মডার্ন হাইস্কুলে পড়া ইংরেজি বলা ভাষ্যকার বউ থাকত! সবার তো, মায়ার মতো একদা ভাষ্যকার বউ জোটে না। ঠিক জানে, ইন্ডিয়ার কোন প্রান্তে জাল বিছিয়ে মুরগি তুলতে হবে। একেই বলে ইংলিশ মিডিয়ামের মহিমা।

রিয়া মারাত্মক কি না, পরখ করার সৌভাগ্য হয়নি। তবে চিনতে ভুল হয়েছিল।

রিয়া ঘোষাল।

অন্য সব সেলেবদের থেকে নন-সেলেব হয়েও আলাদা। ছিপছিপে ছোটখাটো চেহারা। কিছু ক্ষমতা আছে, মানতেই হবে। টালিগঞ্জের বস্তি থেকে উঠে আসা। নিজের চেষ্টায় কলকাতা সেলিব্রিটি মহলে জায়েগা করে নিয়েছে। প্রতিভার থেকে নেটওয়ার্কিং বেশি।

যুগের মাপকাঠিতে প্রতিভার বিন্যাস কোথায় স্থান করে নেয়, সময়ই বলে দেবে। কিন্তু নেটওয়ার্কিং যে আপেক্ষিক স্টারডমের ক্ষেত্রে অপরিহার্য, সেটা পেজ থ্রির পাতা ওলটালেই বোঝা যায়। পার্টি, মদ, ঢলাঢলি, ছবি ছাপানো, টিভিতে ইন্টারভিউ, এগুলোর যে একান্ত প্রয়োজন, আজকের যে কোনও সেলিব্রিটি বলে দেবে। মোদ্দা কথা, স্টে ইন নিউজ বাই এনি মিন্স। দ্য কি টু লাইমলাইট। মাহাত্ম্যের আছিলায় আরও কিছু গুছিয়ে নেওয়া।

গুছিয়ে নিতে পেরেছে কি না, রিয়াই বলতে পারবে। তবে টালিগঞ্জের এঁদো গলি থেকে কলকাতা কিংবা ইউরোপের কোনায়, নিজেকে তো মেলে ধরতে পেরেছে। তখন কতই বা বয়েস। স্কুল ছেড়ে কলেজে। আকাশ কর্মকারের কাছে ছবি আঁকা শিখছে। অনেক সময়ই দেরি হয়ে যেত।

"মেয়েটা ছেলে চড়িয়ে বাড়ি ফিরল। খেতে দাও গো..." বাবার প্রচ্ছন্ন বিদ্রুপে গা টা রিরি করলেও, মুখ বুজে সহ্য করেছে।

একলা ঘরে কাঁদলেও, সে কান্না শোনার কেউ ছিল না। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। করে দেখিয়ে দেবে সে বেশ্যা নয়। দিয়েওছে।

তাইত সেদিন মৃন্ময়কে কষে থাপ্পড় মারতে পেরেছিল। বাবার বিদ্রুপকে যদি নিঃশব্দে থাপ্পড় মেরে থাকতে পারে, মৃন্ময় কোন ছাড়?

"হবে হবে, সব হবে। জায়েগা মতো ঢেলে যাও আর খেলে যাও..." সৈকত সান্ত্বনা দিল।

"সৈকতদা আপনি তো বস। আমি নিতান্তই চুনোপুঁটি"

ধান্দাবাজির খেলায় সৈকতদার জুড়ি নেই মৃন্ময় জানে। অনেক ঘাটের জল খাওয়া সৈকত চাটুজ্জে সব ঘাটের কিনারা না জানলেও, কিছুটা তো জানে।

আসল কাহিনিটা কিন্তু মৃন্ময় জানে না, কিছুটা সৈকত।

কাহিনির গোড়াপত্তন বড়বাজার থেকে। ওর আস্তিনে বড় হওয়া সরকারবাবুর ব্লু আইড বয় বিমান চট্টোপাধ্যায়। চাপ দাড়ি। ভারী চেহারা। তুখোড় বুদ্ধি। খবর পরিবেশনে সিদ্ধহস্ত। যত রাতেই শুতে যাক না কেন, পাক্কা দশটায় অফিসের বোর্ডরুমে হাজির।

"আজকের অ্যাজেন্ডা..."

নাম করে করে প্রত্যেককে দিনের মাস্টার প্ল্যান আর কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছে। স্পেসিফিক দায়িত্ব। এবার সারাদিনের কাজে নেমে পড়। দুপুরে মোবাইলে কাজের অগ্রগতি নিয়ে খবরাখবর। সন্ধেতে সবাইকে একত্রিত করে ফাইন্যাল কভারেজের আগে চেক আপ। ডিসিপ্লিনড, ছকের অঙ্কে নিখুঁত কাজ।

সে সময় দিগ্বিজয় ভট্টাচার্য কোথায়? মামুলি স্পোর্টস রিপোর্টার। বিমানের ওপর সরকারবাবুরও কথা বলার অধিকার নেই। বড়বাজার বকলমে চালায় বিমান। মাইনে ভালই, তবে উপরি নেই। তখনই মাথায় কুবুদ্ধি চাপল। অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় যদি, তার ক্ষুদ্র জায়গা থেকে, টু-পাইস কামিয়ে নিতে পারে, সে নয় কেন?

“আজকে ফ্রি আছ? ডিনারে যাবে?” পেয়ারের হেলথ রিপোর্টার বিদীপ্তাকে ফোন।

“কী যে বলেন বিমানদা? আপনি ডাকলে না এসে পারি”

গ্র্যান্ড হোটেলের চৌরঙ্গী বারে গ্লেনলিভেট ১৫ তে চুমুক দিয়ে বিমান বলল “এক্সট্রা ইনকাম চাই”

দিনুভাইয়ের রক্ষিতা, মিরাকেল কিওর নার্সিং হোমের জেনারেল ম্যানেজার, বিদীপ্তা মুখোপাধ্যায়, টেকিলা সানরাইসে চুমুক দিয়ে বলল “কী ভাবে?”

“মুরগি জোগাড় কর। যারা খবর ছাপাবার জন্য উন্মুখ। যত বেশি প্রমিনেণ্ট কভারেজ, তত দাম। ডোন্ট ওয়ারি। তোমাকেও কমিশন দেব। ছেলে দুটোকে মানুষ করতে গেলে কী আর দিনুভাইয়ের টাকায় চলে?”

“চলছে না তো। একটা ফ্ল্যাট কিনব ভাবছি। নার্সিং হোমের টপ ফ্লোরে কি সারা জীবন কাটিয়ে দেব? একদিন দিনুভাইয়ের চাহিদাও ফুরবে। তখন আমি কোথায়? কিন্তু কী ভাবে?”

“আমি তো সব জায়গায় গিয়ে এসব ডিল করতে পারি না। তুমি করবে। পেমেন্ট হাতে নিয়ে, তবে লেখা দিয়ে যাবে। আমি খবর ছাপিয়ে দেব। যে যত বেশি দেবে, তত প্রমিনেন্ট কভারেজ। হিসাব সাফ। গ্যারান্টি দিচ্ছি, কাগজের হেলথ কভারেজ তুমি ছাড়া আর কেউ পাবে না”

একদিকে নাম, অন্যদিকে টাকা। দুটোর লোভ থেকে ক’জন বাঁচতে পারে? বিদীপ্তার ক্ষমতা নেই, না বলার। নেমে পড়ল বিমানের ইন্সট্রাকশনে কাজে। বিমানদার ব্যাকিং-এ রেগুলার লেখা বেরনোর জন্য নিজের নামডাকও বাড়ছে। বাড়ছে ডাক্তারদের কাছে কদর। নিজেকে লাইমলাইটে আনার লোকের তো অভাব নেই। টাকা আসছে। লেখা বেরচ্ছে। কাঁচা টাকার আমদানিতে ফুলে ফেঁপে উঠছে বিমান বিদিপ্তা দুজনেই।

ক্ষমতা হাতে থাকলে সদব্যবহার না করা মানে, দুনিয়াদারির ভাষায় বোকামি। তিন তারকা, একজন চিত্র জগতের, দু-জন মিডিয়ার। জলের দামে বিশাল জমি কাম বাংলো হাসিল করল শান্তিনিকেতনে। দিগ্বিজয়ের সঙ্গে পদ্মপর্ণার ওঠাবসা। তারকা জগতের বাইরেই তো পদ্মপর্ণার আসল রোজগার, কলকাতার উপর মহলের বাবুদের থেকে। মিডিয়েটর দিগ্বিজয় ভট্টাচার্য। সে কথা অন্দরমহলের অনেকেরই জানা। বিমানেরও অজানা নয়।

কী অঙ্কে ওরা দুজন বেরিয়ে গেল, আর ও ফেঁসে গেল, বুঝতে পারলেও, তখন আর কিছুই করার নেই। বুঝতে ভুল করেছিল রাজ নেওটিয়াকে। কোর্ট কেসে ফাঁসিয়ে দিল। ততক্ষণে সরকারবাবু সব জেনে গেছে। রাজের বন্ধু প্রদীপের সঙ্গে পদ্মপর্ণার সম্পর্কের কথা অজানা নয়। কাক কাকের মাংস খায় না। দুই ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট বাদ কেন? কোন অঙ্কে পদ্মপর্ণা বেরিয়ে গেল, আজও জানে না বিমান। আন্দাজ করা খুব কঠিন নয়। কিন্তু ধুরন্ধর দিগ্বিজয়ের এমন কী জাদু, যে পদ্মপর্ণাকে দিয়ে তুরুপের তাস খেলে, সরকারবাবুর প্রিয় হয়ে গেল?

সব খবর জানতে পেরে, মনে মনে ভীষণ ক্ষুণ্ণ হলেও, পেয়ারের পাত্র বিমানের চাকরি খায়নি সরকারবাবু। পূর্বপুরুষের রক্ত তো বইছে শরীরে। ওদের মতো না হলেও, ব্যবসার কিছু তো বোঝে। নয় ভুল করেইছে। অন্তত আরেকবার তো সুযোগ দিয়ে দেখা যেতে পারে। মনিকান্ত বসুকে সরিয়ে, নতুন স্টেলার বড়বাজার চ্যানেলের দায়িত্ব ওর হাতে তুলে, দ্বিতীয় সুযোগ দিল।

“খবরটা রেডি হলে আমাকে জানিও। যত তাড়াতাড়ি স্কুপটা বার করা যায়” সৈকতদা মৃন্ময়কে মনে করিয়ে দিল।

“পাক্কা” মৃন্ময় তৎপর। আগের বারের মতো এবার আর চাকরিটা খোয়াতে চায় না।

সে সময়টা অন্ধকার।

‘হেরিটেজ অফ ইন্ডিয়া’-তে স্বনামধন্য প্লাস্টিক সার্জেন অমিত গাঙ্গুলির অবিচুয়ারি ছাপাতে অনুরোধ করেছিল অরিজিৎ বসু।

“অরিজিৎদা অবিচুয়ারি খায় না। খাওয়াতে হলে মাল খসাতে হবে” মৃন্ময় তখন মোটা টাকা কামাচ্ছে খবর ছাপিয়ে।

“উনি তো আমাদের সকলের মাস্টার। আমি আমার জন্য বলছি না। উনি কলকাতার প্লাস্টিক সার্জারির জনক। ওনার একটা অবিচুয়ারি বার করা যাবে না?”

“অরিজিৎদা, ওসব প্লাস্টিক সার্জেনের অবিচুয়ারি খায় না। সেলিব্রিটি খায়। সত্যি কথা বলতে গেলে তো মাল খসাতে হবে...”

সত্য বলতে গেলে চাঁদি ছুড়তে হবে!

অরিজিৎ থমকে গেল। এর নাম বুঝি মিডিয়া। সত্য-মিথ্যা বোঝে না। মাল ফেল, সত্যকে মিথ্যা করে দিতে পারে, মিথ্যাকে সত্য। সত্য মিথ্যা চাঁদির নিলামে। খালি অরিজিৎই কিনতে চায়নি তাকে কোটি টাকার দামে। উড়ন্ত ফানুসের জীবন্ত স্বপ্নে।

মৃন্ময় অজ্ঞ। স্বপ্নে ভাসা টাকার নিলামে। সেটাই কাল হল।

অরিজিৎ বসুকে বুঝতে পারেনি। যে-সে লোক নয় সে। নয় কোনও সংকীর্ণ কালের ভেসে থাকা সংক্ষিপ্ত সময়। সে ঠেকাতে সক্ষম আজকের রবের শব, নতুন বর্ণচ্ছটায়। সে ভাঙতে পারে ইতিহাস, প্রত্যয়ে, নিজ দুর্জয়, নিঃশব্দ রূঢ়তায়। ‘হেরিটেজ অফ ইন্ডিয়া’-র কর্ণধার অমিত জৈনকে একটা প্রেমপত্র। নিজেও জানতে পারেনি, তাতে লেখা হয়ে গেল মৃন্ময়ের ছাড়পত্র। শেষ হয়ে গেল মৃন্ময়ের আলো-আঁধারির খেল। শেষ হয়ে গেল বিশ্বজিৎদার থেকে শেখা দুনম্বরি সুরের মেল।

সে অনেকদিন পরে। সৈকতদা সবে ধূর্জটি রায়ের হাত ধরে মৃতপ্রায় বাংলা টিভিকে পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছে। সৌগত দত্ত নিরুদ্দেশের পর, টিভি তখন ডুবন্ত অবস্থায়।

হঠাৎ মৃন্ময়ের ফোন “কী ব্যাপার?”

“চাকরি নেই। তুমি শুনলাম বাংলা টিভিতে সিইও হিসেবে জয়েন করেছ”

“হ্যাঁ। কিন্তু এখন তুই কোথায়?”

“ভারচুয়ালি রাস্তায়। সে এক লম্বা গপ্প। পরে বলব। এখন কোনও রোজগারপাতি নেই”

“আমার নতুন চ্যানেলে কাজ করতে চাস? এটা প্রিন্ট মিডিয়া নয় কিন্তু...”

“তাইতো ফোন করেছি। যা কিছু একটা দরকার। নইলে সংসার চলবে কী করে? বাড়িতে মায়ের জন্য চব্বিশ ঘণ্টার নার্স...”

“চলে আয়। ব্যবস্থা হয়ে যাবে”

কথায় আছে না, রতনে রতন চেনে। সৈকতেরও মৃন্ময়কে চিনে নিতে একটুও ভুল হয়নি। 'হেরিটেজ অফ ইন্ডিয়া' না হোক। বাংলা টিভি সৈকতের মজলিসের গুলবাহার। সেই গুলদিস্তায় আরেকটি ফুলের সংযোজন, মৃন্ময় ঘোষ।

চায়ে চুমুক দিয়ে সৈকত বলল "বেশ জমিয়ে স্টোরিটা বানাতে হবে। যাতে বিবিপি-কে টেক্কা মেরে দেওয়া যায়"

"কিন্তু ধীমান মুখোপাধ্যায় তো ওদের লোক"

"সেটাই তো আসল খেল। শুধু মৃত্তিকা নয়, ধীমানের ব্যাকগ্রাউন্ডও খুঁটিয়ে সাজাতে হবে। এ তো প্রথম নয়, পাবলিসিটির জন্য মৃত্তিকা এর আগেও এমন অনেক কিছু করেছে"

"নিজের কব্জি কেটে ফেলা?"

"কতটা কেটেছে, সেটা তো খুঁজে বার করতে হবে। হয়ত চামড়ায় দুটো আঁচড় মেরে ড্রাম পেটাচ্ছে। এদের পক্ষে সবই সম্ভব। অনেকটা পলিটিকাল নেতাদের মতো"

"এর নাম সেলিব্রিটি"

"সেলিব্রিটি-ফেলিব্রিটি এসব রাখ তো। আমাদের স্টোরি বানাতে হবে। বিবিপি চ্যানেলের সঙ্গে টেক্কা মারতে হবে। ধীমানের স্টোরি মৃত্তিকার থেকেও বেশি খাবে"

কে ঠিক, কে ভুল, কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ, এসব নিয়ে সময় নষ্ট করার অবসর নেই ধূর্জটি রায়ের। পাত্তি চাই। রুগ্ন চ্যানেলকে টিকিয়ে রাখতে গেলে বিবিপিকে ধরাশায়ী করতে হবে। কম্পিটিশনের খেলায় এটাই সত্যি।

"টেনশন করো না সৈকতদা। সব ম্যানেজ করে নেব"

সৈকত উঠে পড়ল। মৃন্ময়কে যা বোঝানোর হয়ে গেছে। ধূর্জটি রায়ের বাংলা টিভির পাঙ্গার খেলা শুরু। ঠিকমত খেলতে পারলে হাই টিআরপি। খুস ধূর্জটি। খুস পড়ে থাকা স্টাফেরা। টানাপোড়েনে কম ঝাড় তো খায়নি।

কোথায় ছিল সৈকত আর ধূর্জটি রায়, যখন বাংলা টিভির অঙ্ক কষেছিল বিমানদা, সৌগত দত্ত ও মনু ঘোষের সঙ্গে? প্রখ্যাত সেকালের চিত্রতারকা কাম ফিল্ম ডিরেক্টর সুপর্ণা সেনকেও ছাতার তলায় আনতে সক্ষম বিমানদা।

শ্যামবাজারের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেড মাস্টারের ছেলে ধূর্জটি রায় তো তখন স্কুটার নিয়ে ভাগ্য গড়ার জন্য লড়ে যাচ্ছে। পকেটে রেস্ত না থাকলেও বুদ্ধি তুখড়। ফিট মাস্টার জেনারেল। গ্যাঁটে মালকড়ি না থাকলে কী হবে, ইয়ারের বন্ধু তরুণ পাঁজার তো রেস্ত আছে।

মাল ওর, বুদ্ধি ধূর্জটির। খেলা শুরু। লোককে পটিয়ে কী করে ইনভেস্টমেন্ট জোগাড় করতে হয় ধীরে ধীরে সেই খেলাই রপ্ত করছে। ভেনচার ক্যাপিটালিস্ট জোগাড় করে কম্প্যানি বানাও। তাদের কিছু মুনাফা ধরিয়ে আরেকটা কম্প্যানিতে ইনভেস্ট করাও। সোজা কথা, মাছের তেলে মাছ ভাজ। মাছ কী করে ভাজতে হয়, ধূর্জটি ভালই জানে। নইলে কী শ্যামবাজার থেকে এই লেভেলে উঠে আসতে পারে? হতে পারে জালি। জালি হয়ে এন্টারপ্রেনিওর হতে গেলে তো জালি বুদ্ধিরও দরকার। সেখানে ধূর্জটি সিদ্ধহস্ত।

সৈকতকে এখন ঘরে বসে কয়েকটা ইম্পরট্যান্ট ফোন সেরে ফেলতে হবে। শুনেছে ধীমানের শ্বশুরের সঙ্গে রাজ নেওটিয়ার বন্ধুত্ব। রাজ যে সে লোক নয়। কলকাতার শিল্পপতিদের মধ্যে অন্যতম একজন। শেষে না বিমানদার মতো ফাঁসে। স্টোরি বানাতে গিয়ে ধূর্জটিকে না আবার অসুবিধায় ফেলে। ধূর্জটির অনেক কারবারই তো সোজা নয়। অনেকে না জানলেও, সৈকত তো কিছুটা জানে। ছিপ ফেলে, টোপ বিছিয়ে, ধূর্জটির অন্ধকার দুনিয়াকে হাতিয়ার করে ওর কাছ থেকে বাংলা টিভির সিইওর চাকরিটা হাতিয়েছে।

রাজ জানবে না, এ হতে পারে!

এতদিনে মিডিয়ার খেলাটা কিছু তো রপ্ত করেছে। পাবলিককে স্টোরি গিলিয়ে মুনাফা লুটে বেরিয়ে যাও। বাইরে যাই দেখাও না কেন, ওপর মহলে সংযোগ অটুট। সেই অঙ্কে যাতে গড়বড় না হয়। শেষে স্টোরি করতে গিয়ে বোলতার চাকে না ঢিল ছুড়ে ফেলে। বে-জায়গায় ঢিল পড়লে, ধূর্জটির বাংলা টিভি ডুবতে বেশিক্ষণ লাগবে না।

সোজা রাজকে ফোন "সৈকত চ্যাটার্জি ফ্রম বাংলা টিভি"

"কেমন আছ সৈকত? সব ভালো তো?"

কলকাতায় বড় হওয়া আর পাঁচজন অবাঙালির মতো রাজও বাংলায় সড়গড়। যদিও লা মারটিনেয়ার স্কুল ও সেন্ট জেভিয়ারস কলেজের প্রাক্তনি, হারভারড বিজনেস স্কুল থেকেও ম্যানেজমেন্টে একটা ডিগ্রি আছে। অবাঙালি হলেও বাংলায় স্বচ্ছন্দ।

"আপনাদের আশীর্বাদে চলে যাচ্ছে। একটু দরকারে ফোন করেছিলাম"

"কী?"

"ধীমান-মৃত্তিকার খবরটা নিশ্চয়ই শুনেছেন। এটাই লেটেস্ট হট স্কুপ। স্টোরি করছি। আপনার আপত্তি নেই তো?"

"আমার আপত্তি থাকবে কেন? তোমরা মিডিয়ার লোক। স্কুপ বেচেই তো তোমাদের টিকতে হবে" রাজ নির্লিপ্ত "তবে এমন কিছু প্রোজেক্ট কর না... বেশি নয়..."

"বিবিপি টিভি তো জমিয়ে খবরটা বাজারে ছাড়বে। এমন কিছু দিতে হবে, যা ওরা পারবে না"

"দেখ, ধীমানের শ্বশুর আমার অনেক দিনের বন্ধু। আমায় ফোন করেছিল। একটু চেপেই খবরটা... তুমি বুঝবে..."

"আপনি যা বলবেন..." রাজ বাড়াবাড়ি চাইছে না।

মনগড়া সাজানো গল্প বানাতে হবে। মিডিয়ায় এত বছর, ভালোই জানে মসলা দিয়ে কী ভাবে পরিবেশন করতে হয়। ফোনটা রেখে ভাবল, মৃন্ময় যা করছে করুক। তাকে অফিসে বসেই গল্প ফাঁদতে হবে। পরে টিম ফেরত এলে, ফিল্টার করে ঢুকিয়ে দিলেই হবে।

ধীমানকে প্রায়রিটি না দিয়ে মৃত্তিকাকেই বেশি করে তুলে ধরতে হবে। মৃত্তিকাও তো তাই চায়, পাবলিসিটি। এই মাগিগুলো রাতবেরাতে ফুর্তি করবে। নতুন নতুন অঘটন ঘটাবে। শুধু একটু কভারেজের আশায়... এদের লাইমলাইটে থাকার একটাই পথ।

সাত

“কাল সকাল আটটায় একটা গাড়ি পাঠিয়ে দিও তো” মায়া ভট্টাচার্য একটু থেমে বলল “টয়োটা গাড়িটা”

“ঠিক আছে” মিনমিন করে শোভন উত্তর দিল।

কথা না বাড়িয়ে মায়া মোবাইলটা কেটে দিল। শোভন মুখটা বেজার করে ড্রাইভারকে ফোন করল। কিছুই করার নেই। দিতেই হবে। মায়ার স্বামী দিগ্বিজয় হিরোইন সাপ্লাই করছে ফুর্তি করার জন্য, এটুকু তো করতেই হবে। মালকড়ি না ছাড়লে, এরাই বা পাত্তা দেবে কেন? দিগ্বিজয় ক্যাশে। ওর বউ কাইন্ডে। দিগ্বিজয় ছাড়া কী দেওয়ালি, পদ্মপর্ণা, এদের ভোগ করতে পারত?

সুবিমল সকালের ফ্লাইটে চেন্নাই থেকে আসছে। ওকে এয়ারপোর্ট থেকে পিকআপ করে সারাদিন ওর সঙ্গে টোটো। বিকেলের ফ্লাইটেই চলে যাবে। শোভন থাকতে নিজের পেট্রল পোড়াতে যাবে কেন?

“এবার অনেকদিন পর এলে”

“হ্যাঁ দিদি। কলকাতায় আর আসাই হয় না”

“খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই। যাওয়ার পথে নভটেলে ব্রেকফাস্টটা সেরে নেব” উত্তরের অপেক্ষা না করেই বলল।

ছেলেটা ওদের জন্য কত করে। একদিন নয় ভালোমন্দ খাওয়াল। সুবিমলদের মতো ভারতের সব বড় শহরে কিছু ছেলে আছে বলেই তো আজ দিগ্বিজয়ের এত রমরমা।

ব্রেকফাস্ট টেবলে জিজ্ঞেস করল “নতুন মুর্গি উঠল?”

“উঠবে না? ছিপ তো সবসময়ই ফেলে বসে আছি। চাড় ছড়িয়েও যাচ্ছি। এই শালা থাকতে চাড় গিলবে না, এ কখনো হয়? এবার কমিশানটা বাড়াও দিদি। দিনকাল যা পড়েছে। জিনিসের দাম হু হু করে বাড়ছে। পুরনো রেটে আর চলছে না”

“সে নয় হবে। দাদার সঙ্গে কথা বলে নিই”

“নয় ওদের রেট বাড়িয়ে দিচ্ছি। তোমরা তো সব মালদার লোক নিয়ে ডিল করো। আরেকটু বেশি দিতে ওদের আপত্তি হওয়ার কথা নয়”

দক্ষিণের হিরোইনরা অনেক হট। কলকাতারগুলোর থেকে ওদের ডিমান্ড অনেক বেশি। কলকাতার মালদার এলিটরা ওদেরই বেশি পছন্দ করে। নো হ্যাসেলস। স্ক্যামের কোনও ব্যাপার নেই। উইকেন্ডে ফ্লাই করে আসবে। দু-রাত্রি আনন্দ-ফুর্তি করে মাল কামিয়ে শুটিং-এ ফিরে যাবে। দে আর মোর ইরটিক দ্যন ইভেন দ্য বেস্ট হিরোইনস ইন টাউন। অ্যাবসলিউটলি গরজিয়াস ইন বেড। দে নো হাউ টু স্যাটিসফাই মেন।

বাইরে মায়ার পরিচয় ভাষ্যকার, আবৃত্তিকার হলেও এর থেকেই আসল ইনকাম। টাকা না ফেললে কী প্রদীপ প্রকাশনীর প্রদীপ মণ্ডল দিগ্বিজয়ের বই ছাপাবে? সে দিগ্বিজয়ের যত কন্ট্যাক্ট থাকুক না কেন। ঘুঘু লোক প্রদীপ মণ্ডল। বই আর পাবলিসিটির খরচ ঠিক তুলে নিতে জানে। কখনো কী ভেবেছিল, মডার্ন হাই স্কুলের মেয়ে এভাবে কামাবে?

দিগ্বিজয় যখন বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুল থেকে পাস করে সেন্ট জেভিয়ারসে পড়ে, তখনও মায়ার সঙ্গে আলাপ হয়নি। চব্বিশ বছর বয়সে চাকরি সূত্রেই আলাপ। দূরদর্শনে আর্কাইভ ঘাঁটতে এসে মায়ার মুখোমুখি।

"আর্কাইভ সেকশনটা কোনদিকে বলতে পারেন?"

মায়া সবে সকাল নটার নিউজ পড়া শেষ করে ক্যন্টিনের দিকে যাচ্ছে। আঙুল নেড়ে বলল "ওই দিকে"

স্বল্প পরিচয়। তারপর বেশ কয়েকবার এসেছে। তখন ছন্দাদি বাংলা নিউজ পড়ে। হুকুম ছিল, বিল্ডিং ছেড়ে না যাওয়ার। ভাস্বতীদি আর বৈশালীদি কামাই করলে বা দেরি করলে, মায়ার ডাক পড়ত। হাতে অফুরন্ত সময়। উঠতি বয়স। বিল্ডিং-এ বয়স্কদের মাঝে হাঁপিয়ে উঠত।

নিজে থেকেই দিগ্বিজয়ের সঙ্গে আলাপ জমাল। হ্যান্ডসাম ছেলে। টাইম পাস করলে মন্দ কী! প্রেসিডেন্সিতে পড়াকালীন কোনও ছেলের সঙ্গে তেমন ইয়ে হয়নি। দিগ্বিজয়ের স্পর্শে ভাবটা আরও গাঢ়। পরে প্রেম থেকে বিয়ে। মাইনে তেমন নয়। যেনতেন প্রকারে টাকা করার নেশা চেপে বসল।

কলকাতার আকাশে টাকা উড়ছে। খালি ধরতে জানা চাই।

"দিদি তুমি তো কিছুই খাচ্ছ না"

"এমনিতেই যা মুটিয়েছি এবার খাওয়া কন্ট্রোল না করলে নড়তে-চড়তে পারব না" মায়া চায়ে চুমুক দিল।

"আজকের প্রোগ্রামটা কী?"

"আমার একটা নতুন আবৃত্তির সিডি বার করার কথা হচ্ছে। ভাসান অডিও থেকে। ওখানে যাব। মালকিনকে কনভিন্স করতে হবে সাউথ ইন্ডিয়ার বাঙালিদের মধ্যে তুমি একটা অ্যাসিওরড সেল দিতে পারবে। কী ভাবে কনভিন্স করবে, সেটা তোমার ব্যাপার"

"এনিথিং ফর ইউ, মাই সুইট দিদি। রিল্যাক্স। আমার ওপর ছেড়ে দাও"

ভাসান অডিওর অফিসে ঢুকতে গিয়েই ঋষিকা ও দুর্জয় প্রসাদের সঙ্গে দেখা। মায়া একগাল হেসে জিজ্ঞেস করল "নতুন সিডি বেরচ্ছে নাকি?"

"হ্যাঁ ওই একটা বেরচ্ছে" ঋষিকা হেসে জবাব দিল।

"কীসের?"

"আমার পঞ্চকবির গান। সঙ্গে দুর্জয়ের ভাষ্যপাঠ। তোমার?"

"একটা আবৃত্তির সিডি বার করার কথা চলছে। এখনও ফাইন্যালাইজড হয়নি"

মায়া বেশি কিছু বলল না। সেই দুর্জয় ছেলেটা আসার পর থেকে তার কম্পেয়ারিং-এর কাজে ভাগ বসিয়েছে। লেডিস মার্কা ছেলেটাকে সহ্য করতে পারে না। মুখে মধু ঝরছে। তলে তলে নিঃশব্দে গুছিয়ে নিতে ওস্তাদ। সবার সঙ্গে লাইন ফিট করে রেগুলার প্রোগ্রাম করে যাচ্ছে। অবশ্য এখন আগের মতো বাজার নেই। চিট ফান্ডের স্ক্যামের পর স্পন্সর অনেক কমে গেছে। এমনিতেই বাজার মন্দা। সেখানেও যদি ভাগাভাগি করে নিতে হয়, মায়া যাবে কোথায়?

কথা না বাড়িয়ে সুবিমলকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল।

বিয়েটা যখন ভেঙে গেল তখন গানের দিকেই মনোনিবেশ করেছিল। বুড়োটার কাছেই দিনরাত পড়ে থাকত। অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন অবশ্য বুড়ো ছিল না। রীতিমত হ্যান্ডসাম সুপুরুষ। দ্বিতীয় বিয়ের বন্ধন কাটিয়ে মুক্ত। অ্যাকাউন্টেসি নিয়ে প্রাথমিক জীবন শুরু করলেও, হিসেবের খাতা নিয়ে পড়ে থাকতে মন চায়নি। না পড়াশোনায়, না সংসারে। মুক্তিই বেঁচে থাকার মূলমন্ত্র। নাটকের গান প্রাণ যন্ত্র। ডাঃ অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় নাটকের গানের দিকপাল।

সে কবেকার কথা। মাঝে কতগুলো বছর পার হয়ে গেল। কত স্রোত অজানা বাঁক নিল। তবুও এখনও ওরা স্বামী-স্ত্রী।

বেরতে গিয়ে মোবাইলটা বেজে উঠল। সিএলআই-তে নামটা দেখে ঋষিকা দুর্জয়ের থেকে সরে গেল।

"আসছ তো?"

"হ্যাঁ, কাজ হয়ে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে যাব"

"ফেরার সময়, লাঞ্চের জন্য চাইনিজ কিনে এনেছি"

"গিয়ে কথা হবে"

দুর্জয়কে রূপজিৎ সম্বন্ধে জানাতে দিতে চায় না। গসিপে ওর জুরি নেই। ঋষিকার প্রাইভেট লাইফ যদি বাজারে গিয়ে পড়ে টক অফ দ্য টাউন হতে কতক্ষণ! সেলিব্রিটি হওয়ার বিড়ম্বনা কী কম। সব সময় গা বাঁচিয়ে একটা ইমেজ প্রোজেক্ট করে যাও। দৈনন্দিন পেজ থ্রির হেডলাইন্স হলেও, স্ক্যাম ফাঁস হয়ে গেলেই লিড নিউজ। মিডিয়ার সঙ্গে যতই দহরম-মহরম থাক না কেন, স্কুপ পেলে সব ভুলে ওটার পেছনেই ছুটবে। এর নাম মিডিয়া! বন্ধু বা শত্রু কিছুই বোঝে না। গপ্পো বিক্রি করলেই কাটতি। পাবলিক খায়।

"শেষ পর্যন্ত পুরো টাকা দেবে তো?" ঋষিকা তখনও সন্দিহান।

"ঋষিদি তোমায় তো আগেই বলেছি, ওরা দেবে। না হলে, ওদের পাবলিসিটির দৌড়ে জল ঢালতে খুব একটা অসুবিধা হবে না। ভুলে যেও না আমরা এখন সেলিব্রিটি। আমাদের বিক্রি করেই ওদের মুনাফা" ধূর্ত দুর্জয় খেলাটাকে রপ্ত করেছে।

"কিছু অ্যাডভানস দিয়েছে, তোর পেড়াপেড়িতে। তবে পুরোটা না দিলে তো প্রোডাকশন আটকে যাবে। মার্কেটে সিডির যা বাজার, টাকা না পেলে ভাসান কিছুই করবে না। দেখলে তো, কী ভাবে রাইম মিউজিক ডুবল"

"রাইমের ব্যাপারটা আলাদা। পড়ন্ত ইন্ডাস্ট্রিতে সুনীলদা এত স্পন্সরশিপ দিয়ে ফেলেছিল, আজ না হলে কাল ডুবতই। এখানে তো লাইফ বোট সব সময়ই আছে"

"সে আবার কে?" ঋষিকা দুর্জয়ের দিকে তাকাল।

"কেন তোমার শোভন রায়চৌধুরি। একটু পাবলিসিটির জন্য টাকা লোটাতে সব সময়ই প্রস্তুত। তুমি একটু ইনিয়ে-বিনিয়ে বললেই দিয়ে দেবে"

"শোভনদা দিলদরিয়া লোক। সব সময় কী চাওয়া যায়? না... না... না... আমি শোভনদার কাছে চাইতে পারব না। তুমি বরং তোমার স্পন্সরের কাছ থেকে ম্যানেজ কর" গাড়িতে উঠে বলল "তুমি কোথায় যাবে?"

"গলফ গ্রিনে, রূপঙ্করদার বাড়িতে। আইসিসিআর-এর প্রোগ্রামটার স্ক্রিপ্ট ফাইনালাইজ করে নিতে। তুমি?"

“আমার একটু কাজ আছে। তোমায় গলফ গ্রিনে নামিয়ে...”

“লর্ডস বেকারির সামনে নামালেই হবে। ওখান থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে নেব”

সাউথ সিটির দু-কামরার ফ্ল্যাটে ঢুকে রূপজিতের কথার জবাব না দিয়ে, শাড়ি আর হ্যান্ড ব্যাগটা সোফার ওপর ছুঁড়ে দিল। বাথরুমে ঢুকতে গিয়ে ঋষিকা বলল “উফঃ যা গরম না। একবার স্নান করে নিই। বাথরুমে তোয়ালে আছে তো?”

“হ্যাঁ, আজই ফ্রেস তোয়ালে রেখেছি”

রূপজিৎ ঋষিকার ব্রায়ের ফাঁক দিয়ে উপচে পড়া স্তনের দিকে তাকিয়ে... যতক্ষণ না বাথরুমের দরজার ওপারে হারিয়ে গেল... এই স্তন কতবার দেখেছে, হাতে নিয়ে খেলেছে। তবু যেন আশ মেটে না। বারবার চোখটা ওখানেই ঘোরাফেরা করে। ঋষিদি বয়স বারার সঙ্গে একটু মুটিয়েছে। থুড়ি... মুটিয়েছে কথাটা ভালো লাগে না। বরং ভরাট হয়েছে, কামনা জাগায়। এটাই তো যোগসূত্র।

“ওয়ারড্রব থেকে নাইটিটা দাও না রূপ” বাথরুমের দরজা ফাঁক, আবদার ঝরে পড়ল।

তোয়ালে মোড়া দেহটার দিকে এক পলক তাকিয়ে ওয়ারড্রবের দিকে। শ্যামলা শরীরটা বাথরুমের জানলার ফাঁক দিয়ে দুপুরের প্রখর আলোয় ঝলমল করছে। ওটাই রূপকে চুম্বকের মতো টানে।

যেমন টেনেছিল প্রথম আলাপে। কলামন্দিরে ঋষিদির একক আসরে মিডিয়া কভারেজ করতে গিয়ে। গ্রিনরুমে প্রথম দেখাতেই আকৃষ্ট হয়েছিল রূপজিৎ।

ঋষিকা রূপজিতের দিকে ঢলতে আঁচলটা অভ্যাসবশত সরে গেল। কিছুটা সময় দিয়ে ঠিক করে বলল “একটু ভালো করে লিখ। বেশ বড় করে, ছবি দিয়ে...”

“চেষ্টা করব। তবে জানেন তো সব কিছুই এডিটরের ওপর”

“একটু বলে দিও না। তুমি বললে, না করতে পারবে না”

ঢেকে যাওয়া ক্লিভেজে চোরাচোখে তাকিয়ে রূপজিৎ বলল “পরে তোমাকে নিয়ে একটা ফুল পেজ কভার স্টোরি করব”

দৃষ্টিটা এনজয় করল ঋষিকা। অভিজিৎ ঋষিকার কোনও একক প্রোগ্রামে আসে না। হয়ত কমপ্লেক্স।

“কবে তোমার সময় হবে ঋষিকাদি? একটু সময় নিয়ে ভালো করে স্টোরিটা করতে হবে...”

“যবে তুমি বলবে” ঋষিকার তখন অত কাজ নেই।

“তাহলে তোমার বাড়িতে একদিন চলে যাব”

“না... না... আমার বাড়িতে নয়। অভিজিৎ পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। ওর ডিস্টার্ব হবে”

“তোমার অসুবিধা না থাকলে, আমার বাড়িতে চলে আসতে পার। আমি একাই থাকি। ওখানে ডিস্টার্ব করার কেউ নেই”

“কোথায়?”

“সাউথ সিটি”

সেই প্রথম সাউথ সিটির ফ্ল্যাটে পদার্পণ। তারপর কত দুপুর যে অপরাহ্নে গড়িয়েছে। কিন্তু সেই দুপুরের সুখস্মৃতি অন্তরালে থেকে গেছে। যে কাহিনি সকালের ট্যাবলয়েড বা খবরের কেন্দ্রবিন্দু। তার নেপথ্যে

আরেক হিসেবের দুনিয়া।

অবশ্য রূপজিতের সঙ্গে সম্পর্কটা শুধু হিসেবের নয়। কিছুটা চাহিদাও বটে। অভিজিৎ বুড়ো হলে কী হবে, ঋষি তো এখনও সতেজ। তার তো সাধ-আহ্লাদ আছে।

হাউসকোটটা পেঁচিয়ে ভেজা চুল মেলে ডাইনিং টেবলে বসে বলল "এসিটা আরও বাড়িয়ে দাও। প্রচণ্ড গরম"

চাইনিজ লাঞ্চ টেবলে বিছিয়ে রূপজিৎ বলল "তোমার গরম একটু বেশি। খেয়ে নাও। সব গরমের সমাধান হয়ে যাবে"

কী আদরই না করতে পারে রূপজিৎ। আহাঃ, এমন আদর যদি অভিজিৎ করত! ঠোঁটে বুকে চুমু খেয়ে নাভির কাছে নামতেই ঋষিকার সুড়সুড়ি লাগতে শুরু করল "আহঃ... আস্তে... আস্তে..."

আস্তে আস্তে বুক থেকে মুখটা ভগাঙ্কুর স্পর্শ করতেই আনন্দে আবেগে শিউরে উঠল। ফুল এসির মধ্যেও উত্তেজনার পারদ ক্রমশ চড়ছে। খেলুক। আর একটু... তারপর...

রূপজিতের রোমশ বুকে মুখ ডুবিয়ে, শিথিল চুম্বনে জাগিয়ে তুলছে ওর হাফ ব্যানার স্ফুলিঙ্গকে। যার নিষ্ক্রমণ ভিন্ন নিস্তার নেই ওর। নিজেরও... শখ। আনন্দ। তৃপ্তি। রিচুয়াল।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল জানে না। ঘুম ভাঙল মোবাইলের আওয়াজে... "ঋষিকা বন্দ্যোপাধ্যায়?"

"হ্যাঁ"

"বেলভিউ থেকে বলছি। আপনার স্বামী অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় আইসিইউ-তে ভর্তি"

"কেন? কী হয়েছে?" উঠে বসল।

"চিন্তার কারণ নেই। মাইল্ড অ্যাটাক। হি ইজ ফাইন নাউ"

"এখনই আসছি"

শাড়িটা পেঁচিয়ে বেরতে গিয়ে খেয়াল হল, লিপস্টিক লাগায়নি। ওটা না লাগালে যে...

রূপজিতের সঙ্গে কিংবা অন্য কারও সঙ্গে যতই খেলুক না কেন, সে অভিজিতের স্ত্রী। অগ্নিদেবের মা। তার সামাজিক পরিচয় সেটাই। আর পাঁচটা সেলিব্রিটির মতো সেটুকু ভাঙতে চায় না। যতই বুড়ো হোক না কেন, অজান্তে মুক্ত অভিজিৎ আজও কোথায় হালটা ধরে রেখেছে। তার পাশে দাঁড়ানোটাই এখন দরকার।

আট

"সো বোল্ড?" দেওয়ালি পরিচালক বসুন্ধরার দিকে তাকাল।

"আই অলরেডি টোল্ড ইউ দিস মুভি ইনভলভস হট সিকোয়েন্সেস"

"অফ কোর্স ইউ মেনশন্ড। ওয়াজন্ট আওয়ার, ইট উড বি সো এক্সপ্লিসিট। বেঙ্গলি মুভিস আর নট দ্যাট বোল্ড"

"ডোন্ট ফরগেট আই অ্যাম ফ্রম শ্রীলঙ্কা। তামিল মুভিজ আর মোর ইরটিক দ্যান ইওর বেঙ্গলি ফ্লিক্স"

বলেছিল বটে। কনট্র্যাক্টেও লেখা আছে। দেওয়ালি ঠিক মাত্রাটা আঁচ করতে পারেনি। স্ক্রিপ্টের চার্ম আর অভিনয় প্রতিভার সুযোগ আছে বলেই, দেওয়ালি অফারটা নিয়েছিল। স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী কিছু সেন্সুয়াল সিন করার কথাও বসুন্ধরা আগেভাগেই বলেছে। টিকে থাকতে গেলে প্রিহিস্টরিক বাঙালিয়ানার মিডিওক্র্যাটিক ট্যাবুগুলো ঝেড়ে ফেলতে হবেই। সাধের সাইন্স ছেড়ে যখন সিলভার স্ক্রিনে নেমেছে, পড়াশোনার মতোই এখানেও তাকে সেরা হতে হবে। সে পথে যদি নিজের ইনহিবিশনস ছাড়তে হয়, আপত্তি কী! শোনা যেত, হোয়াট বেঙ্গল থিঙ্কস টুডে, ইন্ডিয়া থিঙ্কস টুমরো। আজ বাঙালি প্রগতির চিন্তাকে বাদ দিয়েছে। শুধু ভাবছে। তাই লোকে বলে হোয়াট বেঙ্গল থিঙ্কস টুডে, ইন্ডিয়া ফরগট ইয়েস্টারডে।

"বাট ইজন্ট দ্যাট এ বিট টু বোল্ড?" দেওয়ালির দ্বিধা।

"নট ইফ ইউ লুক অ্যাট ইট ফরম স্টোরি লাইন। আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু মেক এ মুভি অফ টুয়েন্টি-ফার্স্ট সেঞ্চুরি উইথ মাইন্ডসেট অফ ফরটিস। অল আর ম্যচিওর অ্যাডাল্টস। ইফ দে হ্যাভ নট গ্রোন আপ, ইটস টাইম টু ডু সো"

চিন্তাধারার পরিবর্তন জরুরি, সেটা অনেকের মতো দেওয়ালিও মানে। যেখানে সারা পৃথিবী এগিয়ে চলেছে, সেখানে দেওয়ালিই বা পিছিয়ে পড়ে থাকবে কেন? আগামী দিনের বুনিয়াদ না হয় দেওয়ালি আর বসুন্ধরার হাত ধরেই শুরু হোক। পর্দাটা এবার উঠে যাক। আড়ালে নয়, খেলা বাইরেই।

"ইভেন ইফ আই এগ্রি, হু উইল বি দেয়ার ডিওরিং দ্য শট?"

"ঋতব্রত, ইউ, মি অ্যান্ড হ্যান্ডফুল অফ ক্রু"

টেকনিশিয়ান স্টুডিওর মেক আপ রুমে দেওয়ালি ভাবার চেষ্টা করল। পার্ট অফ দ্য ব্রেস্ট আগেও, সময় বিশেষে দেখিয়েছে। কিছু বিকিনি শটস যে দেয়নি, এমনও নয়। তবে আড়াল রেখে।

কমপ্লিট ন্যুডিটি। সঙ্গে কানিলিঙ্গাস!

ভাবতেই প্রথমে গা-টা কেমন রি রি করে উঠল। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব স্বাভাবিক। দেওয়ালিও ব্যতিক্রম নয়। খাওয়ার পরে টেনশনে বেশ কয়েকটা সিগারেট খেয়ে ফেলল। ভেতরে চাপা উত্তেজনা। একদিকে এতদিনের সাবেক মূল্যবোধ। অন্যদিকে তাকেই ভেঙে চুরমার করে বেরিয়ে যাওয়ার অদম্য স্পৃহা। দুয়ের টানাপড়েনে দেওয়ালি বিধ্বস্ত। এক তৃতীয় অনুষঙ্গ হাজির।

চিন্তার ঘূর্ণিপাকেই দরজায় টোকা "মে আই?"

দরজা খুলতেই বসুন্ধরা ঘরে ঢুকল।

“ওয়াস গিভিং ইউ টাইম টু রিল্যাক্স। উই উইল শুট লেট ইভিনিং। আই নো ইট মাস্ট বি এ বিট অফ মেন্টাল এক্সারসাইজ ফর ইউ টু প্রিপেয়ার ইওরসেলফ। নো মোর শটস টুডে একসেপ্ট দ্য ক্রুসিয়াল ওয়ান লেইট ইভিনিং। প্রিপেয়ার ইওরসেলফ”

বসুন্ধরা বেরিয়ে যাচ্ছিল। দেওয়ালি বলল “হাউ মাচ আর ইউ গোয়িং টু শো?”

“অ্যাস মাচ অ্যাজ ইট ইজ প্লিজিং। লিভ ইট টু মি। আই নো হোয়াট ইজ বেস্ট”

ধোঁয়াশায় রেখে গেল। বুঝতেই পারেনি, কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। যখন ঘুম ভাঙল ঘর অন্ধকার। চায়ে চুমুক দিতেই অন্ধকারের বুক চিরে সব কিছুই স্বচ্ছ, পরিষ্কার।

অতীত পেছনে।

কার্নিশ পেরিয়ে মেঘের ফাঁক থেকে চাঁদ ক্রমশ স্পষ্ট। আবরণটা যেন হঠাৎ খসে গেছে। এখন সে মোহময়ী। নগ্ন, অপরূপা ক্যামেরায়। অলঙ্কারে, ভূষণে, নিজস্বতায়। অন্ধকারের আস্তিন সরিয়ে নগ্ন অবয়বটা ধ্রুবতারার মতো জ্বলজ্বল করছে। চাঁদের একফালি রশ্মি সাজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে তাকে। সহজ অপরূপ আভরণে। সি উইল গিভ হার বেস্ট শট টুডে।

স্টার থেকে চরিত্রাভিনেতায় রূপান্তর ঘটছে। মনকে কামাতুর নারীর বেশে সাজাচ্ছে। প্যানটির মধ্যে হাত। নিজেকে নিয়ে খেলা শুরু করল। ক্লাইম্যাক্সের আগের মুহূর্তে সামলে নিল। তোলা থাক শটের জন্য। ফাইন্যাল অরগ্যজমটা ন্যাচারাল হবে। তাই হল।

ঋতব্রতর জড়তা ছিল। কিন্তু তার মধ্যে কামতুর নারীর পূর্ণ দৈহিক চাওয়া ছাড়া আর কিছুই ছিল না। সেখানে ঋতব্রত গৌণ। জাস্ট ইন ফ্রেম। ফার্স্ট টেকেই ওকে।

“ব্রিলিয়েন্ট! ইউ ওয়ার জাস্ট ফ্যবুলাস” বসুন্ধরার প্রশংসা। ভাবেনি প্রথম টেকে দেওয়ালি এত ভালো শট দেবে।

‘কোঁড়ক’ নামে বাংলায় ছবিটা মুক্তি পেলেও, ‘বারজিওন’ নামে ইংরেজি ভার্সনটা ইন্টারন্যশনল লেভেলে সাড়া ফেলে। কান, টোরন্ট থেকে প্যাসিফিক মেরিডিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে হইচই। ভারতেও কানিলিঙ্গাস দৃশ্য নিয়ে শোরগোল।

দেওয়ালি রাতারাতি ন্যাশনাল থেকে ইন্টারন্যাশনাল। কন্ট্রভারসি থাকলেই বা কী! কার জীবনে নেই? কান-এ রেড কারপেটের ওপর হাঁটর সময় মনে হচ্ছিল, ডিসিশনটা ঠিক।

দেওয়ালি সবসময়ই ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়েছে। পড়া ছেড়ে অভিনয়ের জগতে আসা। বোল্ড সিন। সে স্বতন্ত্র। বুঝতে পারছে, এটাই তাকে ক্রমশ খ্যাতির শিখরে তুলছে।

এই ইন্ডাস্ট্রিতে দেওয়ালি এক স্ট্রেঞ্জ কম্বিনেশন... ব্রেন, বিউটি, সেন্সুয়ালিটি, কোয়ালিটি। স্বপ্নটা আকাশচুম্বী। বিজ্ঞান পড়া মন শিখিয়েছে কতখানি ছুঁতে পারবে। শুধু চেষ্টা করতে হবে।

সবে দেশে ফিরেছে। ফুরসত পাওয়ার আগেই মুম্বাই থেকে ফোন “ম্যায় সত্যম ভাট বোল রহা হু। প্রডিউসার সত্যম ভাট। মেরা ফিল্ম মে কাম করোগি?”

অবকাশ নেই সাফল্য নিয়ে মৌজ করার। সে কথা পরে ভাবা যাবে, এখন বৃহত্তর পৃথিবীর ডাক। সেই ডাকে সারা দেওয়া অনেক বেশি জরুরি।

“জরুর। লেকিন স্টোরি লাইন কেয়া? ম্যায় নিভা পাউঙ্গি কেয়া, ইয়ে ভি তো জাননা জরুরি”

"কব আ সকোগে মুম্বাই?"

"যব আপ চাহে"

"দিস উইক..."

"আজহি তো কান সে লটা। উইকেন্ড..."

"চলে আও মেরা অন্ধেরি অফিস পর। উধারই বাতচিত কর লেঙ্গে। স্টোরি ভি শুন লেনা। ইস ফিল্ম মে তুমহি হিরোইন, আগর ঠিক লগে তো..."

"কিউ নেহি। ম্যায় নিভাউ পাউঙ্গি কেয়া ইয়ে ভি জাননা হ্যায়। পহচ জাউঙ্গা মর্নিং ফ্লাইট মে..."

"অপনে পতা এস এম এস কর দেতি হু। মুম্বাই মে ঠহরনে কা ভি বন্দবস্ত হো জায়েগা"

প্রথা ভাঙার যেমন রিস্ক আছে, লেগে গেলে মার্কেট অনিবার্য। 'কোঁড়ক'-এর সাফল্য টলিউডের জরাজীর্ণ স্টুডিও থেকে বলিউডের দোরগোড়ায় এনেছে।

সেটা কি প্রথা ভাঙার ঔদ্ধত্য? নাকি নিজস্বতা?

বোধহয় ভবিতব্য। দেওয়ালি অত জানে না।

শুধু যে পথ আহ্বান করছে, তাকে বরণ করে নিতে জানে। ভালোমন্দয় মিশিয়ে ভবিতব্যকে মেনে নেওয়াই কর্তব্য। সাফল্যের চাবিকাঠি। রূঢ় দিশাহীন বাস্তবের ঠিকানা।

অন্ধেরি ওয়েস্ট। ভি আই পি প্লাজা। সত্যম স্ক্রিপ্ট শোনাল।

"লেট মি বি হনেস্ট। দিস ইজ এ ইরটিক থ্রিলার। দ্য সেন্ট্রাল ক্যারেক্টর মালভিয়া ইন অ্যান অপারেশন উইথ হার ফ্রেন্ড রিকি এগেনস্ট অ্যান অফ বিজনেস টাইকুন্স, ফলস ইন্টু এ লাভ-হেট রিলেশনশিপ উইথ উইথ ধ্যানরাজ, ফলস ইন লাভ উইথ হিম, গেটস ডিচড, টেকস রিভেঞ্জ। দ্য সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার ইজ অফ কোর্স ইউ। আই মিন মালভিয়া ইন দ্য স্টোরি। ডস দ্যাট সাউন্ড ইন্টারেস্টিং?"

"আই উড লাভ টু প্লে মালভিয়া। বাট আই নিড টু হিয়ার দ্য হোল স্ক্রিপ্ট টু গিভ ইট এ সেপ অ্যাস পার ইওর প্রেজাম্পশন"

"অফ কোর্স। উঁই ক্যান গো থ্রু ইট ওভার এ ড্রিঙ্ক অ্যান্ড ডিনার"

"ইওরস অর মাইন?"

"মাইন, বি মাই গেস্ট ফর টুনাইট। আই ক্যান অ্যাসিওর ইউ মাই ওয়াইফ ইজ অ্যান এক্সিলেন্ট কুক"

সত্যমের 'ওডিয়াম' ছবিটা শুধু হিট-ই করেনি, ইন্ডিয়াতে দেড়শো কোটি টাকার ব্যাবসা করেছিল। আর ফিরে তাকাতে হয়নি দেওয়ালিকে।

অনেক দিনের স্বপ্নটা রূপ নিচ্ছে। নতুন অবয়বে সাজছে। নতুন ছন্দে। ছোট্ট কুঠুরি ভেঙে দিচ্ছে ঝড়ের দাপটে। আগল ভেঙে ছুটতে মত্ত সুদূর আঙিনায়। স্বপ্নটা রূপে, ছন্দে, মহিমায়। একান্ত আপন।

'কোঁড়ক' আর 'ওডিয়াম' সাফল্যের তুঙ্গে পৌঁছলেও দেওয়ালির মনে হয়, এখনও কিছু বাকি। যার কাছে এসব তুচ্ছ। যা তাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আজও সেই সাফল্য খুঁজছে। একলা রাতে, ঘুমে জাগরণে, উন্মাদনাহীন, একা, নিজ চেতনায়।

“বালি ট্রিপের জন্য রেডি তো?” দিগ্বিজয়ের ফোনে বাস্তবে ফিরে এল। ওদের সঙ্গে চেতনার বিস্তর ফারাক থাকলেও, ওরাই তো কাণ্ডারি। ওরা শুধু বুক ছুঁতে চায়। ক্লিভেজ থেকে নিপলেই আটকে আছে। আর কিছু দেখার বুদ্ধিও নেই, ক্ষমতা তো নে-ই। প্রথা ভেঙে এগিয়ে যাওয়ার পথও চেনে না। জানতেও চায়নি। শেখেইনি। খেলছে, সংকীর্ণ অবয়বে।

“হ্যাঁ। সব ঠিক আছে। শোভন এক্সট্রা ভরতুকি দেবে তো?”

“আগেই তো বলেছি, তোমার লস পুষিয়ে দেব। বারবার এক কথা কেন...”

“হাতে টাকা না পাওয়া পর্যন্ত ভরসা নেই”

“বেশ। পুরো টাকাটাই আগেভাগে পৌঁছে দেব। হবে তো?”

“কাল? আমি পরশু মুম্বাই যাচ্ছি”

“জো হুকুম। কালকেই”

দিগ্বিজয় বুঝতে পারছে আজ ওকে এই দামে কিনলেও, কালকে ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে যাবে। বোধহয় পাঁচ-দশগুণ হয়ে যাবে। খ্যাতির সঙ্গেই মানুষের দামও যে বাড়ে, আর পাঁচজনের মতো সে-ও বোঝে।

দেওয়ালিও। পৌঁছতে চায় ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। অ-লিখিত সাম্রাজ্যের রানি হবে। শোভন কিংবা দিগ্বিজয়ের আলিঙ্গনে স্যান্ডউইচ হওয়ার মধ্যে নয়। এমন দিন কী কখনও আসবে? ভাবতেই শিউরে উঠল। যে বুকের ছোঁয়া চেয়ে হাজার মানুষ অগুনতি চাঁদি ফেলছে, শোভন দিগ্বিজয়ের মতো কেউকেটারা অ্যাডভানস ঢালছে, সেই বুকের বাহ্যিক দাম বুঝলেও, ভেতরের মর্ম তাদের কাছে অধরা। স্বপ্ন তখনই সত্যি হয়, যখন তাকে দেখা যায় একা, ঘুমভাঙা নিভৃত অন্ধকারে।

সেই আলোর পিপাসায় ছুটছে দেওয়ালি। এই চেনা-পরিচিত সকলকে ফেলে, অন্ধকার থেকে...

নয়

চিঠিটা নিয়ে থমকে বসে দেবাশিস। এ-ও সম্ভব?

অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর হুঁশ হল, দুনিয়াতে কোনও কিছুই অসম্ভব নয়। ক্ষমতা মানুষকে যে কোনও মুহূর্তে অহংকারী করে তুলতে পারে। না হলে, তার বহুদিনের বন্ধু অমর্ত্যর কাছ থেকে এরকম একটা জ্বালা ধরানো চিঠি!

অমর্ত্য কবেকার বন্ধু। সেই ১৯৯২ সাল থেকে। যখন দুজনেই সুকৃষ্টি থিয়েটার গ্রুপে একসঙ্গে কাজ করত। অমর্ত্য ছিল সাউন্ড অপারেটার। কলেজে বাংলার প্রফেসার। ১৯৯৫ সালে নিজের গ্রুপ মৃদঙ্গম স্থাপন করে থিয়েটার দুনিয়ার কাণ্ডারি হয়ে গেল। অমর্ত্য তার প্রথম নাটক 'বিলীন' লিখে পাকাপাকি জায়গা করে নিল নাট্য রচনার জগতে। পরে পরিমল সেন ও কিশোরী পুরস্কার লাভ করে নিজের রচনাশৈলীকে আরও বৃহত্তর পরিবেশে নিয়ে যেতে পেরেছে। নাট্য নির্দেশনায় দেবাশিসের নামডাক হয়েছে।

দুজনেই কাণ্ডারি। নাট্য জগতের পরিচিত নাম।

"আমার ছুটি হয়ে গেল" গম্ভীরভাবে অমিয় সেনকে ফোনে খবরটা দিল।

"মানে?" অবাক অমিয়।

"মানে আবার কী? পশ্চিমবঙ্গ নাট্য অ্যাকাডেমি থেকে অমর্ত্য ছুটি দিয়ে দিল।

ওদের মধ্যে চাপা মনান্তরের কথা অমিয়র জানা। নাট্য দুনিয়ায় থাকলে গুঞ্জন কানে আসে। অমিয়ই বা বাদ কেন? মতাদর্শে দুজনে বিপরীত অভিমুখে সোচ্চার হলেও সকলেই এক পথের পথিক। প্রায় সমবয়সি বলে হৃদ্যতাটা বরাবরই গাঢ়। মতাদর্শের পার্থক্য থাকতেই পারে। তার জন্য দেবাশিস ও অমর্ত্য অনেক বাড়তি সুযোগ পায় বলে মনে মনে আক্ষেপ। যাদের রাজত্ব, তারা বাড়তি সুবিধা ভোগ করার জন্যই তো দল করে। নীতিগত দিক থেকে নয়। পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গি ছেড়ে সেও হয়ত ওদের দলে নাম লেখাত, যদি না বিধানসভার টিকিটটা পিছলে হত। টিকিট পেলে সেও হয়ত অমর্ত্যর মতো মন্ত্রী হতে পারত।

নিয়তি কেন বাধ্যতে। যা হয়নি, তা নিয়ে অনুশোচনা করে লাভ নেই। বরং পারিবারিক চিন্তাধারা অনুসরণ করে, সেই মতকেই সামনে আনা শ্রেয়। অন্য সময় হলে, বিরোধী দলের সতীর্থের সঙ্গে মনোমালিন্যে আনন্দই পেত। কিন্তু দেবাশিসের মতো সুযোগ্য নাট্য নির্দেশকের অবসাদগ্রস্ত গলা শুনে খারাপ লাগল।

"তোমাদের মধ্যে মনোমালিন্যর কথা শুনছিলাম। কিছুটা আন্দাজ করতেও পেরেছি কারণটা। তবে তুমি তো বহুদিন এ লাইনে আছ। ভাবিনি সেটা এই পর্যায় গিয়ে পৌঁছবে"

"ক্ষমতার দম্ভ"

"সত্যি, ক্ষমতা মানুষকে কী নিদারুণ পাল্টে দেয়!"

"আমি দল করেছি ঠিকই। কিছুটা নিজের স্বার্থে। ঠিক নিজের বলব না। মৃদঙ্গমকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য গ্র্যান্ট প্রয়োজন। আফটার অল, এত বছরের নিজের হাতে তৈরি করা দল..."

“আমি তো দলে যোগ না দিয়েই চালিয়ে যাচ্ছি। অবশ্য তুমি তো জানো, আমার নীতিগত বিরোধিতা আছে”

“তোমার বাবা-মা দুজনেই দিকপাল। তাছাড়া তুমি সিনেমা, সিরিয়ালও কর। তোমার পক্ষে ব্যাপারটা অনেক সহজ। আমার পক্ষে একা টানা অনেক বেশি কঠিন”

শখ বজায় রাখতে কার কতটা সুবিধা, সে তর্কে না গিয়ে অমিয় বলল “একবার ফোন করে কথা বলে দেখতে পারো। পাওয়ার কনফ্লিক্ট। যদি মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং কিছু থাকে, কথা বললে মিটেও যতে পারে”

“নাঃ, আমি যেচে কথা বলতে যাব না। ওর আরও দেমাক বেড়ে যাবে”

অমিয়র বুঝতে একটুও অসুবিধা হল না, দেবাশিস আগের মতোই নিজের অহংকারে অটুট। অমর্ত্য মন্ত্রী বলে ওর ওপর আপার হ্যান্ড নেবে আর সে ইনিয়ে-বিনিয়ে রিকন্সাইলেশনে যাবে, এটা ওর কাছে পীড়াদায়ক।

“ছেড়ে দাও না। নাট্য অ্যাকাডেমির গদি আঁকড়ে কী হবে! অ্যাকাডেমিতে তোমার নাটকগুলো করতে দিলেই হল”

“রিসেন্টলি সেগুলোতেও মন্ত্রিত্ব ফলাচ্ছে। তাই থিয়েটার থেকে ব্রেক নিয়ে সিনেমা করছি”

“জানি, নাটক নিয়ে। শুটিং শেষ?”

‘হ্যাঁ। এডিটিং-এর কাজ চলছে”

“সময় দাও। সব ঠিক হয়ে যাবে। উড়লে পড়তে কতক্ষণ?”

ফোনটা কেটে অমিয়র মনে হল, বাঙালি কী সমষ্টিবদ্ধ হয়ে কোনও কাজ করতে পারে না? এক দলে থেকেও নয়? শিক্ষিত রুচিশীলদের মধ্যেই রেষারেষি, ক্ষমতার টানাপোড়েন। কাদা ছোড়াছুড়ি মারপিট। যাদের শিক্ষা কম, তাদের সামাজিক জীবনে গুরুত্বও অনেক কম। কোথাও পোজিশন নেই। টানাটানি নেই। শ্যামনগরের কনভেন্ট স্কুলের প্রাক্তনি দেবাশিস আঠারো বছর বয়স থেকে নাটক করছে। অমর্ত্যর বাবা-মা দুজনেই ডক্টরেট। সে নিজেও, এক সময় বাংলার প্রফেসর ছিল। অথচ সাধারণ জনগণ, যাদের সুবিধা গোছানোর জায়গা তাদের তো কোথাও থেকে পাওয়ার কিছু নেই। এদের থেকেও জ্বালা।

ফোন নামিয়ে দেবাশিসের ভীষণ ক্লান্ত লাগল। এমনিতে তো, মন্ত্রী হয়ে সব সুযোগ সুবিধাই অমর্ত্য ভোগ করছে। এটুকুতে হাত না দিলে চলত না? মানুষের খিদে পশুর থেকেও মারাত্মক। পেলে তালজ্ঞান থাকে না। পার্টি ধরে লাভের গুড় অমর্ত্যই একা খেয়ে গেল। তা যাক। অ্যাকাডেমিতে শো-গুলোয় বাধা না দিলেই হল। অ্যান্টিকুইটির বোতল ক্যাবিনেট থেকে বেরিয়ে এল আপাত শান্তির আশায়। মগজটা একটু ভিজিয়ে নেওয়া যাক, তারপর পরবর্তী পদক্ষেপের কথা ভাবা যাবে।

কালবৈশাখী হতে পারে। অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরল অমর্ত্য। রোজ দেরি করার জন্য মৌসুমী ঘ্যানঘ্যান করে “আগে যখন কলেজে পড়াতে তখন অন্তত সন্ধেবেলা বাড়ি থাকতে। এখন তো তোমার সঙ্গে কথা বলার সময়ও পাই না”

জামাটা ওয়ারড্রবে ঢুকিয়ে বলল “তখন তো মন্ত্রী ছিলাম না”

“সপ্তাহে দুটো দিন নাটকের রিহার্সালের জন্য বরাদ্দ ছিল। বাকি সময়টা ঘরে বসেই নাটক লিখতে”

বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল। বিলীন-এর পর আরও কত ভালো নাটক লিখেছে, মঞ্চস্থ করেছে। সায়নদেব, শহরের ইতিকথা, ওয়াকি-টকি, খুনের গল্প চক্রব্যূহ। রুদ্ধশ্বাস, রীতিমতো সারা ফেলে দিয়েছিল। মন্ত্রী হওয়ার পর থেকে লেখাটাও গেছে। মিটিং, কন্সটিটুয়েন্সি, পার্টি অফিস। জীবনটা পালটে গেল।

"এখন আর সময় করে উঠতে পারি না। সত্যি কী মন্ত্রী হওয়ার কোনও দরকার ছিল?"

"মাস্টারি করে যা কামাতে, তা দিয়ে এই বাজারে কী সংসার চলত?" মৌসুমীর ব্যঙ্গে কর্ণপাত করল না "অ্যামেচার নাটক করে মন ভরলেও তো আর পেট ভরে না"

এক সময় মৌসুমীও অমর্ত্যর সঙ্গে নাটকে কাজ করত। ঘরে না হলেও, অমর্ত্য নাটকের রিহার্সালে থাকত। এখন সে গুড়ে বালি। বাইরে তো ব্যস্তই থাকে, ঘরেও তেমন করে আর ওকে পায় না। আক্ষেপ হওয়ারই কথা।

"আজ অনেকদিন পর ফ্রি হয়েছি। লেখা নিয়ে বসব ভাবছি। একটু বরফ দাও তো" অমর্ত্য ক্যাবিনেট থেকে গ্লেনফিডিচের বোতলটা বার করল।

টাকা আর লেখা তো এক ঘাটে জল খায় না। আর হুইস্কি ছাড়া লেখাও বের হয় না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বরফ আর স্ন্যাক্স আনতে কিচেনে ঢুকল। কাজের চাপে রিল্যাক্স করার সময়ই পায় না। নয় আজ একটু খেলই। তবু যদি পুরনো লেখার অভ্যাসে ফিরতে পারে।

কলেজ জীবন থেকেই ওর লেখার একটা ন্যাক আছে। যখন ওরা দুজনে প্রিন্সেপ ঘাটে পাশাপাশি বসে থাকত, ল্যাম্পপোস্টের অল্প আলোয়, ও কত কিছু পড়ে শোনাত। তখন আর কোনও শ্রোতা ছিল না। একমাত্র মৌসুমী।

নাটক করতে গিয়েই ঘনিষ্ঠতা। প্রেমের পরিণতি বাসরঘরে। প্রখ্যাত নাট্যকার বাবা কোনও বাধা দেয়নি। নাটকের ফ্যামিলিতে ছেলে বউ যে এক পৃথিবীর হবে, এটাই স্বাভাবিক।

গ্লেনফিডিচে চুমুক দিয়ে কলম নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে অমর্ত্যর মনে হল, মন্ত্রী না হলে কি মাস্টারি করে এত দামি হুইস্কি খেতে পারত! কিছু পেতে গেলে কিছু-তো ছাড়তে হয়। অনেকদিন থেকেই মাথায় আইডিয়াটা কিলবিল করছে। এবার সময় বার করে লিখে ফেলতে হবে। এই ইন্টারন্যাল পলিটিক্স আর ভালো লাগে না।

টাকার প্রয়োজন ছিল... এসেছে। নামের আকাঙ্ক্ষা ছিল... হয়েছে। এখন মনের খিদে মেটানোই বাকি।

সেখানেই বাধা হয়ে উঠল দেবাশিস। হতে পারে অমর্ত্য নাট্য অ্যাকাডেমির চেয়ারম্যান। রোজ ছিচকে পলিটিক্স আর ভালো লাগে না। বিরক্ত হয়ে, শেষ পর্যন্ত জবাব দিতে হল। বেশ করেছে। সামটাইমস সামহোয়্যার ডাউন দ্য লাইন ইউ নিড টু একজার্ট পাওয়ার টু ইন্সটিল পিস। শান্তি না থাকলে ক্রিয়েটিভিটি আসবে না। লেখাও হবে না।

পরপর দুটো পেগ নেওয়ার পর হারানো শব্দগুলো খুঁজে পাচ্ছে। কম বয়সের লেখার মেজাজটা একবার যখন এসেছে, হুড়হুড় করে বেরবে। মাত্র দু পাতা লিখেছে। হঠাৎ ফোন।

"অমর্ত্য কিছু একটা কর। ওরা আমাদের বাড়িতে ইটপাটকেল ছুড়ছে" সিদ্ধার্থদা। এক সময়কার প্রখ্যাত বাচিক শিল্পী।

"কী হয়েছে সিদ্ধার্থদা?"

"একটু জোরে মাইক বাজছিল বলে আপত্তি করছিলাম। কারা জানি না রাস্তা থেকে আমাদের জানলায় ইট ছুড়ছে। বেশ কটা জানলা ভেঙে দিয়েছে"

"আমি দেখছি সিদ্ধার্থদা। আপনি একটুও চিন্তা করবেন না"

তার কন্সটিটিউয়েন্সি দমদম ক্যান্টনমেন্টে থাকে। কিছু তো করতেই হবে।

ধুস শালা। লেখাও গেল। নেশাও গেল। এখন ওসিকে ফোন কর। ঝামেলা মেটাও। নেশা যাওয়ার জন্য যতটা দুঃখ্য, তার থেকেও লেখার মুডটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার। খাতাটা সরিয়ে মোবাইলে। মন্ত্রী থাকাকালীন বোধহয় সৃষ্টিশীল কিছুই হবে না। কথাটা ঠিক। লক্ষ্মী আর সরস্বতী বোধহয় সচরাচর এক নৌকায় চাপে না। একমাত্র দাদুর বাড়িতে আসার সময় ছাড়া। তাও আবার মায়ের সঙ্গে!

দশ

“একরূপ, অ-রূপ-নাম-বরণ আগামী-অতীত-কাল-হীন,
দেশহীন, সর্বহীন, ‘নেতি নেতি’ বিরম যথায়
সেথা হতে বহে কারণ ধারা
ধরিয়ে বাসনা বেশ উজালা
গরজি গরজি উঠে তার বারি
‘অহমহমিতি’ সর্বক্ষণ”

অন্ধকার জি ডি বিড়লা সভাঘরের স্ক্রিন ওঠার আগেই উদাত্ত কণ্ঠে ভেসে এল পঞ্চতপার বিবেকানন্দর লেখার একাংশ। আলেখ্যর শিল্পীরা স্টেজের বাঁ দিকে বসে। ডান দিকের পোডিয়ামে পঞ্চতপা আবৃত্তি করে চলেছে।

“বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ নিয়ে একটা প্রোগ্রাম করা যেতে পারে”

প্রায় ধুলিসাৎ অস্তিত্বকে পুনরুদ্ধারের আশায় শুভ্রা মিত্রের কাছে কথাটা পেড়েছিল অঞ্জন। এসব প্রোগ্রামের অংশীদার না হলে, ইমার মতো শিল্পীরা স্বীকৃতি দেবে কেন? ওরাও তো কাঙালের মতো বসে আছে প্রোগ্রামের আশায়। যত চিমসেই হোক না কেন, নাই মামার চেয়ে কানা মামা কিছুটা ভাল।

“স্পন্সর?”

“কেন? আমাদের শোভন তো আছে”

তারকাদের মাঝে বিরাজ করতে সব সময়ই ভালবাসে শোভন। নিজেকে কেমন দামি মনে হয়। অর্থবলে সংস্কৃতির মধ্যমণি হয়ে ধ্বজা ধরতে বদ্ধপরিকর। সদা প্রস্তুত। দাদার উপার্জিত কোটি কোটি টাকার একাংশ নয় একটু দানধ্যানের কাজে লাগাল। অস্তিত্ব সঙ্কটের মধ্যে তো একটু স্বস্তি পাওয়া যাবে। সেটাই বা কম কীসের? তাই ঔদার্যের কোনও খামতি নেই।

“আপনি স্ক্রিপ্টটা তাহলে লিখে ফেলুন। আমি অন্যান্য শিল্পীদের সঙ্গে কথা বলছি। শোভন রায়চৌধুরির সঙ্গে কনফার্মড হয়ে আমায় জানাবেন”

শুভ্রার সায়ে নাকতলার বাড়িতে কলম হাতে বসে পড়েছিল অঞ্জন। ভাবছিল, কী ভাবে রবীন্দ্রনাথ আর বিবেকানন্দকে নতুন মোড়কে সাজানো যায়। বাঙালি ভুতের কথা শুনতে খুব ভালবাসে। এরা আবার সাধারণ নয়। ব্রিটিশ আমলের ভুত। তায় দেশপ্রেমী, যেটা পাবলিক খাবে। অবশ্য এই খাওয়ানোর নেশায়, নিজের কথা কিছু আর বলা হল না। বেলা অনেক হল। টিকে থাকার জন্য, সৃষ্টির চেয়ে খাওয়ানো অনেক জরুরি। চিন্তার যে ব্যাপ্তি প্রয়োজন, সেটা তার নেই। খুব ভাল করেই জানে। তাই মশলা ঢেলে টিকে থাকা। কিছু কামিয়ে নাও, লাইমলাইটে থাক।

ইমা আক্ষেপ করে বলল “শুভ্রাদিকে আমার থেকে অনেক বেশি মাইলেজ দিলেন?”

“শুভ্রা তোমার থেকে সিনিয়ার, অনেক বেশি পপুলার। বেশি মাইলেজ তো দিতেই হবে। ওর নামেই তো হল ভর্তি হবে” অঞ্জন থেমে বলল “চিন্তা কর না ইম... অন্যভাবে পুষিয়ে দেব”

ইমা বুঝে উঠতে পারল না, আর কী ভাবে অঞ্জনদা পুষিয়ে দেবে। টিকে থাকার জন্য, প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের সঙ্গে এখনও স্ট্রাগল করতে হচ্ছে।

লিলুয়ার নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়ে ইমা। ছোটবেলা থেকেই ভাল গায়। পারবারিক উৎসাহে অন্যান্যদের মেয়ের মতোই রবীন্দ্রভারতী থেকে মাস্টার্স করার পর একটা ব্রেক খুঁজছিল।

ইউনিভার্সিটির এক বন্ধুই খবরটা পেড়েছিল "শুনলাম নতুন আর্টিস্টদের নিয়ে তারা টিভি একটা প্রোগ্রাম করছে। একবার দেখবি?"

"কী করতে হবে?"

"ঠিক বলতে পারব না। চল না, একদিন সল্ট লেকে তারা টিভির অফিসে যাই। গিয়ে খোঁজ নিই"

কপাল খুলে গেল। অপরাহ্ণের গানের আসর। অন্যান্য তরুণ-তরুণীদের সঙ্গে নতুন প্রয়াস। গায়কী মনে দাগ কাটল শ্রোতাদের। 'সকালের নিমন্ত্রণে' প্রোগ্রামে গাওয়ার সুযোগ।

ওই চ্যানেলের টক-শোর অন্যতম অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের তখন মন্দা চলছে। গুণী-মানী ব্যক্তিদের ইন্টার্ভিউ নিলেও, ব্যক্তিগত জীবনে উপসি ছারপোকা। সেরকম কাউকে ফাতনায় গাঁথতে পারছে না। মন মানলেও, দেহ সায় দেয় না।

"গীতি-আলেখ্য লিখেছি। নতুন প্রতিভার খোঁজ করছি। তোমার গলাটা তো বেশ। গাইবে?"

অন্ধকারের মধ্যে যেন ক্ষীণ আলোর রেখা "নিশ্চয়ই"

"এসে একদিন দেখা কর আমার বাংলা টিভির অফিসে"

এপিসোড শুটের পর চায়ে চুমুক দিয়ে ইমাকে দেখল। ছিপছপে ছোটখাট চেহারা। ভারী ফ্রেমের চৌকো চশমা। রুদ্রাক্ষের মালা। পাট করা সবুজ পাড়ের সাদা শাড়ি ও সবুজ ব্লাউজের অন্তরাল কল্পনা করার চেষ্টা করল।

মন্দার বাজারে মন্দ কী!

"নতুন এসেছ। গান শুনেছি। ভালোই গাও"

খুশি হল ইমা। অঞ্জনবাবুর মতো সেলিব্রিটি তার তারিফ করছে। কম কী! কেউ তো সুযোগ দেয় না। যেচে ডেকেছে।

কবিগুরুর জন্মদিন উপলক্ষে রবীন্দ্র সদনে গীতি-আলেখ্য। অনেকে থাকলেও, ইমাই প্রধান শিল্পী। ফাংশন শেষে অঞ্জন বলল "শিল্পীদের জন্য ডিনারের বন্দবস্ত করেছি। গোল্ডেন পার্কে। না খেয়ে কিন্তু যাবে না"

"রাত হয়ে যাবে। লিলুয়া ফিরতে হবে। বাস পাব না। আরেকদিন?"

"তা হয় নাকি? এত ভালো গাইলে। না খেয়ে যেতেই দেব না"

"বাবা চিন্তা করবে"

"ফোন করে দাও। আমি নিজে গাড়ি করে পৌঁছে দিয়ে আসব। চিন্তা করতে বারণ কর"

বাড়ি পৌঁছেছিল রাত বারোটার পর। বাবা ঘুময়নি, বারান্দায় পায়চারি করছিল "এত রাত করলি?"

"কী করব? ফাংশনের পর গোল্ডেন পার্কে ডিনার ছিল। প্রথম বড় পাবলিক ফাংশন। কলকাতার অনেক বিশিষ্টজন ছিল। ছেড়ে আসি কী করে? এখানেই তো কন্ট্যাক্টস তৈরি হয়" ব্যাগটা খাটে ছুড়ে, আলনায় শাড়িটা মেলে বাথরুমে ঢুকে গেল।

রক্ষণশীল বাবার আপত্তি থাকলেও, মেয়ের কেরিয়ার বলে কথা। মেয়ে বড় হয়েছে, ভালমন্দ যা বুঝবে, তাই করুক।

"চিন্তা তো হয়"

"অঞ্জনবাবুর মতো বয়স্ক লোক থাকতে চিন্তা করার তো কারণ নেই। তুমি ঘুমতে যাও বাবা। আমি ঠিক আছি"

আরেক অধ্যায়। অঞ্জনদা কী ভাবে পোষাবে জানা নেই। সায় দেওয়া ছাড়া কিছু করারও নেই। এরাই বাংলা কৃষ্টির ধ্বজাধারী। এদের ছেড়ে যাবে কোথায়? বেশি বলতে গেলে, ছুড়ে ফেলে দেবে। তার মতো অনেকেই লাইনে রয়েছে। চেষ্টাও করছে নাম করার। তাই শুভ্রাদিই সই। এখন যা পাওয়া যায় তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

স্ক্রিন উঠে গেছে। পঞ্চতপা তখনও পোডিয়ামে। ভাষ্য-আবৃত্তি শেষ হলে ইমার গানেই অনুষ্ঠানের সূচনা। ভৈরবী রাগে ত্রিতালে রবীন্দ্রসংগীতঃ

'পিপাসা হায় নাহি মিটিল, নাহি মিটিল ॥

গরলরসপানে জরজরপরাণে

মিনতি করি হে করজোড়ে,

জুড়াও সংসারদাহ তব প্রেমের অমৃতে ॥'

ব্রহ্মসংগীতের কথা যেন দুজনেরই জীবন দর্শনের অঙ্গ। একজন ঈশ্বর খুঁজেছিল ভারত প্রদক্ষিণ করে তার স্বরূপকে দেবী দুর্গার অবয়বের ছাঁচে দেখতে। আরেকজন চেয়েছে দুঃখের আঁধারে অদেখা ঈশ্বরকে সাধনায় পেতে। পথ ভিন্ন হলেও, মতের সামঞ্জস্য অকল্পনীয়। দুজনেই সমসাময়িক।

গান শেষ হতেই শুভ্রা মিত্রের কণ্ঠে ভেসে এলঃ

'নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতি

নাহি শশাঙ্ক সুন্দর'

গান শেষে অঞ্জনের ভাষ্য, নৃত্য, আরও গান, আবৃত্তি। দারুণ অনুষ্ঠান। হল জুড়ে হাততালি। শেষে শোভনের বিনম্র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। সবাইকে।

বেরিয়ে যাচ্ছিল ইমা। আজকে কোনও হোটেলে ডিনার নেই।

"যাচ্ছ কোথায়? দাঁড়াও। কথা আছে"

দাঁড়িয়ে পড়ল। গ্রিনরুমের এক কোণায় বসে। অঞ্জনদা অন্যান্য শিল্পীদের সঙ্গে কথায় ব্যস্ত। এখন আর আগের মতো তাড়া নেই। সাকসেসের ঝলকে সেলিব্রিটি জীবনের সঙ্গে ধাতস্থ হয়ে গেছেন বাবা। এখন আর চিন্তা করেন না। তবে মধ্যবিত্ত মন ছেড়ে আদৌ বেরিয়েছে কি না ইমা জানে না। তবে এই জীবনের পাশে তাদের মধ্যবিত্ত যাপনের যে অনেক তফাত, সেটুকু বুঝতে পারে। রাতে না ফিরলেও চিন্তা নেই। শো-এর জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তো হরদম যতে হয় তাকে। মেয়েকে তো আর চিরকাল ছাতার আড়ালে রাখতে পারবে না। বড় হয়েছে। প্রতিষ্ঠিত শিল্পী। আজকের দিনে টিকে থাকতে গেলে, যা করার, তা তো করতেই হবে। ভাল লাগুক চাই না লাগুক। নিরুপায়।

"অঞ্জনদা... দেরি হয়ে যাচ্ছে..."

“আমি তো আছি। চিন্তা কীসের? বস”

অতএব প্রতীক্ষা। কতক্ষণ বসে ছিল খেয়াল নেই। সারাদিনের ক্লান্তি, একটু ঝিমুনি।

“অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলাম” অঞ্জনদার কথায় ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, ঘণ্টা দেড়েক পার হয়ে গেছে “এত রাতে, বাড়ির সবাইয়ের ঘুম ভাঙাবে? চল। আমার বাড়িতেই রাতটা থেকে যাও। সেখানেই কথা হবে”

যখন পৌঁছল পেট চোঁ চোঁ করছে। আসার সময় কালীঘাট থেকে বিরিয়ানি আর চাপ কিনেছিল অঞ্জনদা। সেগুলো মাইক্রোওয়ভে গরম না করেই গোগ্রাসে গিলতে লাগল ইমা। চেঞ্জ করতে ঘরে ঢুকে গেল অঞ্জন। খাওয়া শেষে শাড়ি-ব্লাউজটা আলনায় ফেলে ভাবল, এই ব্যাচেলারের বাড়িতে আর শাড়ি পাবে কোত্থেকে? আর পরেই বা কী হবে? একটু পরেই তো খুলে ফেলতে হবে।

যা ভেবেছে তাই। বাইরে এসে দেখল পাজামা-গেঞ্জি পরে অঞ্জনদা সিঙ্গল মল্টের বোতল খুলে বসেছে।

“খেলেন না?”

“দাঁড়াও একটু গলাটা ভিজিয়ে নিই। খুব খিদে পেয়েছিল, না? রিয়েলি সরি। একটু দেরি হয়ে গেল”

ইমার দিকে তাকাল। জানলা দিয়ে আসা চাঁদের আলোয় শ্যামলা গায়ে সাদা ব্রা চিকচিক করছে। ইমা চশমা খুলে উলটো দিকের চেয়ার বসতে বলল “একটু খাবে নাকি?”

ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলল “দিন একটু। সারাদিন যা ধকল গেছে না”

“বস। আরেকটা গ্লাস নিয়ে আসি”

“আপনি বসুন। আমি আনছি”

“চিয়ার্স টু আওয়ার ফিউচার”

“চিয়ার্স”

লিলুয়ায় বসে কখনো কী ভেবেছিল মাঝরাত্তিরে এক বৃদ্ধের সঙ্গে একলা ঘরে বসে মদ খাবে! বাবা জানতে পারলে ভিরমি খেত। বাবা জানেও না, মেয়ের এই খ্যাতির জন্য কী দাম দিতে হয়। নামটা ফলাও করে পাঁচজনকে বলেই খালাস। সেলিব্রিটি হওয়ার মূল্য চোকাতে হয় এই মধ্যরাতের অভিসারে।

কবিগুরুর পিপাসা কোথায় গিয়ে থেমেছিল, জানা নেই। গরল পানে জর্জর প্রাণে যে তার খ্যাতির পিপাসা মিটবে, সন্দেহ নেই। সেখানে নিজেকে সঁপে দেওয়ার মধ্যে বিবেক না থাকলেও, নাম আছে, টাকা আছে। আছে প্রতিপত্তি।

“দারুণ ভাল গেয়েছ” গ্লাস ভর্তি করে বলল।

“আপনি তো বলেই খালাস। আমার থেকে শুভ্রাদিকে প্রায়রিটি বেশি দেবেন”

“একদম নয়। এই পড়ন্ত বাজারে, শুভ্রাকে না ভেড়ালে, যে আসর জমবে না”

উঠে কিচেন থেকে খাবারটা নিয়ে বলল “খেয়ে নিন। অনেক রাত হয়েছে। বেশি খেলে আর খেতে পারবেন না”

জীবন্ত বিরিয়ানি সামনে বসে থাকতে, এই ঠান্ডা খাবারের কী স্বাদ? পেট ভরলেও, মন তো ভরে না। সামনে যখন ইমার আধখোলা দেহটা হাতছানি দিচ্ছে।

খাওয়া শেষে, হাত ধুয়ে বসে বলল "হুইস্কি আর মহিলা না থাকলে কী ক্রিয়েটিভিটি আসে? মহিলা না থাকলে কি রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ হতে পারত?"

একটু বোধহয় নেশা হয়েছে। ইমা চুপ। রবীন্দ্রনাথ কেন মহান এই মুহূর্তে অঞ্জনদাকে বোঝানো বাতুলতা মাত্র। ওনার মহিলা সংসর্গ বিক্রি করেই, অঞ্জনদা আজ নামী সাহিত্যিক। আর ইমা কি না ওঁকে বোঝাবে কবিগুরুর মহিমা! যার সংগীত নিবিষ্ট মনে সাধনা করে বড় হয়েছে, তার মর্ম অঞ্জনদার কাছে যাই হোক না কেন, ইমার সারা জীবনের তপস্যা, সাধনা, ব্রত।

"রবীন্দ্রনাথের কথা ছাড়ুন তো। এই যে বললেন পুষিয়ে দেবেন, কী ভাবে?"

এমনি এমনি রাত্রিবাস করতে আসেনি ইমা। খালি হাতে ফেরত যাওয়ার জন্য তো নয়ই।

"তোমার একটা সোলো প্রোগ্রাম তো করবই। তাছাড়া শোভন এবার অ্যামেরিকার বঙ্গ-সংস্কৃতি স্পন্সর করছে। ওখানে, আমাদের সঙ্গে তুমিও যাচ্ছ"

'আমাদের' শব্দটার মধ্যে কী একটু বেশি এম্ফাসিস ছিল? ওটা রঙিন পানীয়ের জন্যেও হতে পারে। কে বা কারা সঙ্গে যাচ্ছে, সেটা বড় নয়। ইমা অ্যামেরিকা যাচ্ছে, সেটাই প্রধান।

সোফা ছেড়ে অঞ্জন ইমার পাশে। কোনও ভণিতা না করেই ওর বুকের ওপর কাঁপা হাতের শিথিল স্পর্শে খেলতে লাগল। কয়েক পেগ হুইস্কি পেটে না থাকলে, গা-টা রি রি করত। এটাই চাবিকাঠি। সোনার সিন্দুক খুলতে গেলে চাই নামমাত্র নজরানা। এই দিয়ে যদি আলাদিনের প্রদীপ পাওয়া যায়, ক্ষতি কী?

এই মোহ ছেড়ে পালায় কোন পাগল? আর যেই হোক, ইমা পাগল নয়। সে আজকের সারথি। ভাগ্য থাকলে, যুগের কাণ্ডারিও হয়ে যেতে কতক্ষণ? অজানা রোশনাই হাতছানি দিচ্ছে। সেই আলোর সম্ভারে যাবতীয় অন্তর্বাস যে খসে পড়বে, এটাই তো স্বাভাবিক। বেশি আর কী করতে পারে এই বৃদ্ধ? যে মাত্রায় গিলেছে, হুইস্কি লিবিডো বাড়ালেও ভায়াগ্রা কতখানি কার্যকরী হবে বলা মুশকিল। শেষ পর্যন্ত একটু হাতিয়ে ঘুমিয়ে পড়বে।

অঞ্জনদাকে বুঝতে ভুল করেছিল ইমা।

এগারো

বিবস্ত্র দেওয়ালি ঘর সংলগ্ন স্পায়ের বাথটবে রিফ্রেসড। এতটা অবকাশ তো কলকাতা-মুম্বাইতে শুটিং, ইন্টার্ভিউ, পার্টির ফাঁকে পাওয়া যায় না। মোবাইল বাকিটা সময় খেয়ে নেয়।

শোভন-দিগ্বিজয়ের ফুর্তিতে শামিল হতে এসেছে। নগদ পনেরো লাখ আগেই দিগ্বিজয় ক্যাশ দিয়েছে। তার স্টারডমটাই যে এই রোজগারের উৎস, অস্বীকার করা যায় না। দামটা খ্যাতির। ওপরে পৌঁছতে পারলে পারদটাও চড়বে। শরীরে বাথ সোপ বোলাচ্ছে। ঈষদুষ্ণ জলে কাঁধডোবানো ফেনা। অন্তরালে হাতটা কোথায় ঘোরাফেরা করছে, অনভুতি ছাড়া বোঝার উপায় নেই। একান্ত নিভৃত অরগ্যাজমেই তৃপ্তি। আপাত পুরুষ সংসর্গের মধ্যে যা সে কখনো পায় না।

এ অঞ্চলের সন্ধেটাই অন্যরকম। রাতের আঁচলটা আস্তে আস্তে বালির হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে। সন্ধ্যা গুটি গুটি রাতের কোলে ঢলে পড়ছে। স্বচ্ছ আকাশের দরজা খুলে এক একটা মৃদু তারার মোমবাতি জ্বালিয়ে দিচ্ছে। পেটিটেঙ্গেট বিচের ওপর এই রিসরটে। ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে তারার আলো স্নিগ্ধতার স্পর্শ ছড়িয়ে দিচ্ছে। সম্মোহনী রাত অভিসারে ডাকছে মাতাল করে দেওয়া পসরা সাজিয়ে।

দূর থেকে ভেসে আসছে সমুদ্রের মৃদুমন্দ কলরব। খায়ানগান ড্রিমস ভিলা কেরবোকান রেস্টুরন্টে বসে আ লা প্লাঞ্চা[1] খাওয়ার সময় আরও প্রকট ছিল। বাথরুমের দেওয়াল আওয়াজটা ক্ষীণ করে দিয়েছে।

বালির স্পেশালিটি। বেশ খেতে। এর আগে খায়নি। স্বপ্নেও কী ভেবেছিল, কোনওদিন এই রিসর্টে বসে স্বাচ্ছন্দ উপভোগ করবে!

আজ বিকেলে যখন নগূড়া রাই ইন্টারন্যাশনল এয়ারপোর্ট থেকে পৌঁছল, রিসর্টে চেক-ইন করে ওরা দুজনেই বেরিয়ে গেল "আমাদের কয়েকজনের সঙ্গে দেখাশোনা করতে হবে। তুমি খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম নাও। কাল ঘুরতে যাব"

দেওয়ালি হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। অনন্ত আজকের দিনটা নিজের মতো। উদ্দেশ্যহীনভাবে পেটিটেঙ্গেট বিচের ধূসর বালির ওপর পায়চারি। যতক্ষণ না দিনের আলো সন্ধ্যার আঁচলের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে। শেষ আলোটার দিকে তাকিয়ে, কোথায় যেন হারিয়ে গেল দেওয়ালি। নিজেকে দেখছে। সমুদ্রের শৃঙ্গারের মধ্যে কোনও রিসর্ট থেকে ভেসে আসছে এক অচেনা সুর। খুব কাছের। তবুও তাকে ছুঁতে পারছে না। পরে জেনেছে ওটা বালিনিজ গ্যমেলান[2]।

কলেজে পড়ার সময় লাজুক দেওয়ালি দূর থেকে ভালবেসেছিল অদ্রিজকে। শ্যামলা দেওয়ালির সাহসও ছিল না তাকে মনের কথা বলার। অব্যক্ত ভালবাসায় গুমরেছে। শুধু বলতে পারেনি 'আমি তোমায় চাই'। দূর থেকে দেখে, কখনো একটু সান্নিধ্যে, বুক কেঁপে উঠেছিল। সেটুকুই পাওয়া।

বাথরোব জড়িয়ে বারান্দায় এসে বসল। গবলেটে আরাক বালি[3]। থলথলে বুকটা চেপে ধরল দেওয়ালি। অব্যক্ত কান্নার মোচড়। থামতে গিয়ে অনুভব করল, পুরুষ্ট বুকের ওপরই কেবল হাতটা ঘোরাফেরা করছে। কান্নাটা যেন আরও গভীর অতলে। এই দলা মাংসপিণ্ড যার এক ঝলকের আশায় হাজার হাজার লোক টাকা

ফেলছে। অনেকে লাখ লাখ ওড়াচ্ছে। তাকেই শুধু ছোঁয়ার জন্য। স্তনের খোলস সরিয়ে কান্নার অভ্যন্তরে কেউ পোঁছতে পারছে না। চাঁদের আলো আলগা হওয়া বাথরোবের ফাঁক দিয়ে স্তনের ওপর, ক্যালিডিওস্কপের মতো খেলে বেড়াচ্ছে। সেও কান্নাকে ছুঁতে পারছে না।

জানলার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো আসতেই উঠে পড়ল। আরাক বালির নেশায় কখন ঘুমিয়ে পড়েছে, খেয়াল নেই। বিবস্ত্র শ্যামলা দেহটা, বিছানার চাদরের ওপর আলোর রশ্মিতে উদ্ভাসিত। স্টার বলে কথা। মেক আপ থাকুক, চাই না থাকুক কিরণ তার সমগ্রতার মধ্যে।

তাড়াতাড়ি উঠে হাউসকোট জড়িয়ে বাথরুমে ঢুকে পড়ল। এখুনি বুঝি শোভন দরজায় কড়া নাড়বে। যা ভেবেছিল তাই। আধ ঘণ্টা পরেই দরজায় টোকা। ততক্ষণে প্রাতঃকৃত্য শেষ করে জগিং ড্রেস পরে নিয়েছে। রোজ সকালে ঘণ্টাখানেক জগিং করা অভ্যাস। সব সময়ই ভয়, এই বুঝি এখানে-ওখানে ফ্যাট না জমে যায়। মেদ জমলেই ডিম্যান্ড কমে যাবে। আজও ভাবছিল বিচে গিয়ে জগিং করবে। আরাক বালির সৌজন্যে ঘুম থেকে উঠতে একটু দেরি হয়ে গেছে। তাতে কী?

“রেডি হয়ে নাও। আমরা বিচে ব্রেকফাস্ট করব। সুইমিং ট্রাঙ্কস আনোনি?” শর্টস পরা শোভন জিজ্ঞেস করল।

মাথা নাড়ল। সি বিচে আসছে। সুইমিং ট্রাঙ্কস না নিয়ে আসে?

“পনেরো মিনিট সময় দিন। রেডি হয়ে নিচ্ছি”

“বেশি দেরি করলে, আরও গরম হয়ে পড়বে। তখন সমুদ্রে স্নান করা যাবে না। তারাটারই চেঞ্জ করে নাও”

সাদা টু-পিস বিকিনি পরার সময় আয়নায় দেখল। ঘুরে ঘুরে দেখল। কোথাও কী মেদ জমেছে? রিহার্সাল করার সময় ঘরে একলা বহুবার আয়নার সামনে অনুশীলন করেছে। ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন ঠিক হচ্ছে কি না। শুধু চেহারা আর মেক-আপ দিয়ে শিখরে পৌঁছনো যায় না। অভিনয় দক্ষতা প্রমাণ না করতে পারলে নিজস্বতা বজায় রাখা কঠিন।

“এটা কী?”

“ওরা বলল বুরবুর আয়েম[4]। বালির ট্র্যাডিশনল ব্রেকফাস্ট” বিচে লাউঞ্জারে পা ছড়িয়ে শোভন বলল।

“বেশ খেতে তো। আগে কখনো খাইনি। সকালে উঠেই ভাত? ভুঁড়ি না বেড়ে যায়...”

রিসর্টের সার্ভিস খুব ভাল। বিচেই সার্ভ করে গেছে।

দিগ্বিজয় সাকালবেলায়ই উদয়ন ক্রিকেট ক্লাবের মিটিং-এ বেরিয়ে গেছে। সারাদিন মিটিং। ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার। শোভনকে ছেড়ে গেছে দেওয়ালির সঙ্গে মৌজ করার জন্য।

লাউঞ্জারে সানগ্লাস পরা দেওয়ালির দিকে তাকাল। ছিপছিপে শ্যামলা দেহটা হয়ত একটু বেশি সান-রে অ্যাবসর্ব করবে। কিন্তু সাদা বিকিনিটা সকালের আলোয় চিকচিক করছে। নাকি ঝলমলিয়ে উঠছে, ওকে পাওয়ার কামনা। ম্যাগনো ইন্ডিয়ার অকর্মণ্য কর্ণধার বলে নয়। তদানীন্তন সংস্কৃতির ধ্বজাধারী হিসেবে জীবনে তো কম মেয়ে ভোগ করেনি। দেওয়ালির সঙ্গে এই প্রথম। মনে মনে সংশয়, শেষ নয়ত? যে ভাবে তরতরিয়ে দেওয়ালি উঠে যাচ্ছে, পরে টাকা লুটিয়েও পাওয়া যাবে না।

সমুদ্রে নেমে পড়েছে ওরা। ঢেউয়ের তালে ব্রেকার ভেঙে আরও গভীরে চলে যাচ্ছে। উপচে পড়া ঠান্ডা জলোচ্ছ্বাস স্নান করে দিচ্ছে তপ্ত বেলাভূমি। খেলতে... আয় আয় খেলবি না...

শোভনের এনার্জি দেওয়ালির দ্বিগুণ। ব্যান্ডেলে বড় হওয়া, পাড়াগাঁয়ের উলঙ্গ ছেলের পুকুরপাড়ে জলে ঝাঁপ দেওয়া পুরনো অভ্যাস। জলে ভয় নেই। ঢেউয়ের তালে ভেঙে বেরিয়ে যাওয়ার মধ্যে অ্যাডভেঞ্চারের মাদকতা। যেমন দেওয়ালির সঙ্গে প্রমোদ স্বর্গে। স্বল্পবসনা দেওয়ালিকে জড়িয়ে ঢেউ ভাঙা। ছকভাঙা মাদকতা। সারাদিন তো পড়ে আছে।

দিগ্বিজয় বলেই গেছে “ডিনারের পর ফিরব। আজকের দিনটা তোমার”

দু-দশ লাখ যাই হোক না কেন, এই অনুভূতি কী টাকার অঙ্কে মাপা যায়? অন্যান্য মেয়েদের থেকে ও আলাদা। কেন? কী ভাবে?

ঢেউ-এর তালে তাল মিলিয়ে দুজনে হারিয়ে যাচ্ছে আরও গভীরে। আরও... আরও... আরও গভীরে... দেওয়ালির ভয় করছে। সাঁতার জানলেও শোভনের মতো পারদর্শী নয়। আনন্দে হলেও সারা শরীর কাঁপছে। বাধা দিয়ে বলল “আর না। ফ্ল্যাগের শেষ সীমায়”

“ফ্ল্যাগ? কীসের ফ্ল্যাগ?”

“দেখেননি সমুদ্রে নামার আগে লেখা ছিল, ফ্ল্যাগের সীমানা ছাড়িয়ে যাতে না যাই”

“তাই নাকি?”

“আমারও টায়ার্ড লাগছে। চলুন ফেরত গিয়ে বিচে রিল্যাক্স করি” - সমুদ্রসাঁতার মেয়েদের ক্লান্ত করে -

“বেশ, চল”

লাউঞ্জারে বসে দেওয়ালি তোয়ালে দিয়ে গা মুছল। এমনিতেই রং কালো। প্রখর রোদের তাপে, সমুদ্রের জলকণার প্রলেপে, আরও শ্যামলা হয়ে যাবে, যদি তাড়াতাড়ি না মোছে। সামনে এতগুলো ছবির শুটিং। মেক-আপের প্রলেপ লাগিয়েও শ্যামলা রঙের আবরণকে ঢাকা যাবে না। শোভন-দিগ্বিজয়ের সঙ্গে লাখের দামে আজকের অভিসার কাল শেষ হয়ে যাবে। এই চেহারাকে সম্বল করে এগিয়ে যাওয়াই ভবিতব্য। বলিউডে সবে পা দিয়েছে। হলিউড কাছে আনতে দরকার শুধু ভাগ্য আর সময়।

“ভীষণ খিদে পেয়েছে”

শোভনের কথায় ফিরে তাকাল “এই তো ব্রেকফাস্ট খেলেন...”

“কতক্ষণ আগে। তাও কি যেন নাম বলল বুরবুর আয়েম। চল লোকাল সিফুড ট্রাই করে দেখি”

“আপনি খান, আমি খাব না। অলরেডি ব্রেকফাস্টে ভাত খাওয়া হয়ে গেছে। এভাবে খেলে তো মোটা হয়ে যাব”

“আমাকে কম্প্যানি দেবে না?”

“কম্প্যানি দিতে কোনও আপত্তি নেই। তবে খাওয়াতে নেই। এভাবে খেলে যে-কটা সিনেমা হাতে আছে, তাও যাবে। কেউ নেবে না” বিকিনির ওপর বুটিকের কাজ করা লুঙ্গি জড়িয়ে, তোয়ালে দিয়ে ঊর্ধ্বাঙ্গ ঢেকে মুচকি হেসে বলল “আমাদের হিরোইনদের অনেক বুঝেশুনে চলতে হয়। একটু ফ্যাট জমলেই ডিসমিসড। চলুন আপনাকে কম্প্যানি দিচ্ছি”

বিচের গা ঘেঁষে দুজনে উত্তরে হেঁটে চলেছে। হাঁটতে হাঁটতে ক্রমশ সেক্লুশন থেকে সেমিনিয়াক লেগানের জনবহুল এলাকায়। পেটিটেঙ্গেট বিচ যতটাই নিরালা, সেমিনিয়াক বিচ অনেক বেশি লোকাকীর্ণ। দেওয়ালির আন্দাজ করতে অসুবিধা হল না, কেন ওরা এই নিরালা দিকটাই বেছে নিয়েছে। মহিলার সঙ্গে ফুর্তি করতে হলে, সেক্লুশন বাঞ্ছনীয়। বিশেষ করে, সে যখন স্ত্রী নয়। এদিকে অনেক লোকের সমাগম। ছোট, মাঝারি, বড় অনেক খাবারের দোকান। এই তিন কিলোমিটার হাঁটাতে শোভনের খিদেও যেন দ্বিগুণ বেড়ে গেছে।

"বড় রেস্টুরেন্টে তো সব সময়ই খাই। ছোট রেস্টুরেন্টগুলো অনেক বেশি অথেনটিক"

দেওয়ালি কোনও জবাব দিল না। নিজে যখন খাবে না, শোভন কোথায় খেতে চায়, ভেবে কী লাভ?

"একটা সি-ফুড প্ল্যাটার নিই? ভাগাভাগি করে খাব"

"আমি তো আগেই বলেছি, খাব না। সকালে ভাতের ব্রেকফাস্ট। দুপুরে আবার লাঞ্চ। বাপ রে... আমার এত খাওয়া ধাতে নেই"

শোবিজ দুনিয়ায় ঢোকার পর থেকেই বুঝে গেছিল, এই লাইনে টিকতে গেলে যেমন রথী-মহারথীদের খুশি করতে হবে, চেহারাটাও আটুট রাখতে হবে। মানে খাওয়া কন্ট্রোল করা। যতদিন বডি ফিট আছে, স্লিম আছে, ততদিন-ই কদর। না হলে বৌদি, কাকি, মায়ের রোল ছাড়া আর কিছুই জুটবে না। এ তো আর হলিউড নয়। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখ্য চরিত্রের ডিসপসিশন পাল্টে যায়। টলিউড-বলিউডে হিরোইনদের চেহারাই প্রধান। ওই বেচে ব্যবসা। চরিত্র চিত্রায়ন গৌণ। সে তো আর অমিতাভ বচ্চন নয়। যে চরিত্র বিশেষে গল্পের স্ক্রিপ্ট হবে। উঠতি তারকা মাত্র।

রাস্তার একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল শোভন। গরম গরম মাছ, রাস্তার ধারেই গ্রিল করে বিক্রি করছে।

"হোয়াট ফিস ইজ দিস?"

"মাহি-মাহি"

"ক্যান আই হ্যাভ ওয়ান?"

"ওয়েট এ ফিউ মিনিটস। লেট মি ফ্রেস গ্রিল ইট ফর ইউ"

"দারুণ। খেয়ে দেখলে পারতে। যতই হোটেল রেস্টুরেন্টে খাও না কেন, এই স্ট্রিট ফুডের স্বাদই আলাদা। আমি তো ব্যান্ডেলে পাড়াগাঁয়ের ছেলে। রাস্তার খাবার খেয়েই বড় হয়েছি"

"আপনি খান। এখনও ব্রেকফাস্টই হজম হয়নি"

যত্ন সহকারে গোটা মাছটাই সাপ্টাল। ঢেকুর তুলে বলল "আহঃ... পেট ভরে গেছে। হাঁটতে পারবে? চল জায়েগাটা একটু ঘুরে দেখে নিই। হজম করতে হবে তো..."

জালান রায়া সেমিনিয়াকের সারি সারি ডিজাইনার বুটিকের ড্রেসগুলো দেখছিল। কয়েকটা সিল্কের ড্রেস পছন্দসই, বেশ ভাল। কিনলে মন্দ হত না। সঙ্গে পার্স আনেনি, তাই কেনা যাবে না। শোভনের কাছে চাইতে লজ্জা করছে। এমনিতেই দিনের জন্য দু-লাখ দিয়েছে। এক্সট্রা আরও এক লাখ। এর পরে কী আর চাওয়া যায়? পরে নয়, এক বিকেলে, আবার ঘুরে কিনে নিয়ে যাবে। এছাড়াও ব্র্যান্ডেড দোকানের সারি - হ্যান্ডিক্রাফট, আর্ট ওয়ার্ক।

"ওয়াক"

ফিরে তাকাতেই দেখল, শোভন বমি করছে। সারা মুখ লাল হয়ে গেছে। রাস্তার ওপর বসে পড়ল।

“কী হল?”

“পে...টে ব্য...থা...” শোভন কথা বলতে পারছে না।

ঠিকই তো ছিল। হঠাৎ আবার কী হল? দেওয়ালি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। ঠিক কী করবে বুঝতে পারছে না।

শোভন এক পথচারীকে জিজ্ঞেস করছে “হোয়ার ইজ দ্য টয়লেট?”

আঙুল তুলে পাবলিক টয়লেটের দিকে ইঙ্গিত করল। রাস্তা থেকে উঠে, টয়লেটের দিকে ছুটল। দেওয়ালির মনে হল, নিশ্চয়ই সিরিয়াস কিছু হয়েছে। ওই মাছ খেয়ে নয়ত? এই বিদেশ বিভুয়ে তার কী করার আছে? কলকাতায় থাকলেই বা কী করত? হাসপাতালে নিয়ে যেত।

“ইজ দেয়ার অ্যান হসপিটাল নিয়ার বাই?”

“বি আই এম সি হসপিট্যল ইন কুটা” পাশের একজন বলল।

“হাউ ফার?”

“নট ফার। জাস্ট টেক এ ট্যক্সি। দে নো হোয়ার ইট ইজ”

পাবলিক টয়লেট থেকে বেরবার আগেই দেওয়ালি ট্যক্সি ধরে ফেলেছে “হাসপাতালে চলুন”

শোভন দাঁড়াতে পারছে না। মুখটা আরও বেশি লাল। ট্যক্সিতে উঠতে গিয়ে আবার বমি। দেওয়ালি ওকে ধরে কোনওক্রমে ট্যক্সিতে তুলল।

হাসপাতালে বেড প্যান আনার আগেই ট্রলিতে আবার পায়খানা করে দিল। ইট মাস্ট বি সামথিং সিরিয়াস। দেওয়ালি উদগ্রীব হয়ে ডাক্তার-নার্সদের কাণ্ডকারখানা দেখছে। সংক্ষিপ্ত হিস্ট্রি নেওয়ার পরই ড্রিপ চালিয়ে ইঞ্জেকশন দিল। কার্ডিয়াক মনিটর লাগিয়ে দিয়েছে।

এক ফাঁকে ডাক্তার জিজ্ঞেস করল “ডস হি হ্যভ অ্যাসমা?”

“নো ক্লু” আমতা করে বলল “আই অ্যাম নট অ্যাওয়ার অফ হিজ মেডিক্যাল হিস্ট্রি”

জানার কথাও নয়। হঠাৎ অ্যাসমার কথা জিজ্ঞেস করল কেন? ওরা একটা লম্বা পাইপ দিয়ে ওকে বমি করাচ্ছে। কিছুই বুঝতে পারছে না, কী হয়েছে? কিছুক্ষণের মধ্যে সম্বিত ফিরল শোভনের।

ক্ষীণ স্বরে বলল “উফ... মাথা ফেটে যাচ্ছে”

কপালে হাত দিতেই ছ্যাঁত করে উঠল। জ্বরে গাঁ পুড়ে যাচ্ছে। ইশারায় ডাক্তার তাকে ডাকল। পাশের ঘরে বসিয়ে বলল “ইটস স্ক্রমবয়েড পয়জনিং। প্রেসুমেবলি ডিউ টু দ্য ফিস হি কন্সিউমড। হোয়াট ফিস ওয়াজ দ্যট?”

“ডোন্ট রিমেম্বার দ্য নেম এক্সজ্যাক্টলি। দে সেইড সামথিং লাইক মাহি”

“আহ, দ্যটস ইট, মাহি-মাহি। সাম অফ দিস ওয়েসাইড জয়েন্টস স্টোর ফিস আন্ডার আনহেলদি কন্ডিশনস ফর ব্যাক্টিরিয়া টু জারমিনেট। ইট ইজ এ টাইপ অফ অ্যালারজিক রিঅ্যাকশন। ক্যান বি ফেটাল ইফ হি হ্যস অ্যাসমা। ইউ সেইড, ইউ হ্যভ নো আইডিয়া”

“ওয়েল... উই আর নট দ্যট ক্লোজ। থ্রি অফ আস কেম অন এ হলিডে” দেওয়ালি আমতা করে বলল।

"গুড। ইউ ব্রট হিম অ্যাট দ্য রাইট টাইম। ইট কুড হ্যাভ বিন সিরিয়াস। উই হ্যাভ সেন্ট ফর হিস্টামিন লেভেলস টু কনফার্ম দ্য ডায়গনসিস। অলস গিভেন বেনাড্রিল আইভি উইথ ডোমস্টল অ্যান্ড র‍্যানিটিডিন। হি সুড বি ফাইন" ঠোঁটের কোণে সান্ত্বনার হাসি। কী স্ক্যামেই না পড়ত, যদি কিছু হয়ে যেত! লোক জানাজানি, পুলিস কেস। কেউ কী বিশ্বাস করত তাকে?

এখন ভালোয় ভালোয় ফেরত গেলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে। ফুর্তি সিকয় উঠেছে। ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। লাখ টাকা ফেরত দিয়ে দেব, তুই ভাল হয়ে বাড়ি চল।

শোভনের পাশে কতক্ষণ বসে ছিল জানে না। হঠাৎ খেয়াল হল দিগ্বিজয়কে জানানো হয়নি। শুনেই দিগ্বিজয় ঠান্ডা গলায় জিজ্ঞেস করল "এখন কেমন আছে?"

"ডাক্তার তো বলল চিন্তার কিছু নেই। হাসপাতালে কয়েকদিন রাখবে। আন্টিল হি ফুললি রিকভারস"

"তুমি ওর সঙ্গে আছ তো?"

"হ্যাঁ। ওকে ছেড়ে কোথায় যাব?"

"আমি তো মিটিং-এ ফেঁসে আছি। মিটিং-এর পর আমি যাব। কী হাসপাতাল বললে?"

"বি আই এম সি হসপিট্যাল, কুটাতে। পেটিঙ্গেট থেকে খুব বেশি দূর নয়"

"মিটিং শেষে চলে আসব। তবে রাত হবে। কোনও ইমারজেন্সি হলে আমাকে অ্যাট ওয়ান্স ফোন করো"

"শিওর"

শোভন ঘুমচ্ছে। কেবিনে তার বেডের পাশে বসে আছে দেওয়ালি। উদাস দৃষ্টিতে একবার শোভনকে দেখছে। কখনো জানলার বাইরে, অপরাহ্নের আলোয়, স্মপাং শিউরের জালান নগুড়া রাই বাইপাসের এই অঞ্চলটাকে। জানলার ফাঁক দিয়ে, দূরে দেখা যাচ্ছে, একফালি নীল জলের আভাস।

নার্স ঘরে ঢুকতেই জিজ্ঞেস করল "ইজ দেয়ার এ লেক নিয়ারবাই?"

"ইটস নট এ লেক, ইটস এ ক্যান্যাল। পুরা কান্ডি নর্মদা"

জল দেখলেই দেওয়ালির মন ভরে যায়। সে পেটিটেঙ্গেট বিচের জলরাশি হোক, চাই পুরা কান্ডি নর্মদা ক্যান্যাল। কোথায় যেন এক স্নিগ্ধতার আমেজ এনে দেয়। সবুজের ফাঁকে নীলের ঝলক যেন একটু বা নতুন ছন্দ। প্রকৃতির ডাক... সেখানেই শান্তি, সেখানেই তৃপ্তি। নিজেকে যেন খুঁজে পায় প্রখর আলো, কোলাহল, স্টারডমের বাইরে। উদাসী মন আশ্রয় খুঁজে পায় সজীব প্রকৃতির রূপ তরঙ্গে। জীবনের সব ঝঞ্ঝাকে উপেক্ষা করে আবার নিজ মহিমায় সাজতে, নতুন ছন্দে, নতুন আবরণে।

মনে নেই, এর আগে কখনো এমনভাবে ঠায় বিছানার কারও পাশে বসে ছিল কি না। ছোটবেলায় একবার ভীষণ জ্বর হয়েছিল। সারারাত ঘুমতে পারেনি। মা ঠায় সারারাত পাশে বসে শুশ্রূষা করেছিল। এই মুহূর্তে দেওয়ালি ভুলে গেছে, সে উজ্জ্বল তারকা। ভুলে গেছে, শোভনের সাত দিনের মিস্ট্রেস। মায়ের সেই মুখটা বারবার ভেসে উঠছে।

দিগ্বিজয়ের কাছে শোভন চেনা সহজ অঙ্কের ক্যাল্কুলেটার। দেওয়ালির কাছে এখন আর নয়। যেন এক অসহায় শিশু মায়ের নরম স্পর্শের জন্য, অচৈতন্য ঘোরে প্রতীক্ষা করছে। অন্তরে দেখতে পাচ্ছে, এক অবলা শিশু তার দিকে হাত বাড়িয়ে রয়েছে - একটু সহায়...

খাওয়া, আনন্দ, ভুলে দেওয়ালির যেন তা পূরণ করাই প্রধান ধর্ম। কেউ দিব্যি দেয়নি। কেউ মুচলেখা লেখায়নি। সেখানেই যেন মনের তৃপ্তি।

অনেক রাতে দিগ্বিজয় এল "এখন কেমন আছে?"

"নার্সরা তো বলল ঠিক আছে"

"উঠেছিল?"

"হ্যাঁ" মাথা নাড়ল দেওয়ালি "কিন্তু ডাক্তার বলেছে চব্বিশ ঘণ্টা পর্যন্ত কিছু খেতে দেবে না"

"থাকতে বলেছে?"

"না"

"তাহলে চল, রিসর্টে ফেরত যাই"

"আপনি যান, আমি এখানেই থাকব। যদি কোনও দরকার লাগে..."

"খাওয়া?"

"ওদের বলে দিয়েছি। ওরা খাওয়া সার্ভ করে দেবে" একটু থেমে, কী ভেবে আবার বলল "কিছু টাকা দিয়ে যাবেন? আমার কাছে কিছুই নেই। যদি কোনও দরকার লাগে..."

দিগ্বিজয় ওর হাতে কিছু ইন্দোনেশিয়া রুপায়া গুঁজে বলল "ও যদি হাসপাতালের বিল দেওয়ার অবস্থায় না থাকে, আমি এসে মিটিয়ে দেব। কখন কত বিল দিতে হবে, জানিয়ে দিও। সারাদিনের ধকলের পর ভীষণ টায়ার্ড লাগছে। আমি রিসর্টে গিয়ে একটু রেস্ট নিই"

মাথা নাড়ল দেওয়ালি। লোকটা নয় তার সঙ্গে ফুর্তি নাই বা করল। অসময়ে একটু তো শুশ্রূষা তো আশা করতে পারে?

ওরা চারদিন পর শোভনকে ছাড়ল। দিগ্বিজয়ের প্রয়োজন হয়নি। শোভন-ই ডেবিট কার্ড দিয়ে বিল মিটিয়ে দিল। এই চারদিনে শোভনকে চোখের আড়াল করেনি দেওয়ালি। সঙ্গে থেকেছে। দিন থেকে রাত। সময় অসময়ে, যখন যা প্রয়োজন হয়েছে এগিয়ে দিয়েছে। টয়েলেটে নিয়ে গেছে। মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছে।

শোভন এই কদিনে দেওয়ালির মাতৃরূপ দেখেছে। মায়ের কথা আবছায়া মনে পড়ে। কিন্তু এর আগে ঝলমলে দুনিয়ার কাউকে পায়নি মায়ের মতো করে। মুখে প্রকাশ না করলেও, মনে মনে লজ্জা পেয়েছে।

ছিঃ...

এই মেয়েকেই ভাড়া করে এনেছিল আনন্দ-ফুর্তির জন্য!

ভাবতেও ঘেন্না লাগছে। মানুষ না হতে পারুক, এখনও অমানুষ হয়নি। তাকে নতুন জীবন দিয়েছে এই মেয়েটা। সে স্টার, না সাধারণ একজন, চার করে লাভ নেই। সে শুধুই এক নারী। যে শুধু আনন্দ দেওয়ার জন্যই নয়, মায়ের রূপ ধারণ করে মাতৃত্ব পালনও করতে পারে। মনে মনে প্রণাম জানিয়েছে, সেই মহীয়সী দেবীকে, যে তাকে মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে এনেছে। শিক্ষা হল, আর কখনো একে নিয়ে ফুর্তির কথা ভাববে না। দিগ্বিজয় বললেও না। ওরা ধান্দা বোঝে। শোভনের তো কোনও ধান্দা নেই। ধান্দা না করেই সে ম্যাগনো ইন্ডিয়ার পার্টনার। সব-ই তো আছে। নেই শুধু একটু মনভরা স্বীকৃতি।

এর আগেও অবন্তী, ইমা, অনেক মেয়েকে নিয়ে ফুর্তি করেছে। কিন্তু এই দেওয়ালি মেয়েটা, ধান্দার বাইরের অন্য দুনিয়ার জীব। কোন প্রদেশের, জানা নেই। শুধু জানে, স্টারডমের বাইরে, এই চারদিনে খুঁজে পাওয়া আরেক অন্য দেওয়ালিকে। যে অন্ধকারে রংমশাল জ্বালিয়ে জরাজীর্ণ, ক্লেদাক্ত, মৃতপ্রায় অস্তিত্বের বুকে প্রাণ সঞ্চার করতে পারে, যে চকিত ক্ষণিকের বিলুপ্তির অন্ধকারে, নতুন প্রাণ দিতে পারে। যার ছত্রছায়ায়, উন্মাদনা ম্লান হয়ে যায় শান্তির দরবারে। যেখানে ফুল ফোটে না, পাপড়ি ঝরে না।

সেখানেই আছে এই দেওয়ালি। মেক-আপ ছাড়া।

তাকে প্রণাম জানিয়ে কলকাতায় ফিরল।

---

[1] তাসমানীয় স্যামনের মাস্কারপন ফ্রেগলা, ব্রেইজড ফেনেল, পিস্তাসিও ডিল লেন সসে। সঙ্গে কোরাল ট্রাউট, চিনির সিরাপে কড়াইশুঁটির সঙ্গে, মাখনে বেকড কুমড়োর সঙ্গে লেবুর ভেলুট। একই প্ল্যাটারে টুনা মাছ, ভেজিটেবল র‍্যাটাটুলি, বেসিল পেস্ত, লেমন ব্যুরে ব্ল্যাংক দিয়ে ম্যারিনেট করা

[2] ইন্দোনেশিয়ান ক্লাসিক্যাল মিউজিকের মতো

[3] হুইস্কি

[4] ভাতের পরিজের সঙ্গে ফালাফালি চিকেন, রোস্টেড নারকেল, আদা আর কচি পেঁয়াজ

বারো

"মৃদুলদা, রিল্যাক্স। উই উইল হেল্প আওয়ারসেল্ভস" মনিকান্ত মোহতা সিঙ্গল মল্টে চুমুক দিয়ে বলল। তবুও ইন্দ্রজিৎ দত্ত তৎপর। অতিথি পরিষেবার যাতে কোনও ত্রুটি না হয়।

শুভ্রজিৎ, গজেন্দ্র ধনির গ্লাসটা রিফিল করে বলল "চিন্তা কর না মৃদুল। আমি ঠিক সময় টপ আপ করে দেব"

দার্জিলিং-এর জলাপাহাড়ে ইন্দ্রজিতের পুরনো বাড়িতে শুক্রবারের সন্ধেয় আসর। কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়াগুলো অন্ধকারের আস্তিনে ঢাকা। অবসারভেটরি হিলের উত্তর দিকে ওয়াইয়ের উত্তরে কাঁটাপাহাড় আর জলাপাহাড় ভাগ হয়ে গেছে। এই দুইয়ের মধ্যে কাঞ্চনজঙ্ঘার শৃঙ্গমালা।

দিনের বেলায় এই উত্তুঙ্গ পর্বতের শৃঙ্গমালার দিকে তাকালে, একটা অনুভূতি জাগে। সুন্দর? না ভয়ঙ্কর সুন্দর? যেন ধ্যানমগ্ন দেবাদিদেব মহাদেব। ধ্যানমগ্ন হয়ত নয়। ধ্যানের ভান করে চোখ বুজে মিটমিট করে হাসছে। নিজেই যেন মজা পাচ্ছে নিজের সৃষ্টির খেলায়। বিশাল পর্বতশৃঙ্গ ধাপে ধাপে উঠে গেছে মেঘের আস্তিন ছাড়িয়ে ঊর্ধ্বে।

মনটা উদাস বাউলের মতো একতারা বাজিয়ে গেয়ে ওঠে 'আয় আয় খেলবি আমার কোলে'। ইন্দ্রজিৎ, মনিকান্ত, গজেন্দ্র বা শুভ্রজিতের সে ডাক শোনার সময় কোথায়? ভাগ্যিস। নইলে কী যে হত? সব ছেড়েছুড়ে, এখানেই পড়ে থাকত।

যদিও ইন্দ্রজিতের ছোটবেলা কেটেছে এখানেই সেন্ট পলস স্কুলে। তখন জীবনটা অন্য রকম ছিল। পাইনের পাতায়, হিমের কুয়াশায় জমে থাকা জল, এক অবিস্মরণীয় জলতরঙ্গের মতো টুপ টুপ করে পড়ছে। সুদূর থেকে ছুটে আসছে মেঘের ঢেউ। চেনা না হয়েও, চেনা। যদি সত্যি অনুভব করত, হয়ত কলকাতার ডামাডোল ছেড়ে, এখানেই পড়ে থাকত। আর তা হয় না। এখন অন্য দুনিয়া। অন্য জীবন। এই মায়াজাল কাটিয়ে একদিন চাকরি নিয়ে চলে গেছিল পাটনায়। এখন শুধু মাঝেমধ্যে লাস্যময়ী তারকাদের নিয়ে নিভৃত তৃপ্তির জন্য ফিরে আসা।

আজ অবশ্য সেরকম কেউ নেই, শুধুই ওরা। সিরিয়াস আলোচনার মধ্যে ফুর্তিবাজ মহিলাদের না জড়ানোই ভাল। ওরা আসে ইন্দ্রজিতের আতিথেয়তার ফ্রি ফয়দা তুলতে। অঢেল খাওয়া, দামি পানীয়। ওর গাড়ি নিয়ে লেবং ছাড়িয়ে টুকভের টি এস্টেটে বেড়াতে, ওরই টাকায় মৌজ করতে।

সেলিব্রিটিদের এটাই এক রোগ। যেখানে কিছু ফ্রি, হাতিয়ে নাও। যেন বুভুক্ষের ঘর থেকে আসে। প্রতি রাতে কোনও একটা পার্টিতে গিয়ে ফ্রি খানাপিনা। পরের দিন পেজ-থ্রিতে ফলাও ছবি। ইন্দ্রজিতের মনে হয়, রোজ এরকম পার্টিতে খেলে, বাড়ির খায় কখন? আর কেউ যদি খাওয়ায়, তাদের যতটা সম্ভব দুইয়ে, সেরাটা তুলে নাও। যেন উপস্থিতি দিয়েই ধন্য করছে।

তারা তো আর যে সে লোক নয়! অন্তরালে ছেলেবৃত্তি করলেও, জনসমক্ষে সেলিব্রিটি। স্ট্যাটাস আছে বৈকি। নইলে কি ফিতে কাটার জন্য এক সময় লোকে কাঁড়িকাঁড়ি টাকা ঢালত? চিট ফান্ডের অস্তাচলে, সে গুড়ে এখন বালি। তাই ইন্দ্রজিৎ বা শোভনের মতো কিছু দিলদরিয়ার মজলিস আলোকিত করে, যা ফাউ

পাওয়া যায়। বিনিময় একটু হাসি। মিষ্টি ভাষায় স্বীকৃতি। প্রয়োজনে বিছানায় সঙ্গী হতেও আপত্তি নেই। স্টারডমের লোভে হরদম দেহ বিক্রি করতে হচ্ছে। বিনিময় যদি কিছু পাওয়া যায়...

অন্যরা তির্যক ভাবে দেখলে বলে "কেন নয়? ওরাই তো খাওয়াতে আগ্রহী। এটাও নেটওয়ার্কিং-এর অঙ্গ"

সাধারণ মানুষের চেয়ে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, যে কত মধু লুকিয়ে আছে, যারা টাকা ঢালে, তারাই বলতে পারে। তাদের স্ট্যাটাস বাড়ে। এদের ফ্রিবি লাফিয়ে লাফিয়ে চাতকের মতো খুঁজে বেড়ায় নতুন শিকার।

আজ অবশ্য যারা এখানে, তারা এদের মতো কেউই কাঙাল নয়। অনেকেই সেলিব্রিটিদের নিয়ামক। সবাই বড় খেলোয়াড়।

মনিকান্ত মোহতা ভেজিটেবল ভল্যুভেন্টে কামড় দিয়ে বলল "তোমার জন্যই আমাদের এই অবস্থা"

"আমি আবার কী করলাম?" ইন্দ্রজিৎ হুইস্কিতে চুমুক দিল।

"এই সব নতুন নতুন ডিরেক্টরদের স্লট দিয়ে দিচ্ছে। ওরা তোমার স্লট পেয়ে ধীরে ধীরে ইন্ডাস্ট্রিতে ঢুকে পড়ছে"

"আমি একা কেন? মাল্টিপ্লেক্স চেইনগুলো তো আমার কথায় চলে না। আমি না দিলেও, ওই চেইনে ওরা ঠিক স্লট করে নেবে"

"মাল্টিপ্লেক্স তো আজকের। বাঙালি কমিউনিটিতে তোমার হলের অনেক বেশি ট্র্যাডিশন। পাবলিসিটিটা অনেক বেশি পায়"

"হলটা তো আজকের নয়, বহুদিনের। আমার বাবার আমলের। বারবারই আমরা কোয়ালিটি বাংলা সিনেমাকে প্রায়রিটি দিয়ে এসেছি। আজ সেই ট্র্যাডিশন ভাঙি কী করে?"

গজেন্দ্র ধনি ওপাশের সোফা থেকে উঠে ইন্দ্রজিতের পাশে বসল। এক পলক শুভ্রজিতের দিকে তাকিয়ে বলল "মৃদুলদা থোরা তো সামঝো। এভাবে যদি কোয়ালিটি সিনেমা বাজার খেয়ে নেয়, আমরা তো পথে বসব। তামিল রিমেক লোকে নিচ্ছে না"

"তো অন্য কিছু কর। মেক গুড মুভিস টু কিপ আপ উইথ দেম"

"নামকরা কোয়ালিটি ডিরেক্টররা তো আমাদের ব্যানারে কাজ করতে চায় না। ইভেন উইথ লুক্রেটিভ অফারস"

"ইউ আর স্ট্যাম্পড অ্যান্ড ব্র্যান্ডেড। গ্রামের মানুষেরাও তোমাদের গিমিক্স বুঝে গেছে। রামোজি আর প্রয়াগ ফিল্ম সিটিতে শুট করে সুইটজারল্যান্ড আর অ্যাফ্রিকার স্বপ্ন দেখালে লোকে নেবে কেন?"

শুভ্রজিৎ আস্তে করে বলল "মৃদুল, পুরোটাই লোকাল সেটসে নয়। আমি কিন্তু সত্যি অ্যাফ্রিকা গিয়েছিলাম"

"গিয়েছিলে কিছু আউটডোর সটস ফিল্ম করতে। বাকি তো এখানে শুট করা। পিপল আর ইনটেলিজেন্ট এনাফ। ইউ ক্যান ব্লাফ সাম পিপল সামটাইম, বাট ইউ কান্ট ব্লাফ অল অফ দেম অল দ্য টাইম"

শুভ্রজিৎ চুপ করে গেল। এত বছরের ফিল্মি জীবনে ছোটবেলা থেকেই সন্তর্পণে সবাইকে সন্তুষ্ট রেখে চলার চেষ্টা করেছে। তাইত এত বছর ধরে হিরোর মুকুটটা আগলে রাখতে পেরেছে। যেমন সি গ্রেড সিনেমার জন্য চামুণ্ডেশ্বরী ফিল্মস-এর প্রয়োজন, তেমনি কোয়ালিটি সিনেমার জন্য অন্যদেরও প্রয়োজন।

স্টারডম আর আধিপত্য ইন্ট্যাক্ট রাখতে গেলে কোয়ালিটি আর নম্বর দুটোই জরুরি। সেই আশির দশকে চামুণ্ডেশ্বরী ফিল্মস কোথায় ছিল?

উত্তমকুমার মারা যাওয়ার পর, তখন বাংলা সিনেমা হাবুডুবু খাচ্ছে। বাবা-মায়ের ডিভোর্সের পর সংসারের বোঝা মাথায়। অথচ কেউ সুযোগ দিচ্ছে না। সংসার চালাতে হবে তো। তাই থিয়েটার থেকে শ্রুতি নাটক। যেখানে যা পাওয়া যায়।

যদিও দুটো ছবি ‘জলাতঙ্ক’ আর ‘আপন ভোলা’ কপালে জুটল, সেভাবে দাগ কাটতে পারেনি। একেই বলে কপাল। হঠাৎই একদিন খুলে গেল। তৃপ্তি পালের প্রোডাকশনে, রথিকান্ত গুহর ‘চিরসঙ্গী’-তে শুধু নায়কের রোলই পেল না, মেজর ব্লকবাস্টার হিট। আর ফিরে তাকাতে হয়নি। রথিকান্ত গুহর বেশিভাগ ছবিতেই শুভ্রজিৎ হিরো।

ইন্দ্রজিৎ বেয়ারাকে ইঙ্গিত করল খাবার সার্ভ করতে “কিছুই তো খাচ্ছ না। কাম অন... প্লিজ...”

“মৃদুলদা ডোন্ট ওয়ারি। উই উইল হেল্প আওয়ারসেল্ভস” গজেন্দ্র চিজ বলস মুখে পুরে বলল “আমাদের জন্য এদের একটু চেপে দাও। প্লিজ...”

ইন্দ্রজিৎ হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে, সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলল “তোমাদের ব্যাবসা উঠে গেলে কিছু যায় আসে না। তোমাদের মেন-স্টে রাখির ব্যাবসা তো ইন্ট্যাক্ট। চামুণ্ডেশ্বরী উঠে গেলেও কিছু যায় আসে না। আমার তো হল আর ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক ছাড়া, অন্য কোনও ব্যাবসা নেই। খাব কী?”

“তোমার আবার খাবার অভাব? ঠাট্টা করছ?”

“একদম নয়। আমি অ্যাম টকিং দ্য ট্রুথ”

“আরে ইয়ার ছোড়। ইয়ে কোই বাত হ্যায়!”

শুভ্রজিৎ টেরেসের এক কোণে বসে শুনছিল। কোনও বক্তব্য নেই। এত বছর, দু নৌকোয় পা দিয়ে খেলেছে। বয়স বাড়ার সঙ্গে চামুণ্ডেশ্বরীর জায়গাটাও শিথিল হয়ে আসছে। হিরোর বয়স তো পার হয়ে গেছে। এক সময়কার চকলেট হিরোর ক্রিম আর নেই। টিকতে গেলে, ক্যারেক্টার রোল করেই টিকতে হবে। চামুণ্ডেশ্বরী আবার এসবের ধার ধারে না। লোককে রঙিন স্বপ্ন দেখাতেই ব্যাস্ত। সেদিকে মৃদুলের গোত্রের লোকেরা চান্স দিতেও পারে।

সমর্পিতা আলাদা হয়ে যাওয়ার পর, যেভাবেই হোক, এখন নিজের প্রোডাকশন কম্প্যানিকে দাঁড় করাতে হবে। আগেও একবার চেষ্টা করেছিল। লাগেনি। তখন অবশ্য স্টারডমের বৃহস্পতি তুঙ্গে নাচছে। তাই গা করেনি। বছরে কুড়িখানা ছবি। বাজার রমরমা। পুষিয়ে নিয়েছে।

এখন তো আর সে রমরমা বাজার নেই। সমর্পিতা সরে যাওয়াতে আরও অসহায়। তনুশ্রীর সঙ্গে বিয়ের পরেই জ্যোতিষ বলেছিল, বিয়ের ঘরে নাকি গণ্ডগোল আছে। সারা জীবনই ভুগতে হবে। দু-দুবার বিয়ে করেও তো টিকল না। এটাও যাওয়ার মুখে। এখন ভালোয় ভালোয় গুছিয়ে নেওয়া ছাড়া, কন্ট্রভারসিতে জড়িয়ে লাভ নেই।

রাতের আকাশটা মধুময়। যেন স্বপ্নের ছবি। দু-এক পেগ পেটে পড়লে ছবিটা আরও রঙিন। একটু ঠান্ডা লাগলেও, রঙিন জলের উত্তাপে বেশ আরামদায়ক। হঠাৎ সামনের পাইন গাছটার মাথায় একটা বড় পাখি এসে বসল।

"প্যাঁচা" ইন্দ্রজিৎ পানীয়তে লম্বা চুমুক দিয়ে অবাক।

মনিকান্ত একটু জড়ানো গলায় বলল "কী করে বুঝলে? তুমি কী অরিন্থলজিস্ট নাকি?"

ইন্দ্রজিৎ হো হো করে হেসে উঠল "ছোটবেলা থেকে শিকার করছি। পাখি, জন্তু জানোয়ারের আওয়াজ শুনলেই বুঝতে পারি। ডানার আওয়াজেই বোঝা যায়"

"ডানার আওয়াজ শুনেই বুঝে গেলে ওটা প্যাঁচা? যাঃ বাওয়া! এ তো দেখছি স্বয়ং সেলিম আলি এলেন" খিক করে হাসল। হাতের গ্লাসে লম্বা চুমুক দিয়ে বলল "ওটা বাজপাখি"

ইন্দ্রিজিৎ বিরক্ত হয়ে বলল "তুমি কী সেলিম আলি নাকি?"

গজেন্দ্র চুপ করে দূরের পাহাড়ের দিকে তাকিয়েছিল। বিরক্ত গলায় না ফিরেই বলল, "আঃ, চুপ করবে? কোথায় পাহাড়ের সন্ধে দেখবে, না প্যাঁচা নিয়ে চ্যাঁচানি"

মনিকান্ত জড়ানো গলায় বলল "সন্ধে নামা? মৃদুলদা তুমি তো দেখছি বিভূতিভূষণ হয়ে গেলে। এবার কি একখানা পাহাড়ের পাঁচালি বেরোবে নাকি? নেক্সট একটা পাহাড়ের পাঁচালি নামিয়ে ফেলা যাক। বাজারে তো কিছুই খাচ্ছে না। এটা যদি লেগে যায় সত্যজিৎ রায়ের আশীর্বাদে"

শুভ্রজিৎ এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল। আস্তে বলল, "গজেন্দ্র তো ঠিকই বলেছে। ফালতু কথা না বলে, চুপচাপ দেখ না সন্ধেটা। কলকাতায় ফিরলে তো আর দেখা যাবে না"

সমর্পিতা চলে যাওয়ায় এমনিতেই উদাসীন। বাজে কথায় না জড়িয়ে নিঃশব্দে হুইস্কিটা উপভোগ করতে চাইছে। মনিকান্ত কিছু বলতে যাচ্ছিল, থেমে গেল। সবাই চুপ, সামনে তাকিয়ে।

বাগানের গেট যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে সরু রাস্তাটার ওপারে একঝাঁক প্রাচীন পাইনগাছ। দৃঢ় ঋজুভঙ্গিতে গাছগুলো সোজা একশো ফুটের কাছাকাছি উপরে উঠে গেছে। ঝাঁকড়া মাথাগুলো যেন আকাশ ছুঁতে চাইছে। আশ্চর্য রঙে ভরে উঠেছে ওপরটা। সূর্যাস্তের পর অজস্র তারা মিটমিট জ্বলছে। সেই আলোয়, একটা নাম-না-দেওয়া রঙে ভরে রয়েছে আকাশ। ঠিক কালো নয়, ধুসরও নয়, কালচে নীলাভ একটা আশ্চর্য রং। বর্ণনাতীত আঁধার রঙে ঢেকে গেছে চরাচর। নীচে শহরের আলো ঝিকমিক করছে। মাঝে মাঝে কুয়াশার চাদর জড়িয়ে নিচ্ছে সন্ধ্যা। চারপাশে ঝিঁঝির ডাক আর পাইনপাতার মধ্যে বয়ে যাওয়া বাতাসের ফিসফিস। সব ছাপিয়ে দিগন্তবিস্তৃত দেবতাত্মা হিমালয় অটল গাম্ভীর্যে, নির্নিমেষ তাকিয়ে উত্তুঙ্গ পাহাড়ের বুকে শহররূপ অহমিকার দিকে।

মৃদুল হঠাৎ বলে উঠল "মনিকান্ত একটু বেশি গিলে ফেলেছ বস। আমার চেয়ারটায় ধাক্কা দিচ্ছ কেন?"

অতীতের স্বপ্নে মশগুল শুভ্রজিৎ চোখ বুজে দ্য সঙ অফ লোনলি মাউন্টেন হাম করছিল। চোখ খুলে বলল, "মৃদুল তো ঠিকই বলছে। মনিকান্ত গো স্লো বস। বেশি খেয়ে ফেলেছ। আমার চেয়ারটা ধরেও তো নাড়লে"

মনিকান্ত জড়ানো স্বরে বলল "বাত কেয়া? সবাই আমার দিকে আঙুল তুলছ কেন? বাঙ্গালিতে বলে না, যত দোষ নন্দ ঘোষ। হম কিসকো ঢকেলা? মাস্ট বি ওয়ান অফ ইউ। আমাকে ধাক্কা দিয়েছ। আমার চেয়ারটা নড়ে উঠল কেন?" চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে ধপ করে পড়ে গেল।

"শালে কৌন কিসকো ঢকেলতা? হম ভি তো গির গয়া"

গজেন্দ্র এতক্ষণ চুপ করে ছিল। উঠে চিৎকার করে উঠল “ভূমিকম্প! ভূমিকম্প হচ্ছে!” বলতে না বলতেই, সজোরে পায়ের তলার মাটিটা দুলে উঠল।

চারজনেই উঠে দাঁড়িয়েছে। মনিকান্তর নেশা ছুটে গেছে, ভয় কাঁপছে। কেঁদে উঠল “মর জায়েগা। সব মর জায়েগা। হিমালয়জি, মাফ কর দেনা হম সবকো। ঔর কভি ইতনা দারু নেহি পিয়েগা”

হঠাৎ যেন দুম করে প্রকৃতির ঘুম ভেঙে গেছে। চারপাশে হঠাৎ কোলাহল। পাইন গাছগুলোর মাথায় পাখিরা তারস্বরে কিচিরমিচির শুরু করেছে। দূর থেকে ভেসে আসছে মানুষের চিৎকার। শাঁখের আওয়াজ। মহাকাল মন্দির থেকে ভেসে আসছে ঘন্টার শব্দ, মিশে যাচ্ছে চার্চের ঘন্টার আওয়াজ।

চারজনে হতভম্ব, দাঁড়িয়ে ভয় কাঁপছে। আবার হঠাৎ ভীষণ জোরে মাটি দুলে উঠল। এতই জোরে, শুভ্রজিৎ ছাড়া বাকি তিনজনই পড়ে গেল। পাহাড়, উতরাইতে নেচে গেয়ে শুটিং করার অভ্যাসে পায়ের গ্রিপ অনেক বেশি স্ট্রং। দূরে পাহাড়ের অন্দরমহল থেকে হাড় হিম করা গুড়গুড় শব্দ আসছে। আগে কখনো শোনেনি। লো পিচের ভৌতিক শব্দ। গিলতে আসছে।

মনিকান্ত চিৎকার করে উঠল, “জয় মা বজরংবলি, হমে রকসা করে”

পায়ের তলায় দুলুনিটা থামছেই না। হঠাৎ একটা প্রচণ্ড কান ফাটানো আওয়াজ। চোখের সামনে পাহাড়টা ধসে পড়ল। পাইনগাছগুলোকে কে বা কারা, দলে মুচড়ে টেনেহিঁচড়ে, নীচে নামিয়ে নিয়ে গেল। পুরো জায়েগাটাই নিরেট অন্ধকার। পাহাড়ের কোলে যে আলোগুলো এতক্ষণ হীরের কুচির মতো ঝলমল করছিল, সেগুলো উধাও। চারদিক থেকে ভেসে আসছে মানুষের আর্তনাদ। মিশে যাচ্ছে পাখিদের চিৎকারে।

তারই মধ্যে শুভ্রজিতের গলাটা গমগমিয়ে উঠলঃ

‘প্রলয় নাচন নাচলে যখন হে নটরাজ, হে নটরাজ...

জটার বাঁধন পড়ল খুলে...’

প্রকৃতি যেন তাদের হিসেবের সব অঙ্ক মিলিয়ে দিচ্ছে প্রলয় নাচনে। মৃদুলের জলাপাহাড়ের বাংলোয়। বাংলার বুকে রাজত্ব করা টিন্সেলের কাণ্ডারিরা ভয়ে নির্বাক। মৃত্যুর মুখোমুখি। এতক্ষণের সব হিসেব ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে প্রকৃতির ফুর্তিতে।

ইষ্টদেবতার কাছে আর পাঁচজনের মতোই প্রাণভিক্ষা চাইছে অসহায় ভাবে।

তেরো

“রাতে প্রদীপ গোয়েঙ্কা মনি স্কয়ারের ফ্ল্যাটে ডেকেছে। যেতে পারবে?” অনিন্দ্য শীলের ফোনে চমকে উঠল অবন্তী।

স্টুডিও পাড়ায় শিল্পী-কাম-ডিরেক্টর অনিন্দ্য সুবিধাবাদী বলেই পরিচিত। সে আবার ফোন করছে কেন? খুব বেশি কিছু জানা নেই অনিন্দ্য সম্বন্ধে। পার্শ্ব চরিত্রে অভিনয় করে। হালে গোটা দুয়েক ছবি করেছে। যে ধরনের ছবির সঙ্গে যুক্ত, সেখানে অবশ্য অবন্তীর ঠাই নেই, যদিও ‘সাদা হাঁস’ ছবিতে একসঙ্গে কাজ করেছিল। ব্যাস। ওই পর্যন্তই।

ফিল্মি পার্টিতে দেখা হয়েছে বটে, তবে চেনা মুখের একটুকরো হাসি ছাড়া বিশেষ কোনও কথাই হয়নি। সব সময়ই আঁতেলদের সঙ্গে ঘোরাফেরা। তারা আবার অবন্তীকে বিশেষ পাত্তা দেয় না।

কিছুটা অবাক হল বটে। কেনই বা প্রদীপ গোয়েঙ্কা ওকে দিয়ে ফোন করাবে, বুঝতে পারছে না। হাতে তেমন ছবিও নেই। ভবিষ্যতের আশাও ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। নাচা-গানার সিনেমাগুলো আর বাজারে খাচ্ছে না। ওখানেই তো ওর আধিপত্য। বয়সও বাড়ছে। তার আগেই গুছিয়ে নিতে হবে। দেখাই যাক, ভাগ্য ঝুলিতে নতুন কিছু উপহার দেয় কি না।

“ফ্রি আছি। কোথায়, কখন যেতে হবে?”

“আমি টেক্সট করে দিচ্ছি। সাড়ে-সাতটা থেকে আটটার মধ্যে পৌঁছে যেও” অনিন্দ্য ফোন নামিয়ে রাখল।

বাংলা ছবির মন্দার বাজারে যে যেভাবে পারছে, কামিয়ে নিচ্ছে। কেউ পলিটিক্সে, কেউ বা জ্যোতিষের অ্যাডে। আগে জানত না। এখন বুঝতে পারছে, অনিন্দ্যও মেয়েছেলের দালালি করে টাকা রোজগারের ধান্দায় লেগেছে। ওদের তো শুয়ে পড়ার কোনও স্কোপ নেই। তাই অন্যদের পা ফাঁক করিয়ে কামিয়ে নাও।

অথচ ক’বছর আগেও এমন শোচনীয় দশা ছিল না। বাংলা সিনেমা শহরে না হলেও মফসসলে চলত। চাকতিটা যে হঠাৎ ঘুরে যাবে, অনেকেই বুঝতেই পারেনি। মুখে না বললেও আজ দুষছে ধনিদের। বাড়াবাড়ি না করে একটু ভদ্রস্থ সিনেমা করলে তো অবন্তীর মতো মেয়েরা খেয়েপরে বাঁচতে পারত। অভিনয়টা একটুআধটু জানে। ভাল ছবি করলে নিজের ইমেজ পালটে ফিট হয়ে যেতে পারত। এভাবে অন্তত বেঁচে থাকতে হত না।

কী আর করা যাবে! এখানেই লাক ট্রাই...

ঠিক পৌনে আটটা।

মনি স্কয়ারের সিকিউরিটি টপকে আঠারো তলার লিফট থেকে বেরতেই দেখল, প্রদীপ নিজেই দরজা খুলে অপেক্ষা করছে।

“এস” স্পষ্ট বাংলায় বলল।

সিম্পলের ওপর দারুণ সেজেছে। লাল লহেঙ্গা-চলিতে দেহের আগুন ফুটছে। ঠিকমত কাজে লাগাতে পারলে যদি একটা ফ্ল্যাট হাতিয়ে নেওয়া যায়। প্রদীপের মতো ক্ষমতাবান...

চটিটা দরজার ওপারে খুলে বিশাল লাউঞ্জে ঢুকল। দেওয়াল জুড়ে বিভিন্ন দেশের আর্ট কলেকশান। এক কোণায় বিশাল এইচ ডি টিভি। ওয়াল ক্যাবিনেট, নানান দেশের কিউরিওতে ভরা। সেন্টার টেবিলের চারপাশ ঘিরে সাদা লেদারের সোফা। সাদা সোফার ওপর লহেঙ্গা-চলির লাল পলাশের মতো জ্বলজ্বল করছে।

"কী খাবে?"

"আপনি যা দেবেন"

"হুইস্কি খাও তো?"

"খাই। তবে ভডকাই প্রেফার করি। হুইস্কি বড্ড বেশি স্ট্রং"

একবার হুইস্কি খেয়ে বেসামাল হয়ে উলটে পড়েছিল। তারপর থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকে। এখানে বেসামাল হলে প্রদীপকে খুশি করতে পারবে না। সাবধানতাই ভাল।

"কী দিয়ে?"

"ম্যাঙ্গ জুস। আছে?"

"শিওর"

"আপনি কষ্ট করবেন না। কোথায় আছে বলুন, নিয়ে নিচ্ছি"

স্বনামধন্য শিল্পপতি তার জন্য ড্রিঙ্ক সার্ভ করবে, ভাবতেই কেমন কুণ্ঠা লাগছে। যার এক ইশারায় একশোটা বেয়ারা সর্বদা প্রস্তুত। অবন্তী সোফা ছেড়ে প্রদীপের পেছন পেছন এগোল। অন্য সময় হয়ত অনেক কাজের লোক থাকে, কিন্তু এই অভিসারের রাতের সাক্ষী রাখতে চায় না।

লাল লহেঙ্গা-চলির ছন্দে মনে হয়, ডল পুতুল ফ্ল্যাটের শোভা বাড়িয়ে দিয়েছে। যেমন বিয়ের পর মনে করত সঞ্জীব।

সেই চপলা ছন্দ। গজদন্তের মিষ্টি হাসির আনন্দ। নূপুর ছাড়া মাদক ঝংকারে। স্বপ্নমাখা কল্পনার কলেবরে। চপলা নারীর চকিত চাওয়া। আজকের দিনে, সেটুকুই পাওয়া।

তফাত শুধু একটু। সেদিন সে ছিল গৃহবধূ নারী। আজ রূপের পশরা নিয়ে অভিসারিণী। যা এতদিন ছিল পদ্মপর্ণাদির এক্তিয়ার। এখন সেই রথে সে সওয়ার। পদ্মপর্ণাদি কী ফায়দা লুটেছে, জানা নেই। সুযোগ যখন পেয়েছে, তাকে উসুল করে নিতে হবে।

ভডকায় জুস মেশাতে গিয়ে বলল "আপনি?"

"সিঙ্গল মল্ট অন দ্য রক্স" সোফায় বসে বলল "মেক ইওরসেলফ অ্যাট হোম"

"জরুর"

আহাঃ...

ছোটবেলায় যদি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ার সুযোগ পেত। সেও রাজীবের মতো ইংরেজি বলতে পারত। কৃষ্ণনগরের মধ্যবিত্ত পরিবারে সে সুযোগ কোথায়? কষ্ট চেপে ভডাকায় চুমুক দিয়ে বলল "আপ কা মেহেরবানি আপ নে মুঝে ইয়াদ কিয়া"

"মেহেরবানি কা কোই বাত হি নেহি। তুমহে মু মাঙ্গে কিমত মিল জায়গা। তুম ঔর ম্যায় ছোড়কে সিরিফ অনিন্দ্যকো ইয়ে বাত মালুম হ্যাঁয়। দুসরা কোই না জানে"

প্রতিশ্রুতিতে মন নেচে উঠল। মু মাঙ্গে মানে কী গোটা একটা ফ্ল্যাট? প্রমটারদের কাছে তো সেটা জলভাত। এক রাতের জন্য নাও দিতে পারে। চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কী? অনেক প্রডিউসার, ডিরেক্টরদের সঙ্গে শুয়েছে। অত চিন্তা ভাবনা করেনি। কিন্তু রাজীবের মতো সম্ভ্রান্ত লোকের সামনে সন্তর্পণে বসা, কথা বলা। এরা অন্য ক্লাস, কাঁচা টাকার উটকো প্রডিউসার নয়। মনে মনে সংশয়। মুখে চপল মিষ্টি হাসি।

গ্লাস থেকে মুখ তুলে ভালভাবে অবন্তীকে পরখ করল। পুতুলের মতো চেহারা। যেমন রঙিন পর্দায় দেখা যায়। তবে সিনেমার অতিরিক্ত মেক-আপ ছাড়া রংটা একটু শ্যামলার দিকে। লাল আভরণ যেন শ্যামলা অবয়বকে আরও উজ্জ্বল, আরও প্রাণবন্ত করে তুলেছে। লো-কাট চলির অন্তরালে সুডৌল স্তন দেখা না গেলেও, তার ভরাট মাধুর্য বুঝতে অসুবিধা হয় না।

পদ্মপর্ণা বুড়ো হয়ে গেছে। কতদিন আর ভাল লাগে? প্রথম প্রথম যখন পদ্মপর্ণা আসত সি ওয়াজ স্মার্ট, ইয়ং অ্যান্ড অ্যাট্রাক্টিভ। এখন সব কিছু ঝুলে পড়েছে। মোটা মোটা থাই। ওজনও বেড়ে গেছে। সি ইজ নো লঙ্গার অ্যাট্রাক্টিভ। আফটার অল, ভ্যরাইটি ইজ দ্য স্পাইস অফ লাইফ।

"ইউ হ্যাভ এ ফ্লুয়েন্ট ইংলিশ অ্যাক্সেন্ট"

"আই অ্যাম ফ্রম কারমেল কনভেন্ট" পদ্মপর্ণা জবাব দিয়েছিল।

সেই কারমেলের দিনগুলো যেন তার জীবনের বড় পাথেয়। শুধু শিক্ষার দিক থেকে নয়, প্রথম প্রেমের মনমাতানো নতুন ছন্দে। তখন আর কতই বয়স। চোদ্দ কি পনেরো হবে। পদ্মপর্ণাদের 'চিত্র' নামে পাড়ার আর্ট স্কুল থেকে এক্সকারশনের সময় দার্জিলিঙের এক তরুণ গ্রুপের সঙ্গে পরিচয়। ওদের মধ্যে একটি ছেলে বেশ হ্যান্ডসাম। কিশোরী পদ্মপর্ণার চোখ বারবার আড় চোখে ওই ছেলেটিকে দেখছে।

"কোত্থেকে এসেছ তোমরা?" ওদের মধ্যে থেকে একজন ভাব জমাবার আছিলায় মেয়েদের দলের দিকে এগিয়ে এল।

"লেক গার্ডেনস" বোধহয় পদ্মপর্ণাই উত্তর দিয়েছিল।

"এখানে কেন?"

"আমরা আর্ট স্কুল থেকে এক্সকারশনে এসেছি। হিমালয়ের ছবি আঁকতে" ফ্রক পরা পদ্মপর্ণা গম্ভীরভাবে বলল।

"কী আঁকলে?"

"এখনও আঁকা হয়নি। আগে দেখে নিই কোন অ্যাঙ্গেল থেকে আঁকলে বেস্ট ভিউ পাওয়া যাবে" একেবারে পাকা আর্টিস্টের মতো বলল।

"আহা রে! কত বড় আর্টিস্ট। অ্যাঙ্গেল খুঁজছে" ছেলেটির কথায় শ্লেষ।

"কেন? আর্টিস্ট ছাড়া অ্যাঙ্গেল দেখা যায় না? ছবি বা ফটোগ্রাফির জন্য চোখটাই আসল"

"তোমার চোখ হিমালয় খুঁজে বেড়াক। আমি তোমার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকি"

কী বেহায়া রে বাবা। লজ্জায় মুখ লাল হতে তাড়াতাড়ি ওখান থেকে সরে পড়েছিল। ভবিতব্য মাঝে মধ্যে অচেনাকে কাছকাছি এনে দেয়। সন্ধেবেলা ম্যালে চক্কর খেতে এসে আবার ওই গ্রুপের সামনাসামনি। পদ্মপর্ণা পালচ্ছিল, পাছে ওই ডেঁপো ছেলেটা আবার কিছু বলে দেয়। নির্জনতার জন্য সন্তর্পণে উইন্ডামেয়ারের পাশের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে শুরু করল।

বেশ ঠান্ডা লাগছে। যদিও গায় ভাড়ি সোয়েটার। হিমেল হাওয়ার স্পর্শ হাতে-মুখে। সে যাক। চাঁদনি রাতে অন্ধকারের আবেশে দূরের শৃঙ্গমালা এক মোহময় আবেশ ছড়াচ্ছে। রেলিং-এর ওপর হেলান দিয়ে স্বপ্নের জগতে হারিয়ে গেছিল। কত স্বপ্ন। স্কুল থেকে কলেজ হয়ে ইউনিভার্সিটি। বাবা চায় আই এ এস হোক। আরও ভাল পড়াশোনা করতে হবে।

"এপাশে একা?" চমকে ফিরে তাকাল পুরুষ কণ্ঠে।

সেই ডেঁপো ছেলেটা। এখানেও ফলো করে চলে এসেছে। মনে মনে রোমাঞ্চ অনুভব করলেও, মুখে শঙ্কা। আগে এভাবে কোনও ছেলের সঙ্গে একলা নির্জনে থাকেনি। ওকে ফলো করে, এখানে চলে এসছে।

সরে পড়ার অছিলা বুঝতে পেরেই ছেলেটি বলল "আমিও লেক গার্ডেনসে থাকি। মৃত্যুঞ্জয়, মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী। যাচ্ছ কোথায়?"

"যাই... ওদের না জানিয়ে চলে এসেছি। গীতাদি একটু পরেই খুঁজতে লোক পাঠিয়ে দেবে"

"একটু দাঁড়াও না..."

দাঁড়াতে তো পদ্মপর্ণারও ইচ্ছে করছিল। কিন্তু ওকে না পেয়ে যদি শোরগোল শুরু হয়ে যায়। গীতাদি আসার সময় বলেই দিয়েছিল কেউ কিন্তু দল ছাড়া হবে না। বুকটা কাঁপছে। দুরু দুরু। ভয় ভালোলাগার কোলাজ। এক অদ্ভুত অনুভূতি, এর আগে তো কখনো হয়েনি।

"রাগ ভূপতি নাথ"

"অ্যাঁ!" চমকে উঠল।

কোন নাথ? কোথাকার নাথ? কার নাথ? চক্রবর্তীর মধ্যে নাথ কোত্থেকে এল?

"রাগ ভূপতি নাথ" মৃত্যুঞ্জয় আবার বলল।

"সেটা কী?"

"ইভিনিং রাগ" পদ্মপর্ণার দিকে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বলল "এই মুনলিট ইভিনিং-এ স্ট্যান্ডিং অন দ্য ভারজ অফ নেচার ইউ ক্যান ওনলি থিংক অফ রাগাস। নাথিং এলস"

"তুমি রাগ বোঝ?"

"আলবাত। আমি সরোদ শিখি"

স্থান হয়ত উপলক্ষ মাত্র। কাল যেন সেই মুহূর্তে থেমে গেছে ভালবাসার আঁতুড়ঘরে। যেখেনে কথা হারিয়ে যায়। যেখানে নিঃশব্দ মৌনতার অনুভূতিতে মন আচ্ছন্ন হয়ে যায়। প্রথম কাউকে ভালোলাগা। প্রথম কাউকে নিভৃতে কাছে পাওয়া। অচেনা অনুভূতি স্পন্দন তুলছে দুজনের হৃদয়ে। কাঁপা কাঁপা বুকে। মুহূর্তের পাওয়া পরম সুখে। ভয় মেশানো ভালোলাগায় মন হারিয়ে গেছে, ওই দূর পাহারের স্বপ্নের দেশে।

অন্ধ আবেগে পদ্মপর্ণাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল। সারা দেহে বিদ্যুতের তরঙ্গ ছড়িয়ে গেল। বুঝতে পারেনি পদ্মপর্ণা, নতুন স্বাদের আস্বাদ। লজ্জায় কুঁকড়ে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে পালাতে চাইলেও, অন্তর সায় দিল না। গভীর আবেগে জড়িয়ে ধরল।

ঘোরে কতক্ষণ ডুবে ছিল জানে না। হঠাৎ খেয়াল হল দেরি হয়ে গেছে। ফিরতে হবে। নইলে গীতাদি রেস্কিউ টিম নিয়ে বেরিয়ে পড়বে।

"ছাড়... যাই..."

“তোমার পাড়ায় থাকি। ক্লাস টেনে পড়ি” বলে টাকার নোটের ওপর খসখস করে নিজের নাম, টেলিফোন, ঠিকানা লিখে দিল মৃত্যুঞ্জয়।

“ফোন করবে তো?”

ব্লাউজের মধ্যে দশ টাকার নোটটা গুঁজে, কোনও উত্তর না দিয়ে হনহনিয়ে ছুটে পালাল পদ্মপর্ণা। পরে কতদিন একসঙ্গে কেটেছে। পড়াশোনা, আর্ট, নাচ, সংগীত, লম্বা লম্বা প্রেমপত্র। সময় বিহীন টেলিফোন। যতক্ষণ না মা এসে ধমক দিয়েছে “তোদের দেখি আর কথা শেষ হয় না। এবার ছাড়বি, না আমি সারারাত খাওয়া নিয়ে বসে থাকব।

মৃত্যুঞ্জয়ের সরোদ ক্লাসে রেওয়াজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা। পদ্মপর্ণার নাচের ক্লাস শেষ না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যুঞ্জয়ের প্রতীক্ষা। একজন অন্যের পরিপূরক।

মৃত্যুঞ্জয়ের অ্যামেরিকা চলে যাওয়ার পর স্টারডমের আরেক জগৎ। বিচ্ছেদর মধ্যে সময়ের ব্যাপ্তি, কত কিছুই না পাল্টে গেল। সেখানে টলিউড, বলিউডের প্রডিউসার ডিরেক্টার আছে। আছে বাংলাদেশের হ্যান্ডসাম হিরো। আছে রাজীবের মতো গণ্যমান্য। এদের প্রত্যাখ্যান করলে সে কী রুপালি পর্দার কিংবদন্তি হয়ে থাকতে পারবে?

‘আই অ্যাম ফ্রম কারমেল কনভেন্ট’ কথাটা যতই সদর্পে বলুক না কেন, হারিয়ে যাওয়া নিষ্কলুষ দিনগুলোর স্মৃতি যেন বুকের গভীরে আজও মোচড় দেয়। ফেলে আসা ছোটবেলা আর আজকের এই খ্যাতির শিখরের মাঝে অনেক কাহিনি।

“ড্রিঙ্কস?”

সেদিন পদ্মপর্ণা চোস্ত ইংরেজিতে বলেছিল ‘থ্যঙ্কস’। আর আজ অবন্তীর গালে টোল পড়ল ‘ধন্যবাদ’।

রাত গাঢ় হওয়ার সঙ্গে নেশাও জমে উঠছে। যত জমছে, অবন্তীকে নিবিড় করে পাওয়ার কামনাও ঠিকরে বেরতে চাইছে। জড়িয়ে ধরে একটু আদর। বুকেপিঠে সন্ধানী হাতের ঘোরাফেরা। দু-টুকরো নরম মাংসপিণ্ডের মধ্যে যে এত আকর্ষণ লুকিয়ে আছে, হুইস্কির প্রলেপ না পড়লে বোঝাই শক্ত।

“কুছ খা লে। চাইনিজ লায়া হু”

“জো আপ চাহে। আপ আরাম সে পিয়ে। ইয়ে হামলোগ, লড়কিও কে কাম হ্যাঁয়”

গৃহবধূ তারকা এখন অন্য রূপে। অবন্তী কিচেনে হারিয়ে যাওয়ার আগে, রাজীব লেহাঙ্গার অন্তরালে ভরাট নিতম্বের ছন্দের দিকে তাকিয়ে রইল। কারও সঙ্গে অনেক বিষয় আলোচনা করা যায়, যেমন পদ্মপর্ণা। কারও সঙ্গে আলোচনা বাদে শুধু দেহটাই উপভোগ করা যায়, যেমন অবন্তী।

নাতিউজ্জ্বল বেডসাইড ল্যাম্পের আলো ঘরে এক মোহময় আবেশ ছড়িয়েছে। রুম ফ্রেসনারের সৌরভে ম ম করছে এসি ঘরের হাওয়া। প্রাণ ভরে ঘ্রাণ নিল অবন্তী।

আহাঃ...

এমন বড় যদি একটা ফ্ল্যাট পাওয়া যেত! ৩০০০ স্কোয়ার ফিট হবে। কোটি টাকার ওপর দাম তো নিশ্চয়ই। খাটের ওপর পাজামা চুড়িদার পরে শুয়ে আছে রাজীব। চলি থেকে লেহেঙ্গা খসিয়ে সন্তর্পণে গুছিয়ে রাখছে, ড্রেসিং টেবিলের স্টুল-এর ওপর। মেক-আপ শূন্য, গোলাপি ব্রা আর প্যানটিতে, শ্যামলা

অবয়বটা বেড ল্যাম্পের আলো-আঁধারির লুকোচুরি খেলায় আরও বেশি মোহময়। ধীরে ধীরে বে-আব্রু হচ্ছে অবন্তী। না কি বাংলা স্টারডমের প্রাকৃত রূপ বাহ্যিক পরিচয়ের খোলস ছাড়ছে! গ্ল্যামার হারিয়ে গেছে। মিডিয়া বাইটস-এর প্রখর আলো মুছে গেছে। স্বপ্ন-লোভ-আকাঙ্ক্ষা মিলেমিশে একাকার নতজানু আদিম রিপুর কাছে।

লো-কাট ব্রায়ের ওপর থেকে উপচিয়ে পড়ছে অবন্তীর সুপুষ্ট স্তনযুগল। নাথিং ইজ ফ্রি ইন দিস ওয়ার্ল্ড।

"একটু ফ্রেস হয়ে আসছি" বাথরুমে হারিয়ে গেল অবন্তী।

রাজীব অবন্তীর বিবস্ত্র দেহ নিয়ে খেলছে, স্তন থেকে উরুতে। নাভির ওপর আঁকিবুঁকি কাটছে। এক সময় গাঢ় শ্বাস, দেহের ছন্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গাঢ়তর হচ্ছে "আহঃ..."

ক্লাইম্যাক্সে পৌছনোর আগেই কাতরে উঠল রাজীব। অবন্তী স্তম্ভিত। সম্ভোগের অন্তিম মার্গে এর আগে কাউকে লুটিয়ে পড়তে দেখেনি। কিছুক্ষণ আগের ঘনঘন শ্বাস-প্রশ্বাস কঠিনতর। ঘামছে। দম বন্ধ হয়ে আসার জোগাড়। কয়েকবার 'ওয়াক ওয়াক' করলেও বমি হল না। বুকটা চেপে আঁকড়ে আছে।

"ডক্টর... আই নিড এ ডক্টর" রাজীবের কথায় অবন্তী বুঝতে পারছে সিরিয়াস কিছু হয়েছে। ঠিক কী? ঠাহর করতে পারছে না।

কোনওরকমে বিছনার পাশে লোটানো চুড়িদার-পাঞ্জাবিটা গলাল। নিজে তাড়াতাড়ি জামা পরে ওয়ারড্রব হাতড়াচ্ছে। কিছু খুঁজছে। শেষমেশ এক কোণায় খুঁজে পেল চাদর। রাজীবকে ধরে সন্তর্পণে লিফট থেকে গাড়িতে।

"বাবুকা তবিয়াত অচানক খারাপ হুয়া। হাসপাতাল লেনে পড়েগা। নজদিক মে কউন হাসপাতাল?" গাড়ির দিকে এগোতে সিকিউরিটিকে প্রশ্ন।

"অ্যাপলো। কুছ কর সকু?" সিকিউরিটি রাজীবকে ধরে নিয়ে চলল।

"থোড়া গাড়ি মে লেট দে না। ম্যয় ড্রাইভ কর কর লে যা রহা হু। ফ্ল্যাট খুলা হ্যায়। সামহাল কর রখ না"

"জরুর। ম্যয় একেলা, নেহি তো ম্যয় ভি যা সকতা"

"জরুরত নেহি" অবন্তী গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল।

অ্যাপলোর ইমারজেন্সিতে সর্ট হিস্ট্রি নেওয়ার পর, ডাক্তার ড্রিপ, ইনজেকশন, কার্ডিয়াক মনিটার লাগিয়ে বলল "মাইল্ড হার্ট অ্যাটাক। রাজীব গোয়াঙ্কা না?"

মাথা নাড়ল অবন্তী। কে না চেনে রাজীব গোয়াঙ্কাকে? আর কে না চেনে অবন্তীকে? দুজনের মধ্য রাতের আসল কাহিনি জানলে, মিডিয়াতে না পৌঁছলেও, ডাক্তার নার্সদের কানাঘুষোয় সব মহলে নিশ্চিত পৌঁছে যাবে।

অবন্তীর চোখ ছাড়া পুরো মুখ ওয়ারড্রব থেকে আনা চাদরে ঢাকা। জানতই মাঝরাত অতিক্রম করলেও ডাক্তার, নার্সদের ফেস করতে হবে। ভাগ্যিস বুদ্ধি করে এনেছিল। রাস্তায়ও কোনও অঘটন ঘটেনি। না হলে, শুধু কেরিয়ারেই সর্বনাশ নয়, জবাব দিতে দিতে, বাকি জীবনটাই নষ্ট হয়ে যেত।

"ওনার বাড়িতে কাম করি। বাবু ব্যথায় কাতরাইতে সময় নষ্ট না কইরাই নিয়া আইলাম। বাড়ির লোকরে এখনও খবর দেওয়ার সময় পাই নাই"

প্রচুর ছবিতে ঝি-এর রোল করেছে। সেই ভাষা দক্ষতার সঙ্গে প্রয়োগ করে রিয়ালিটিতে আবার ঝি-এর রোল। এবার নিজেকে বাঁচাতে, রাজীবকে বাঁচাতে। মুখটা চাদরে ঢাকা। যদি ঘুণাক্ষরেও কেউ চিনতে পারে ঢিঢি পড়ে যাবে। কালকে মিডিয়া হেডলাইন্স। চ্যানেলে চ্যানেলে সারাদিন চর্বিত চর্বণ। মশলা মাখানো চনমনে খবর। পুরো কলকাতা ভেঙে পড়বে বাড়িতে। মোবাইল বন্ধ করেও বাঁচতে পারবে না। নাম যত তাড়াতাড়ি ছড়ায়, বদনাম তার থেকে দ্বিগুণ।

"ইমিডিয়েটলি ভরতি করতে হবে"

"যা বোঝেন করুন। বাবুরে সুস্থ কইরা তুলতে হইব। ওনার ঠিকানা তো আপনাগো জানা"

"যদিও ভর্তি হওয়ার আগে ডিপসিট দিতে হয়, ওনার ব্যাপারটা আলাদা। এখনই আই সি ইউ তে ট্র্যান্সফার করছি"

"চিন্তার কিসু আসে?"

"তেমন নেই। মাইল্ড অ্যাটাক"

"আপনারা দয়া কইরা বাড়িতে একখান ফোন কইরা দেন" ভাগ্যিস বাড়ির নম্বরটাও অনিন্দ্য দিয়েছিল। সব ইতিবৃত্ত রিসেপশন লিখে বলল "তোমার নাম?"

"কান্তাবালা মাঝি"

"সই করতে জান?" মাথা নাড়ল।

"ঠিক আছে, দরকার নেই। বাড়ির লোক এলে সই করিয়ে নেব"

"আমি যাইতে পারি। তাড়াহুড়োয় বাড়ি খোলা রাইখ্যা আইসি"

মাথা নেড়ে বলল "ডাক্তারকে একবার জিজ্ঞেস করে নিই" কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বলল "ঠিক আছে"

ভাগ্যিস ইমারজেন্সির পেছনের দিকে গাড়ি পার্ক করেছিল। স্বনামধন্য চিত্রতারকা অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে গাড়ি নিয়ে পালিয়ে বাঁচল, ফ্ল্যাটের স্বপ্ন জলাঞ্জলি দিয়ে। যার ভাগ্যে যা লেখা। পদ্মপর্ণাদি কী পেয়েছে, অবন্তী জানে না। তার ভাগ্যে ফ্ল্যাট দূরে থাক, এ মুহূর্তে কানাকড়িও জুটল না। ঈশ্বরের আশীর্বাদ, লোকটাকে বাঁচাতে পেরেছে। নিজের ইজ্জতটাও। নাই বা হল ফ্ল্যাট। মান বাঁচানোর থেকে দামি কী আর কিছু আছে?

জানতেও পারল না ব্যাধিটার এক বিশেষ নাম আছে - অ্যাঞ্জাইনা ডি আরমর, বা কয়েটাল অ্যাঞ্জাইনা। আনকমন হলেও সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্সের সময় বুকে ব্যথা থেকে মাইল্ড হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। ইস্টার্ন বাইপাস দিয়ে ড্রাইভ করতে গিয়ে মনে হল, অন্তত সিকিউরিটিকে বাড়িতে খবর দিতে বলে যায়।

"ঠিক হ্যায়। হার্ট অ্যাটাক হুয়া। ডক্টর বোলা ফিকর করনে কা জরুরত নেহি। হাসপাতাল মে ভর্তি কর লিয়া"

ওর হাতে পাঁচ হাজার টাকা গুঁজে বলল "ম্যয় আয়া থা কিসি কো নেহি কহেনা। নৌকরানি বোলকে ভর্তি কর দিয়া"

"জি মেমসাব। জইসে আপ কহে"

পকেটে টাকা গুঁজতে গুঁজতে সিকিউরিটি গাড়ির দরজাটা বন্ধ করে বলল "আপ ফিকর মত কিজিয়ে। আজ রাত কা বাত কোই নেহি জানেগা। লোক পুছে তো নৌকরানি কা নাম কেয়া বলু?"

“কান্তাবালা মাঝি”

ভাগ্য ভাল লোকটা মরে যায়নি - ভাবতেই...

রাত তখনও শেষ হয়নি। বাইপাসের খোলা আকাশে না-দেখা তারাদের ভিড়ে জড়ানো চাদরটা ব্যাক সিটে ছুড়ে প্রাণভরে শ্বাস নিল। মর্তে সে যে এখনও সম্মান নিয়ে শ্বাস নিতে পারছে, সেটাই বা কম কী? ফ্ল্যাটে পৌঁছে বাসি জামাকাপড়গুলো বাথরুমের কোণায় ফেলে স্নান করল। আজকের কলঙ্কিত রাত্রির গন্ধটাকে মুছে ফেলতে হবে। কতক্ষণ শাওয়ারে ছিল জানে না। যখন বেরল, ঊষার প্রথম কিরণ পর্দার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে। বিবস্ত্র দেহটা খাটের ওপর এলিয়ে মনে হল, আরেকটা ফ্ল্যাট, ওঠাবসা রথী-মহারথীদের সঙ্গে! এই ছোট্ট ঘরে যে শান্তি লুকিয়ে আছে, তা তো ঐশ্বর্যের মধ্যে নেই।

আজ সঞ্জীবের কথা বড্ড মনে পড়ছে। মনে পড়ছে ফেলে আসা দিনের কথা। নিতান্তই এক গৃহবধূ। আজ কতদিন হল সঞ্জীব ছেড়ে চলে গেছে। ভোরের সূর্য যেন ফিসফিস করে বলছে, শেষ থেকেই তো আবার শুরু...

চোদ্দ

সময়টা ভাল যাচ্ছে না।

কপালের দোষও বলা যেতে পারে। এই মন্দার বাজারে, যখন নিজের কম্প্যানিটাকেও দাঁড় করাতে পারেনি, নাদিম সাহেবকে যদি বা বলে কয়ে আর একটা সিডি বার করতে রাজি করিয়েছিল, সেখানেও বিপত্তি। সাধে কি নাদিম সাহেবের প্রোগ্রামে মুফতে গেয়ে এসেছে? শুভ্রা মিত্রর জানে কিছু হাসিল করতে গেলে, এমন অনেক ফ্রি সার্ভিস দিতে হয়। আপত্তি নেই।

বাধ সাধল মালিক রাজীব গোয়েঙ্কার এই হঠাৎ অসুস্থতা।

"এখন নতুন কোনও রিস্ক নেওয়া যাবে না। গোয়েঙ্কা সাহেব আগে সুস্থ হয়ে উঠুন। পরে ভেবে দেখা যাবে" নাদিম সাহেবের স্পষ্ট জবাব।

এত কাঠখড় পোড়ানো, ফ্রিতে গাওয়া শিকেয় উঠল। একটু যদি বা আশা ছিল, তাও বিশ বাঁও জলে। এমনিতেই তো রয়ালটি দিতে গায়ে জ্বর আসে। যখন তুঙ্গে সময় যাচ্ছিল তখনও ইনিয়ে-বিনিয়ে বলত "কোথায় আর বিক্রি? তেমন তো কিছুই নেই" আর এখন যেখানে মিউজিক কম্প্যানিগুলো পাইরেসির জন্য লাটে উঠেছে, সেখানে আর সুযোগ কোথায়? নতুন সুর নেই। নিজেও একটা মিউজিক কম্প্যানি খুলে চেষ্টা যে করেনি, তাও নয়। প্রথম অ্যালবাম 'মাতৃ বন্দনা' পাবলিসিটি সত্ত্বেও তেমন কাটল না। যদিও মিত্রভারতীর কর্ণধার রাজীব চট্টোপাধ্যায় যথা সম্ভব সাহায্য করেছিল। গলার জৌলুসটাও কমে আসছে। রিয়ালিটি শো-তে জাজ হয়ে কালেভদ্রে কিছু জুটে যায়। সেখানেও কম্পিটিশন প্রচুর। হাভাতের সংস্কৃতির মধ্যে সবাই তো চাতকের মতো ওটুকুর জন্যই বসে আছে।

"আমাদের লেক গার্ডেনসের ফ্ল্যাটটাতে অফিস করে বসে আছ? কটাই বা অফার আসে? অন্য কিছু করা যায় না?"

জয়ন্তর কথা শুনে ভাবছিল, সত্যিই ওই ফ্ল্যাটে নতুন কোনও বিজনেস করা যায় কি না। তখনও তেমন নাম হয়নি। স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য কাপড়ের বুটিকে চাকরি নিয়েছিল। ওই ফ্ল্যাটে কাপড়ের বুটিক তো করা যেতেই পারে। এখনও ড্রেস ডিসাইনিং-এর একটু-আধটু মনে আছে। চেষ্টা করে দেখলে মন্দ হয় না। শুরু হয়ে গেল ইন্টিরিয়ার ডেকরেটিং-এর সঙ্গে অ্যাগ্রেসিভ নেটওয়ার্কিং। এতদিনের অফিস, পুরনো ফ্ল্যাটটা সেজে উঠল নতুন বুটিকের চাকচিক্যে। পাবলিসিটি চাই। কে সব থেকে বাজারে খাচ্ছে? অফ কোর্স দেওয়ালি। বছর পাঁচেক আগে অমর্ত্যর পরিচালনায় দেওয়ালির জন্য 'নক্ষত্র' ছবিতে প্লে-ব্যাক করেছিল। ওকে ভেড়াতে পারলে, কভারেজ আর পাবলিসিটি ভালই জুটবে। একবার চেষ্টা করে দেখাই যাক না কেন।

"আমায় চিনতে পারছ? শুভ্রা মিত্র। ব্যস্ত? কথা বলতে পারি?"

"নিশ্চয়ই। মনে আছে আপনি অনেকদিন আগে 'নক্ষত্র' ছবিতে প্লে-ব্যাক করেছিলেন। মুম্বাইতে আছি। তবে এই মুহূর্তে ফ্রি। মেকআপ রুমে। কথা বলা যেতে পারে"

"সোজাসুজি কাজের কথায় আসি। আমি একটা বুটিক ও চাঙ্কি ডিসাইনার জুয়েলারির দোকান খুলছি। ভাবছি তুমি যদি ইনাগোরেট করতে পার..."

ধাক্কা খেল দেওয়ালি। বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল। এত খ্যাতির পরিণাম এই! এই স্টারডমে সবার পরিণতিই কী এক? সে যে সাইন্স কলেজের পরে এ পথে বা বাড়িয়েছে, ক্রমশ উত্তরণের মধ্যে কোথায় যেন একটা শঙ্কা। কালকে কী তারও এমন পরিণতি হবে? হয়ত এই প্রেজেন্ট সিস্টেম অজান্তে অনেককেই এই পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

অস্পষ্ট মনে আছে, ছোটবেলায় মা এক গুরুদেবের কাছে নিয়ে গেছিল। নামটা মনে নেই। গুরুদেব বলেছিল 'একদিন বুঝবে, ধরে রাখতে গেলেই হারাবে। ছেড়ে দাও... সব ছেড়ে দাও... দেখবে সারা পৃথিবী ধরা দেবে'

বললেই কী ছেড়ে যাওয়া যায়? কে পারে? কজন পারে? দেওয়ালি কী পেরেছে?

ছোটবেলায় খুব বই পড়ত। রোমান সম্রাট মারকাস অরেলিয়াসের মেডিটেশনস-এ এমনিই কিছু একটা পড়েছিল, যা গুরুদেব বলেছিলেন। তত্ত্বকথাগুলো সত্যি হলেও, বাস্তবিক ক্ষেত্রে, যখন নাম, যশ, খ্যাতি সোনার জাজিম বিছিয়ে চুম্বকের মতো টেনে নিয়ে যায়, তখন পালানো মুশকিল। তাই শুভ্রাদির কথায় ভয় পেলেও, মুহূর্তে মন থেকে মুছে ফলল।

"ইচ্ছে থাকলেও নিরুপায়। এখন আমি মুম্বাইতে। এখানে চক-এ-ব্লক। ডেটস দেওয়া আছে। কলকাতায় ফেরার টাইম নেই"

"এক ইভিনিং-এর জন্য?"

"আমার চেয়ে কত গুণী মানুষ আছেন। তাঁদের কাউকে ডেকে নিও"

শুভ্রা বুঝল দেওয়ালি থাকতে পারবে না। কারণ যাই হোক না কেন। কাজও হতে পারে, আবার পড়ন্ত শুভ্রার জন্য সময় ব্যয় করা উদীয়মান দেওয়ালির কাছে অপচয়ও মনে হতে পারে।

"কাউকে উদ্বোধন করার জন্য পেলে?" জয়ন্তর প্রশ্নে অন্যমনস্ক শুভ্রা ফিরে তাকাল।

"নাঃ" উত্তরের বদলে দীর্ঘশ্বাস।

"মুম্বাই-এর অনেকের সঙ্গেই তো পরিচয় হয়েছে রিয়ালিটি শোতে। কাউকে বলে দেখব?"

"চেষ্টা করে দেখতে পার। কেউ কী আমাদের এই বুটিকের জন্য মুম্বাই থেকে আসবে? দেওয়ালিও তো এল না"

বিষণ্ণ নিরুৎসাহে ফ্যালফ্যাল করে রাস্তার দিকে চেয়ে রইল। রাগ ললিত গৌরী ক্রমশ মিশে যাচ্ছে বাসন্তী কেদারে। মনে ভয়। আগেই বুঝতে পেরেছে, সংগীত জীবনের গোধূলি এসে গেছে, জীবিকার অন্য উপায়ও ঘুরপাক খাচ্ছে অনাদি কল্যাণে। এই মিশ্রণের মধ্যে, শুধু একটা নতুন সুর হাতড়ে বেড়াচ্ছে। মিউজিক কম্প্যানিটাও তো চলল না? এটা কী চলবে?

বাবা বলত "তুই ভীষণ জেদি। কারও কথা শুনিস না"

সেই জেদটাই ছিল তার অস্ত্র। সাফল্যের মুল কারণ। তিমির কাকু ছিল, এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা। ঈশ্বরের আশীর্বাদে সাফল্য বরমাল্য পরাল। সে তো সংগীতের ক্ষেত্রে। কিন্তু এটা তো স্বতন্ত্র, অন্য এক জগৎ। এখানে তো তিমির কাকুও নেই। জয়ন্ত থেকেও যেন নেই। ওর মধ্যে সেই ডেয়ার-ডেভিল ভাবটাই নেই। পাশের ঘরে, কয়েকটা ফোন সেরে, জয়ন্ত এসে বলল "নাঃ। কেউ ফ্রি নেই"

"আমি তো কোনও ডেট ফিক্স করিনি। এক ইভিনিং-এর জন্যেও নয়?"

"সবাই কোনও না কোনও ছুতো দেখিয়ে অ্যাভয়েড করে গেল। শালা দুনিয়াটাই তাই। যেখানে ইনকাম নেই, সেখানে কেউ আসতেই চায় না। অথচ দেখ না। রিয়ালিটি শোর সেটসে কী মিষ্টি মিষ্টি কথা। মুখে মধু ঝরছে"

"দুনিয়াটাই তাই। আমারাও তো এতদিন মধু বিক্রি করেই নেটওয়ার্ক তৈরি করেছি"

"তবুও তো তুমি অনেক প্রোগ্রাম ফ্রিতে করেছ..."

"সেটাও তো কিছু পাওয়ার আশায়"

"এখানে তো কিছু পাওয়ার নেই। ফ্লাইট, অ্যাকমডেশন দিলেও লাভ তো কিছু নেই"

"সব-ই কী লাভ-লোকসানের অঙ্ক?"

জয়ন্ত কোনও কথা না বলে বাথরুমে ঢুকল। বড্ড গরম পড়েছে। ইন্ডিয়ার বিভিন্ন জায়গায় এতগুলো ফোন করে বকবক করতে গিয়ে, ক্লান্ত লাগছে। মাথা কাজ করছে না। এরপর টেনশনে শুভ্রার মুড বিগড়লে, আর নিতে পারবে না। স্নান সেরে আগে মাথাটাকে ঠান্ডা করা যাক। পরে ভাবা যাবে।

চেনা লোকগুলো কেমন যেন অচেনা হয়ে যাচ্ছে। তবে কী সব হারিয়ে গেছে? আবার নতুন করে সবকিছু শুরু করা যায় না? ছোটবেলার জেদটা এখনও মরে যায়নি। স্ফুলিঙ্গের মতো ধিকধিক করে জ্বলছে। সেই স্ফুলিঙ্গকে আবার বারুদে পরিণত করতে হবে। জয়ন্ত না থাকলেও একাই।

ফোনটা বেজে উঠল। ধরতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু বেজেই চলেছে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও সি এল আই না দেখেই ফোনটা তুলে নিল আধো অন্ধকারে।

"দেওয়ালি বলছি। দিদি বিরক্ত করলাম না তো?" চমকে উঠল। আবার দেওয়ালি!

"না না, বিরক্ত করবে কেন?"

"এক উইক পরের সান্ডেতে ফ্রি পেয়েছি। ওই শিডিউলের চিফ ক্যামেরাম্যানের মা অসুস্থ। তাই ওদিনের শুটিং ক্যান্সেল করা হয়েছে। যদি আপনি ওদিনে অরগ্যানাইজ করতে পারেন, যেতে পারি" দেওয়ালি অন্ধকারে দিয়া জ্বালিয়ে দিল। আলোর ফ্ল্যাশ।

"আসবে? সত্যি?"

"মিথ্যে বলতে কী ফোন করেছি? তুমি এক উইকে অরগ্যানাইজ করতে পারবে?"

"পারব। অরগ্যানাইজ করে অন-লাইন রিটার্ন ফ্লাইট বুক করে তোমায় জানিয়ে দেব। তোমার ই-মেলটা বলবে?"

"লজ্জা দিচ্ছ কেন দিদি। আই ক্যান অ্যাফরড এ রিটার্ন ফ্লাইট টু ক্যালকাটা। মেলটা টেক্সট করে দিচ্ছি। কনফারমড হলে ফোন করে দিও" একটু থেমে "ভীম নাগের সন্দেশ খাওয়াতে হবে কিন্তু। মুম্বাইতে সন্দেশ আর মিষ্টি দই পাওয়া যায় না"

ফোনটা রেখেই শুভ্রার মনে হল, ইশ... ও কত নেবে জিজ্ঞেস করাই হল না। পর মুহূর্তেই মনে হল, তাও কী করা যায়? নিজে থেকে ফোন করে নিজের খরচায় যখন আসছে, তখন কী নেবে?

টাকাটা বড় কথা নয়। এই দুর্দিনে যে পাশে দাঁড়িয়েছে, সেটাই সব থেকে বড়। হয়ত ওর উপস্থিতিতে কিছু ফ্ল্যাশ বাল্ব জ্বলবে। মিডিয়াতে লেখা হবে। এটুকু পাবলিসিটিরও প্রয়োজন নেই। না থাক। শুভ্রার ওকে

প্রয়োজন। কৃতজ্ঞতায় বুকটা ভরে গেল। সুখের দিনে তো সবাই পাশে থাকে। দুঃখের দিনে... দেওয়ালি স্টার, সেলিব্রিটি হলেও, অন্যদের থেকে আলাদা।

জয়ন্ত স্নান সেরে বেরিয়ে বলল “আরেকবার আরেক সেটকে ট্রাই করে দেখি”

“দরকার হবে না। হয়ে গেছে। দেওয়ালি ফোন করেছিল। মুম্বাই থেকে আসবে”

পনেরো

“নাও তোমার লেখাটা হয়ে গেছে” অঞ্জন শোভনের দিকে পাণ্ডুলিপিটা ছুড়ে দিল “বলেছিলাম না, সময়মত শেষ করে দেব”

“কী নাম দিলেন?”

“নামটা তো তুমি দেবে। আগেরটা আমি সাজেস্ট করেছিলাম”

“বিবেকানন্দর পদকমলে। কেমন?”

“পদকমল শব্দটা ভাল লাগছে না। কীরকম সেকেলে। বরং নতুন রূপে বিবেকানন্দ বেটার হবে, নয়কি?”

“আপনি জানেন কোনটা বেশি খায়। চা বলি?”

“সঙ্গে টা-ও। বড্ড খিদে পেয়েছে” শোভনের অফিসের লেদার সোফায় গা এলিয়ে দিল অঞ্জন “তোমার জন্য লেখাটা কমপ্লিট। এবার আমার লেখা লিখতে দাও। রাজীব উদগ্রীব হয়ে বসে আছে। ওর কামাই-এর তো বন্দোবস্ত করে দিতে হবে”

“কী নিয়ে লিখছেন?”

“বিবেকানন্দ-নিবেদিতার রাসলীলা হতে পারে। এখনও ঠিক করে উঠতে পারিনি। এগুলোই বাজারে খায়। ইংল্যান্ডে দেখনি ‘সান’ কিংবা ‘ডেইলি মিররের’ বিক্রি সব থেকে বেশি”

“বেশ তো, লিখুন না। আপনার তো এ বাজারে সব থেকে বেশি কাটতি” শোভন সায় দিল।

“তার পেছনে তো তোমারও হাত আছে। টিভি প্রোগ্রাম স্পন্সর করে, রাজীবকে অঢেল অ্যাডের টাকা দিয়ে, তুমিও তো কম হেল্প করছ না। এখন যখন ‘ক্ষণকাল’ পত্রিকাটা কিনেই ফেললে, স্কোপ তো আরও বেড়ে গেল। শেষ পর্যন্ত কত টাকায় রফা হল?”

“পঁয়ত্রিশ কোটি। অ্যাট লিস্ট আমাদের তো নিজস্ব একটা মুখপত্র হল। জয়েন করবেন?”

“না বাবা। আমি মৃন্ময়ের কাগজেই থাকি। দুঃসময়, ও না থাকলে ভেসে যেতাম। যখন বড়বাজার থেকে বার করে দিল, ওই তো আশ্রয় দিয়েছিল। ওকে ছাড়ি কেমন করে?”

কাহিনিটা কী, অঞ্জনদা কখনো খোলসা করে বলেনি। শোভনও জানতে চায়নি। লোকমুখে শুনেছে, পেইড নিউজ লেখার জন্য অঞ্জনদাকে বার করে দেওয়া হয়। সত্যি-মিথ্যা ঠিক জানে না।

অঞ্জনের সত্য কাহিনি অনেকেরই অজানা। প্রথম জীবনে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেয় স্কটিশ চার্চ কলেজে। সেই সময় দু-দুবার, দুই মহিলার সঙ্গে লিভ ইন রিলেশনশিপে জড়ায় প্রফেসর সাহেব। কিন্তু কোনও বার-ই সেটা টেকে না। মায়ের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ার কারণটা পরিচিত মহলে ঘোরাফেরা করলেও, আসল কারণ ছিল অঞ্জনের অতিরিক্ত মহিলা আসক্তি। তার কু-প্রস্তাব থেকে ছাত্রীরাও বাদ যায়নি। সে সময়, বেশ কিছু মহিলার কাছে চড়-চাপড়ও জনসমক্ষে খেতে হয়। সে সব কাহিনি অবশ্য শোভনের অজানা।

বদনাম থেকে বাঁচবার জন্য প্রায় ষোলো বছর অধ্যাপনার পর, সেই আশির দশকে অধ্যাপনা ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়। প্রথমে ‘ক্ষণকাল’ পত্রিকায় যোগ দেয়। সেখান থেকে ‘বড়বাজার’। বিতাড়িত হওয়ার পর

ত্রাহি অবস্থা। কেউ চাকরি দেয় না। এদিকে উশৃঙ্খল জীবন যাত্রা। রসদও ফুরিয়ে আসছে। ধারদেনা করে, জীবনটাকে টেনে ঘষটে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। শোধ দেওয়ার বালাই নেই। এক বাড়ি থেকে আরেক। কোথাও স্থায়িত্ব নেই।

ঠিক সেই মুহূর্তে কর্ণদা, কর্ণের মতো উদ্ধার করল।

"মৃন্ময় তার কাগজের এডিটরিয়ালটা আমায় দেখতে বলেছে। সিনেমা করে, টাইম বার করা মুশকিল। তুমি আমার সঙ্গে কো-এডিটর হিসেবে জয়েন করবে?"

হাতে যেন চাঁদ পেল অঞ্জন। করবে মানে? আর কিছু কী করার আছে? এখন বাঁচতে হবে। কোথাও একটা মাথা গোঁজার ঠাই "তুমি ডাকলে না করতে পারি?"

মৃন্ময়ের কাগজে চাকরি। শেষমেশ মাকে নিয়ে ঠেকল গড়িয়ার অরবিন্দ সরণিতে। তবু তো একটা মাথা গোঁজার ঠেক পাওয়া গেল। সঙ্গে মাস মাইনের চাকরি। সেই সময় থেকেই রাজীবের অফিসে যাতায়াত। পটিয়ে-পাটিয়ে লাইনে আনার চেষ্টা।

"বুঝলে রাজীব, কিছু একটা করতে হবে"

"কোনও আইডিয়া আছে অঞ্জনদা। ব্যাবসাটা তেমন চলছে না। আগের লেখকেরা আর বাজারে বিকোচ্ছে না"

"সেনসেশন চাই, বুঝলে সেনসেশন চাই। ওটাই বাজারে খায়"

"বুঝলাম তো। কিন্তু কী সেনসেশন?"

"লোকে তোমার আমার লেখা পড়বে না। কিন্তু বাঙালি আজও মনীষীদের জীবন পড়তে ভালবাসে"

"ঠিক বুঝলাম না"

"মনীষীদের লেখা তো সবার কাছেই আছে। ওদের সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধও আছে। কিন্তু ওসব পড়ে কে?" অঞ্জন হাফ-টাকে হাত বুলিয়ে বলল "ওদের মহিলা ঘটিত কিছু গোপন কাহিনি যদি ফিকশন করে লেখা যায়..."

"কাহিনিটা বানাবে?"

"কে আসল কাহিনি জানে? সত্যি-মিথ্যে মিশিয়ে বেশ জমিয়ে যদি রসালো কাহিনি লেখা যায়, আমি বলছি বাজারে খাবে"

"যেমন?"

"এই ধর না রবীন্দ্রনাথ। কত মহিলার সংস্পর্শে এসেছেন। এদের মধ্যে কোনও একজনকে নিয়ে যদি জাম্পেস করে রসিয়ে লেখা যায়, ওনার অজানা জীবন নিয়ে, ওটা খাবে"

"জানবে কী করে?"

"জানবার কী দরকার আছে? ফিকশন। কল্পনার মাধুরী মিশিয়ে লিখে ফেললেই হল। সত্যি মিথ্যা কে দেখতে যাচ্ছে? কার অত পড়ার সময় আছে?"

"তুমি লিখবে?"

"তুমি যদি ছাপাও, লিখতে পারি"

"বেশ একটা লেখ তো, বেশ জমিয়ে। দেখি চলে কি না"

অঞ্জন ভাবছিল কোনও মহিলাকে নিয়ে প্রথম লিখবে। বাঙালি এমনিতেই রক্ষণশীল। দেশি মহিলা সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিতে পারে। বিদেশি কাউকে নিয়ে লেখাটাই শ্রেয়।

"আপনার যা মর্জি। তবে আর বছর দুয়েকের মধ্যে তো প্রকাশ দাসগুপ্ত রিটায়ার করছে। এডিটরিয়াল পোস্টটা আপনি নিতে পারেন" কর্ণ মারা যাওয়ার পর, এখন সে-ই কাগজের সর্বেসর্বা। মৃন্ময় খবরের কাগজের মালিক হতে পারে, কিন্তু সংস্কৃতি থেকে বহুদূর। বনেদি বড়লোক। ওকে ছাড়বার কী কোনও প্রয়োজন আছে? মৃন্ময়, শোভন দুজনকেই হাতে নিয়ে খেলতে পারবে। দুজনেই মালদার। সেটা বেশি ভাল নয় কী?

"সে তখন ভাবা যাবে। রাজীবকে ছাপাতে দেওয়ার আগে লেখাটা একবার পড়ে নিও"

"নিশ্চয়ই। আমাকেও তো জানতে হবে। না হলে প্রেস প্রশ্ন করলে কী জবাব দেব?" খাবার সার্ভ করতে বলল "নিন... নিন। টাকাটা কী চেকে দেব, না ক্যাশে?"

"চেকে নয়, ক্যাশ। চেক হলে দেখাব কী বলে? তোমার নামে বই ছাপানর জন্য তুমি আমায় পেমেন্ট দিয়েছ?" মোমোতে কামড় দিয়ে মুচকি হাসল।

টাকার ব্যাপারে শোভন যতই উদাসীন হোক না কেন, অঞ্জন হাড়ে হাড়ে বুঝে নিতে জানে। বুঝে নিতে বললে একটু কম বলা হবে, হাতিয়ে নিতে জুড়ি নেই। মনে পড়ে না ধার নিয়ে এযাবৎ কাউকে টাকা ফেরত দিয়েছে কি না। টাকা সোনার থেকেও দামি। টাকা ছড়ালে, যে কোনও মহিলাই যন্ত্রপাতি মালিশ করে দেবে। এই চুয়াত্তর বছর বয়সে জিনিসপত্র চাঙ্গা না রাখলে কী চলে? সে অবন্তীর মতো তারকাই হোক, আর ইমার মতো গায়িকা। ইমা কী সেদিন ভাবতে পেরেছিল, অঞ্জন মাল খেয়েও চব্বিশ বছরের ছেলেকে হার মানাতে পারে? পারেনি।

মধ্যরাতে খ্যান্তমনিও অপরূপা। অঞ্জন অত ভাবে না। একটাই থিওরি। কভার দ্য ফেস অ্যান্ড ফায়ার দ্য বেস। বন্দুকের নল যত তীক্ষ্ণ হবে, রসটাও খরস্রোতা নদীর মতো, দুর্বার স্রোতে বইবে। ভায়াগ্রা শুধু অভাগাদের জন্য। নারীদের কল্যাণে অঞ্জন অতটা অভাগা নয়। রবিশঙ্করের চেয়ে কিছু কম নয়। খালি ভারত সরকারই তার কদর বুঝল না। এতদিনে ভারতরত্ন না হোক, একটা ভূষণ-শ্রী পেয়ে যেত।

ভূষণ-শ্রী চুলয় যাক। মহিলা সম্প্রদায়ের কাছে যে এই বয়সেও নিজের যৌবন আটুট রাখতে পেরেছে, সেটাই বড়! জীবনের 'ধন' কিছুই যাবে না ফেলা। ধুলায় তাদের যত হোক অবহেলা। সেখানেই জীবনের পূর্ণতা। রত্ন-শ্রী-ভূষণে নয়। এতকাল ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে চর্চা করতে করতে সাহেবদের একটা বুলি বড্ড প্রিয় ইট, ড্রিঙ্ক অ্যান্ড বি মেরি। ফর টুমরো উই ডাই।

"বেশ। আপনি যে ভাবে চান। আপনি তো আমাদের গর্ব" শোভন চায়ে চুমুক দিল।

হঠাৎ অঞ্জনের ফোন বেজে উঠল, ইমা "আপনার সঙ্গে জরুরি দরকার"

"পরে ফোন করছি। এখন শোভনের সঙ্গে জরুরি কথা বলছি"

"না... না... না... এখনই..."

"ব্যাপারটা কী? এত তাড়া কিসের?"

"খুব জরুরি। ইট ইজ ইম্পরট্যান্ট"

অঞ্জন আঁচ করল, কোথাও একটা গণ্ডগোল হয়েছে। যাই হোক না কেন, শোভনের সামনে এ ব্যাপারে ডিসকাস করতে চায় না।

“আমি কথা শেষ করে তোমায় ফোন করছি”

আবার কী হল? ধীর স্থির ইমাকে তো এর আগে এত উতলা দেখেনি। নিশ্চয়ই সিরিয়াস কিছু। নইলে ইমা ফ্র্যান্টিকভাবে ফোন করত না। মহিলাদের এই টেনশন নতুন নয়। অঞ্জন অভ্যস্ত। এর আগেও বহুবার, বহু নারীর ভাবাবেগ সামলাতে হয়েছে। মহিলারা একটু বেশি আবেগ প্রবণ হয়। শিল্পী হলে তো কথাই নেই... ইমার ইম্পরট্যান্ট ইমারজেন্সিকে মোকাবিলা করা বাঁ হাতের খেল।

আজ তো নয়, সেই কবে থেকে মহিলাদের নিয়ে খেলছে। হয়ত জীবনটা অন্য রকম হত, যদি তার আগের দুই লিভ-ইন পার্টনার, অনামিকা আর সুদেষ্ণা, মায়ের সঙ্গে ঝগড়া না করে, তাকে পরিত্যাগ না করত, জীবনের সব স্বপ্নকে চুরমার করে। স্বপ্ন-ই ভাঙা নয়, তাদের বিদায় তার মননে যে গভীর রেখাপাত করেছিল, তার অভিব্যক্তি আজকের অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। যাকে সবাই নারী পিপাসু, বিক্রেতা বলেই জানে। শুধু জানে না, অন্তর্নিহিত উৎস, যেখানে এর বীজ পোঁতা হয়েছিল। ঘর-ই শুধু গেল না, জীবনের দর্শনটাই পালটে গেল। প্রফেসারি ছেড়ে বিলেতে। আবার ফেরত কলকাতায়। পত্রিকার সাংস্কৃতিক সম্পাদক। নতুন জীবন।

দিনের শেষের কাজগুলো গুটিয়ে, যেই না চেয়ার ছেড়ে উঠেছে, রিসেপশন থেকে ফোন “আপনার সঙ্গে এক মহিলা দেখা করতে চাইছেন” এই কাজের শেষে? ভাবছিল আরেকদিন আসতে বলবে। কী মনে হতেই বলল “ঠিক আছে পাঠিয়ে দাও”

কিছুক্ষণের মধ্যেই দরজার সামনে এক লাল পেড়ে সাদা শাড়ি। কপালে লাল টিপ তন্বী যুবতি। পুষ্ট অবয়বের আকর্ষণীয় অংশগুলো দেহে অতিরিক্ত প্রলেপ দিয়েছে। মেয়েটির দিকে মুখ তুল ডেস্কের উলটো দিকে ইঙ্গিত করে বলল “বস”

“অসময় আপনাকে বিরক্ত করলাম। কয়েকদিন ধরেই ভাবছি আসব। কিন্তু কলেজ শেষ হতে এত দেরি হয়ে যায়, যে আসা আর হয়ে উঠছিল না। আজ তাড়াতাড়ি শেষ হয়েছে। ট্র্যাফিক জ্যামে আটকে পড়েছিলাম”

এবার ভাল করে দেখল। একবার দেখলে মন বারবার ফিরে দেখতে চায়। ঠিক ফর্সা বলা না গেলেও, সাধারণ বাঙালি মেয়েদের চেয়ে রং যেন একটু বেশি পরিষ্কার। সরে যাওয়া লালপেড়ে সাদা শাড়ির আঁচলটা চেয়ারের হাতলে লুটিয়ে পড়াতে, লাল ব্লাউজের অন্তরালে স্তনযুগলের একাংশকে অনাবৃত। না চাইলেও, যে কোনও পুরুষের চোখ ওখানে পড়াই স্বাভাবিক। অঞ্জন তো আর ভীষ্ম নয়। তার চোখের ঘোরাফেরা বুঝতে একটুও অসুবিধা হয়নি। মিডিয়ার লোকেরা যেমন টিআরপি বোঝে, মেয়েটিও জানে তার ইউএসপি।

“কোন কলেজে পড়?”

“প্রেসিডেন্সি। বাংলায় অনার্স ফাইন্যাল ইয়ার। কবিতা লিখি। আপনার একটা কবিতা শোনার সময় আছে? বাই দ্য ওয়ে, আমার নাম দীপশিখা”

দীপশিখা বহ্নি ছড়াচ্ছে। যতক্ষণ থাকবে, কবিতা শোনাবে, ততক্ষণই চোখের তৃপ্তি।

“বল। কাজ শেষ হয়ে গেছে। বেরচ্ছিলাম”

"আপনার সময় নষ্ট করছি"

হ্যান্ডব্যাগ থেকে নোটবই বার করে পাতা উলটে কবিতা শোনাল। দারুণ লেখা তো। এই বাচ্চা মেয়ের এত বলিষ্ঠ লেখা। ভাবাই যায় না।

"বাহঃ..."

"অনেকদিন ধরেই লিখছি। কোথাও ছাপানো হয়নি। ভাবছিলাম আপনার এখান থেকে যদি বের হয়..."

অঞ্জন দীপশিখার অনাবৃত ব্লাউজের ফাঁক দিয়ে, সুডৌল স্তনের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলল "বেরবে। এখান থেকেই বেরবে। তুমি বরং এক কাজ কর। কালকে সন্ধের দিকে এস। একটু লেট করে। সম্পাদককে একটা চিঠি লিখে আনবে, যে তুমি কবিতাটা ছাপাতে আগ্রহী। সঙ্গে এই কবিতাটা অ্যাটাচ করে দেবে"

সেদিন সেখানেই শেষ।

অঞ্জন তখনও বুঝতে পারেনি, আরেক অধ্যায়ের শুরু। শুধু পেইড নিউজ লেখার উপরিতে পকেট ভর্তি করতেই ব্যস্ত। বিলেত থেকে ফেরার পর উন্নত লাইফ স্টাইল। 'বড়বাজারের' মাইনেতে কী সেভাবে বাঁচা সম্ভব? ঘর-ই যখন রইল না, তখন জীবনকে আস্বাদন কর, তার রূপ, রস, গন্ধ, ছন্দ, বর্ণ, স্পর্শ করে। সেটাই বাঁচার মূলমন্ত্র। মাকে ঘরে রেখে, সারা দুনিয়ার ভোগের আস্বাদনেই জীবনের পূর্ণতা। শূন্য জীবনকে পূর্ণতায় ভরিয়ে দিল ভোগের লালসা - টাকা, নাম, মহিলা।

পরের দিন কথামত দীপশিখা এল। অঞ্জন ওগুলো ড্রয়ারে ঢুকিয়ে বলল "তোমার কী খুব তাড়া আছে?"

"নাঃ তাড়া থাকবে কেন?"

"তবে চল প্রিন্সেপ ঘাটের স্কুপে। আমার গাড়ি আছে। ওখানে বসেই তোমার কবিতা শুনব"

গঙ্গার বুকে, স্কুপের মায়াবী আলোয় তন্বী সুন্দরীর অমৃত কণ্ঠে কবিতা পাঠ। কতটা কবিতা শুনছিল, আর কতটা দীপশিখার দেহ মাধুর্য উপভোগ করছিল, মুহূর্তই বলতে পারবে। সেখান থেকে ইডেনের প্যাগোডায় বসে চুমু খাওয়া। ব্লাউজের ওপর দিয়ে, দীপশিখার ভরাট স্তনের মিঠে স্পর্শ। ওর কাজলকালো চোখে হারিয়ে গেছিল অঞ্জন। ব্লাউজের বাঁধন শিথিল করে, ওর বুকে মুখ ডুবিয়ে তার অতৃপ্ত উত্তেজনাকে চাঙ্গা রাখতে প্রস্তুত দীপশিখা। মূল্যটা গৌণ। জীবনের সার্থকতা, নিজের কাব্যিক স্ফূরণে। কবিতা, যৌবন, শরীর - সব মিশে গেল, সার্থকতার উন্মাদনায়, নেশায়।

সব-ই ঠিক চলছিল। গুটি কয়েক কাছের বন্ধু ছাড়া, এই লেনদেন ছিল লোকচক্ষুর আড়ালে। বাধ সাধল ঈশিতা, আরেক উদীয়মান কবি। তারও শখ হল এক-ই সিঁড়ি বেয়ে ওঠার। দীপশিখার বন্ধু। দেখতে একেবারেই সুশ্রী নয়। কবিতা যাই লিখুক না কেন। আপাদমস্তক দেখেই বলল "নাঃ, ভাল হয়নি। চলবে না"

"কেন? আপনি দীপশিখার কবিতা ছাপাতে পারেন। আমারটা কেন নয়? আমি কি ওর থেকে খারাপ লিখি?"

"বললাম তো, হবে না"

"এটাই আপনার ফাইন্যাল কথা?" ভেতরে ভেতরে ফুঁসছে।

"হ্যাঁ ফাইন্যাল" অকাজের মহিলার প্রতি অঞ্জনের কোনও আকর্ষণ নেই।

ঈশিতাই ফাঁস করে দিল অঞ্জনের সঙ্গে সম্পর্কের ঘেরাটোপে দীপশিখার উত্থানের গোপন রহস্য। অবজ্ঞার প্রতিশোধ। একদিকে এই বোঝাপড়ার তথ্য, অন্যদিকে পেইড নিউজের খেলায় ফেঁসে গেল অঞ্জন।

চাকরিটাও গেল। অঞ্জন তখন বেঁচে থাকার পথ খুঁজছে। ঠিক তখনই রাজীবের সঙ্গে লাইন ফিট করার চেষ্টা। আর চিত্র পরিচালক কর্ণ ঘোষের সিনেমায় সুযোগ করে দেওয়ার আছিলায়, মেয়ে তোলার টোপ। সবাই হিরোইন হতে চায়। সবাই স্টার হতে চায়। অঞ্জন স্টার না করতে পারলেও, কাঁচের স্বর্গ তো দেখাতে পারে। সেই থেকেই সে স্টারডমের সারথি।

"শোভন, গর্ব কিছুই নয়। সাফ কথা, এ ম্যাটার অফ মিউচুয়াল কনভিনিয়েন্স" চায়ের কাপটা শেষ করে উঠে পড়ল "চলি একটু কাজ আছে"

ম্যাগনোর অফিস থেকে বেরিয়ে, বহুদিন পর দীপশিখার কথা মনে পড়ে গেল। কোথায় আছে? কেমন আছে? এখনও কী কবিতা লিখছে? না কি, বিয়ে সংসার করে পাক্কা গৃহিণী? সে সব কথা মনে পড়লেই মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে।

ষোলো

"একটা জাতীয় পুরস্কার দরকার। যে ভাবেই হোক। দেখাতে পারলে আরও প্রোডিউসার পাওয়া যাবে। এই স্ক্যামের মধ্যে মনে হয় না, সাঙ্গুভ্যালি আর প্রোডাকশনে টাকা ঢালবে" শৌভিক ভারী দেহটা বারন্দার সোফায় এলিয়ে দিল। দু-একটা খুচরো ইন্টারন্যাশনল ফেস্টিভ্যালে, প্রোডিউসারকে ম্যানেজ করে টাকা খরচ করেই এন্ট্রি নিয়েছিল। আর কিছু না হোক, সবাইকে তো বলতে পারবে 'আমার সিনেমা ফেস্টিভ্যালে দেখান হয়েছে।' প্রাইজ অবশ্য জোটেনি। তাতে কী? ফরেন তকমা লাগিয়ে প্রোডিউসার আর পাবলিককে তো বশ করতে পেরেছে। সে নিজেও জানে, তার এমন কোয়ালিটি নেই, ইন্টারন্যাশনাল ফেস্টিভ্যালে প্রাইজ পাবে।

বহ্নি হাউস কোটের কোমরবন্ধনীর গিট্টুটা বাঁধতে বাঁধতে পাশে বসে বলল "চ্যাটার্জিবাবুর সঙ্গে কথা বলে দেখ। কই, আমার গ্লাসে হুইস্কি ঢালনি?"

"নাঃ। কী জানি কতক্ষণ লাগে তোমার স্নান করতে! বরফ গলে ভূত হয়ে যাবে। সিঙ্গল মল্ট কি জলে গুলে খেলে কোনও টেস্ট থাকে?"

বহ্নি তার গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে আইস কিউবগুলো অ্যাড করে বলল "উনি চাইলে সব পারেন। আফটার অল হি রানস দ্য ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড শো"

"কথা বলার কী আছে? উত্তরটা তো আমার জানা। তুমি কী তাতে রাজি হবে?"

"কীসে?" বহ্নি চুমুক দিল, "আঃ... সিঙ্গল মল্ট আফটার এ হ্যারয়িং ডে। হোয়াট কুড বি বেটার?"

সেই আশির দশকে যাদবপুর ইউনিভার্সিটির বান্ধবী আজ শুধু স্ত্রীই নয়, তার সন্তানের মা। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন থেকে পাস করে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছে। তখন থেকেই কার্শিয়ং-এর মেয়ে বহ্নির সঙ্গে প্রেম। পাস করে বহ্নি চলে গেল মুম্বাই। ধীমান আর শৌভিক নাটকের গ্রুপ খুলল। বহ্নি বছর দুয়েক ওখানে ছিল। তেমন কিছু করতে পারল না। 'চাহত' বলে একটা সিরিয়াল আর একটা ছবিতে মায়ের রোল করে ফেরত চলে এল। গাঁটছড়া বাধল। নির্জন অস্তিত্ব আলোকিত করল ওদের ছেলে নির্জন। এখন কী করে হাঙরের মুখে ঠেলে দেয় বিবাহিত স্ত্রীকে?

শৌভিক গ্লাস নাড়াচাড়া করতে করতে বলল "ইউ হ্যাভ টু স্লিপ উইথ দিস ওল্ড হ্যাগারড। নিজের মেয়ে বড় হয়ে সিনেমা করছে, তাতেও বুড়োর হিট যায় না। বাছ বিচার নেই। এনি লেডি ইজ জাস্ট ফাইন"

বহ্নি ঢকঢক করে প্রথম পেগটা গিলে, আবার ঢালল। তরলটা গলা দিয়ে নামতেই কেমন ঝাঁঝিয়ে উঠল। কয়েক সেকেন্ড। সে তো ভার্জিন নয়। এই বয়েসে শোয়াটা কী আর তেমন বড় ব্যাপার? শৌভিকর সঙ্গে না শুয়ে, এক বুড়ো ভামের সঙ্গে একরাত। হোয়াটস হারম ইন দ্যাট? আগে কী অন্য কারও সঙ্গে শোয়নি। শৌভিক তো জানেই না। বলতে চায়নি। মুম্বাই-এর সিরিয়ালে সুযোগ পাওয়ার জন্য, তাকে সেই বয়সে কতবার প্রডিউসারের সঙ্গে শুতে হয়েছে! তখন অবশ্য অনেক ইয়ং ছিল। রূপ-যৌবন থাকলেও, কার্শিয়ং-এর রক্ষণশীল পরিবার থেকে আসা বহ্নির মধ্যবিত্ত চিন্তাধারার ঘেরাটোপ থেকে বার হওয়া অত সহজ ছিল না। তবুও একটা স্বপ্ন। আর জেদ। করেই দেখাবে।

ওই সিরিয়াল দিয়েই মুম্বাই-এর অধ্যায় শেষ। কপালে আর কিছু জুটল না।

২০০৪ থেকে ভাগ্যদেবী মুখ তুলে চাইলেন। শৌভিকের প্রথম ডিরেক্টরিয়াল ডেবুট 'উত্তরাধিকারী'। নায়িকা অনুশ্রী। সাইড রোলে বহ্নি। নায়িকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ তার পরের বছর শৌভিকের পরের ছবিতে - 'ম্যানচেস্টার'।

সে সব এখন স্মৃতি। এখন আর সে মুম্বাই-এর স্ট্রাগ্লিং অ্যাক্ট্রেস নয়, শৌভিকও আর স্ট্রাগ্লিং ডিরেক্টর নয়। বাংলা ছবির প্রথম সারির ডিরেক্টরদের মধ্যে একজন। পালাবদলের পরে ভাগ্যের সিন্দুকটা যেন আচমকাই খুলে গেছে।

"হোয়াটস দ্য হারম ইন দ্যাট। অ্যাট দিস এজ, ডাস ইট মেক এ ডিফারেন্স? আফটর অল, ইফ ইট হেল্পস ইন আওয়ার কেরিয়ার?"

গুম মেরে বসে আছে শৌভিক। উত্তর নেই। প্রত্যেকটা সারভিং-এ স্কচের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। বউকে জুরির চেয়ারম্যানের বিছানায় শুতে পাঠাবে, ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার জন্য! নেশাটা গাঢ় না হলে ভাবতে পারছে না। বহ্নি বুঝতে পারছে, ভেতরে দ্বন্দ্বে টালমাটাল। এত বছরে লোকটাকে কাছ থেকে তো দেখে আসছে। পারিবারিক রুচিতে বাধছে, বিবেকেও।

"হোয়াই আর ইউ সো কন্সারনড? নথিং ইজ ফ্রি ইন দিস ওয়ার্ল্ড। দেয়ার ইজ এ প্রাইস টু পে ফর এভ্রিথিং। ইফ উই ওয়াণ্ট সামথিং, হোয়াট ইজ দ্য হারম ইন পেয়িং দ্য প্রাইস?"

"অ্যাট ইওর কস্ট?"

"কাম অন, স্লিপিং উইথ এ ওল্ড হ্যাগারড ইন দিস এজ, ইজ নো কস্ট অ্যাট অল, কম্পেয়ারড টু দ্য বেনিফিটস ইউ রিপ। বাংলা সিনেমার এখন যা অবস্থা, ইট মাইট কোল্যাপ্স লাইক এ হাউজ অফ কারডস এনিটাইম। ভুলে গেছ আমাদের স্ট্রাগ্লিং পিরিয়ডের কথা? নাইন্টিস?"

শৌভিক বহ্নির দিকে তাকিয়ে বলল "ভুলব কেন? আমি আর ধীমান নাটক নিয়ে স্ট্রাগল করছি। টলিউডে স্ক্রিপ্ট লিখে তখন আমাদের সংসার চলছে। মিড নাইন্টিসে কয়েকটা টেলিফিল্ম করলে। দোস ওয়ার হার্ড ডেইজ। তখন বয়স কম ছিল, জিল অনেক বেশি। নির্জনের বয়স কম..." সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে আরও কিছুটা তরল গলায় ঢেলে বলল "নির্জন এখন বড় হচ্ছে। ওর ফিউচারের কথা তো ভাবতে হবে। ইফ উই আর আউট অফ বিজনেস, হোয়ার ডু উই স্ট্যান্ড?"

সবই বুঝতে পারছে। রিয়ালিটি অনেক কঠিন, বউকে পরের বিছানায় এগিয়ে দেওয়ার থেকে। সারভাইভ্যাল ইজ মোর ঘাস্টলি দ্যান ওয়ান নাইটস স্ট্যান্ড। ঢকঢক করে গ্লাসটা শেষ করে আবার ঢালল। বিবেকে বাধলেও, বহ্নির কথা জাস্টিফায়েড। ডারউইনের থিওরি অফ ইভলিউশন তো তাই বলে - ইন দিস ম্যাড ওয়ার্ল্ড, সারভাইভ্যাল অফ দ্য ফিটেস্ট ইজ দ্য ক্রাইটেরিয়া।

আধ খাওয়া সিগারেটটা বারন্দার বাইরে ছুঁড়ে, গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল "শেষ পর্যন্ত কী জ্যোতিষ আর কবচ, ব্রেসলেট, এন্ডরস করে রোজগার করতে হবে? তাছাড়া আর উপায় কী? পলিটিক্স কর, নইলে মা-মাসির রোলে সিরিয়াল। আমি চড়চড়ে গরমে গ্রামে গঞ্জে ঘুরতে পারব না। আমার অত দম নেই। অ্যান্ড হোয়াট ইউ গেট আফটার হোল ডেইজ ওয়ার্ক ইজ পিনাটস"

"সবই বুঝতে পারছি বহ্নি, বাট..."

“কাম আউট অফ ইওর মিডিওকার শ্যাকলস। আমি তো বাজারে নেমে বেশ্যাবৃত্তি করতে যাচ্ছি না। চ্যাটার্জিবাবু এক সময়ের নাম করা ডিরেক্টর। আফটার অল, ইট ইজ এ ওয়ান নাইটস স্ট্যান্ড ওনলি”

ড্রিঙ্কস্টা সেরিব্রামে হিট করতেই, চিন্তাটা অনেক স্বচ্ছ। বহ্নি ঠিকই বলছে। এই কঠিন সময় সারভাইভ্যালটাই বড়। এসব প্রেজুডিস নিয়ে বসে থাকা যায় না। আজ সাঙ্গুভ্যালি পঞ্জি স্কিমে হাত গুটিয়ে নিয়েছে, কাল আরও পাঁচটা প্রোডাকশন হাউস উইথড্র করবে। প্রোডাকশন যত কম হবে, কম্পিটিশন তত বাড়বে। সে তো সেই কোয়ালিটির নয়, যে সাস্টেন করতে পারবে? কর্ণদাও পারেনি। লাইন মেরে বেশ কয়েকটা ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড জুটিয়ে টিকে থেকেছে। আজ যদি বেঁচে থাকত কী হত? সিনেমা জুটত কি না যথেষ্ট সন্দেহ। কোনও কাগজের এডিটরিয়াল আর চ্যাট শো করে রোজগার করতে হত। মরে নিস্তার পেয়েছে। সে তো বহ্নিকে ছেড়ে পালাতেও পারবে না। নির্জনের কী হবে?

“তোমাকে কদ্দিন থেকে বলছি, টিভি প্রোডাকশন কম্প্যানি স্টার্ট করতে। তুমি গুরুত্বই দিচ্ছ না”

“ড্যাম ইট। উই জাস্ট ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট ক্যাপিটল, ইউ নো”

“তুমি ইনভেস্ট করবে কেন? ইউ আর অ্যাট ইওর পিক নাউ। ইনভেস্ট করার জন্য কিছু ভেঞ্চার ক্যাপিট্যালিস্ট জোগাড় কর। দেখ না, শুভ্রজিৎদা স্টার্ট করেছে”

“ভুলে যেও না, আগে দু-দুবার ফেল করেছে, ইভেন হোয়েন হি ওয়াজ অ্যাট হিস পিক। এক সময় ফাঁকা মাঠে প্রচুর কামিয়েছে। এখন তো শুনছি, সমর্পিতাও ওকে ছেড়ে কোন তামিল লোকের সঙ্গে থাকছে। এখন আর ওর কি-ই বা করার আছে?”

“সমর্পিতা চলে গেছে? জানতাম না তো”

“তাই তো শুনলাম” ফ্লোরের দিকে তাকিয়ে গ্লাসটা নাড়াচাড়া করে বলল “আই ডাউট হোয়েদার হি উইল বি সাকসেসফুল হিয়ার টু। হি ইজ সো ভেরি আনস্টেবল”

“বাট ইউ আর নট। ওয়েক আপ, লেট দ্যাট ওল্ড হ্যাগার্ড ইউস মি ফর এ নাইট। আই ডাউট অফ হিস কেপেবিলিটি। এ ফিউ অ্যাওয়ার্ডস, অ্যান্ড উই রান দ্য শো”

অন্ধকারটা এখন আর অত গাঢ় নয়। ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে। মেঘে ঢাকা চাঁদটা আবার উঁকি দিয়েছে। ফিকে আলো। এক সময় দুজনে জ্যোৎস্নায় কত ভেসেছে। এখন আর সে জ্যোৎস্না নেই। তবু ফিকে আলোটা হারিয়ে যায়নি। মেঘ আস্তে আস্তে সরছে। সেখানে কোনও পাগল মুনলিট সোনাটা বাজছে না। ডাকছে না কোনও নতুন পৃথিবী। আনকোরা কম্পোজিশন তৈরি হচ্ছে সংসার আর সংস্কৃতির।

শৌভিক এখন আর বহ্নিকে দেখতে পাচ্ছে না। তাকে ছুঁয়ে যাচ্ছে আলো-আঁধারির লুকোচুরি। নিজেদের অবিচুয়ারি লেখার আগে বাস্তবের হাতছানি। নির্মোহ রূঢ়।

“মাম, আই অ্যাম হাংরি” ভেসে এল নির্জনের আবদার।

“আসছি বাবা” ড্রিঙ্কসটা এক চুমুকে শেষ করে উঠে পড়ল। নির্জনের পড়া হয়ে গেছে। ওকে ডিনার সার্ভ করতে হবে। একদিকে সে যেমন শৌভিকের স্ত্রী, অন্যদিকে সে তো নির্জনের মা। দ্য ওয়ার্ল্ড মাইট বি ক্রুড, বাট হোম ইজ নট। অভিনেত্রী হোক আর যাই হোক, এটাই তার আসল পৃথিবী। একে রক্ষা করাই আপাতত নারীধর্ম।

সতেরো

মোবাইলটা বেজে যাচ্ছে...

নো রেসপন্স। দেবাশিস ডিসকানেক্ট করে দিল। দেওয়ালি নিশ্চয়ই ব্যস্ত। মিসড কল দেখে নিশ্চয়ই ফোন করবে। সদ্য হিউস্টন থেকে ফিরেছে। এখনও ভাল করে জেট ল্যাগ কাটেনি, ঘুম পাচ্ছে। টাইম ডিফারেন্সটা কাটিয়ে উঠতে সময় লাগবে। মোবাইলটা বেডসাইড টেবিলে রেখে, পর্দা টেনে শুয়ে পড়ল। রাখি নেই, কোথাও বেরিয়েছে বোধহয়। কালকেই বলছিল একবার দিদির সঙ্গে দেখা করবে।

বোধহয় হিন্দুস্তান রোডে রত্নাশঙ্করের নাচের স্কুলে গেছে। নিঝুম বাড়িতে, নিশ্চিন্তে একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক। কতক্ষণ ঘুমিয়েছে জানে না। ঘুম ভাঙল মোবাইলের আওয়াজে। কলার লাইন কেটে দিয়েছে। বোধহয় অনেকক্ষণ চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়েছে। মোবাইলে টাইম দেখল, আটটা দশ। সিএলআইতে দেওয়ালি। এতক্ষণে বোধহয় ফ্রি হয়েছে। কল ব্যাক করল।

"স্যরি দেবাশিসদা। তুমি ফোন করেছিলে? শট দিচ্ছিলাম। ঠিক হচ্ছিল না বলে, বারবার রি-টেক করতে হচ্ছিল"

"শেষ পর্যন্ত ঠিক হল?"

"হ্যাঁ" মনে হল দেওয়ালি স্যাটিসফায়েড।

যতটুকু দেখেছে, দেওয়ালিকে পারফেকশনিস্ট বললে কম বলা হবে। এই তো কিছুদিন আগে, ওর সঙ্গে 'খেয়ার আলোয়' সিনেমা করতে গিয়ে দেখেছে। থিয়েটার আর্টিস্ট না হলে কী হবে? স্বরূপার সঙ্গে তাল মিলিয়ে অ্যাক্টিং করতে জানে মেয়েটা। স্বরূপা ভেটারান অ্যাক্ট্রেস, বহুদিন ধরে ইন্ডাস্ট্রিতে আছে। ওর মায়ের রোলের সঙ্গে সমান তালে তাল মিলিয়ে চালিয়ে গেছে। এমনও হয়েছে, দেবাশিস শট ওকে করার পরও দেওয়ালি বলেছে "হল না দেবাশিসদা। আরেকবার"

"কেন রে? ভালই তো করেছিস" স্বরূপার অ্যাশিওরেন্স বৃথা।

"না দিদি। তোমার মতো করতে পারিনি। প্লিজ... আরেকবার..."

অনিচ্ছা সত্ত্বেও, স্বরূপা শট দিয়েছে। দেবাশিসকেও রি-টেক করতে হয়েছে। এডিটিং-এর সময় দুটো শট কম্পেয়ার করতে গিয়ে দেখছে, দেওয়ালিই ঠিক। ফাইন্যাল শট মাচ বেটার। তখনই মেয়েটার প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে গেছে। লাইনে নতুন হলে কী হবে, সুপার পারফেকশনিস্ট।

"কোথায় আছ?"

"এই তো সারাদিনের শুট শেষ করে লোখান্ডওয়ালার ফ্ল্যাটে ফিরলাম। তোমার মিসড কলটা আগেই দেখেছি। উফঃ... যা গরম না। স্নান করে এসিতে এখন রিফ্রেশড" বিবস্ত্র দেওয়ালি চুলটা ফ্যানের হাওয়ায় মেলে বলল।

"কবে কলকাতায় আসছ?"

"এই শিডিউল শেষ না হলে, যাওয়া নেই। এই তো সেদিন শুভ্রাদির ব্যুটিক ওপেন করতে গিয়েছিলাম, একদিনের জন্য। পেপারে দেখনি?"

“নাঃ... আমি তখন হিউস্টনে। দুদিন হল ফিরেছি”

“কিছু দরকার ছিল? ডাবিং-এর ব্যাপারে?”

“না... না... ডাবিং নয়। সিনেমা রেডি, অগস্টে রিলিজ করবে। অন্য ব্যাপারে...”

“কী?”

“ফোনে বলা যাবে না। সামনাসামনি বলতে হবে”

“বেশ, ইফ আই হ্যাপেন টু বি দেয়ার, আই উইল কল ইউ। ক্যান ইট ওয়েট আন্টিল দ্য প্রিমিয়ার?”

“আগে হলে ভাল হত”

“যদি যাই, তোমায় ফোন করব”

ফোনটা ডিসকনেক্ট করে, চুল মেলে, খাটের ওপর নিজের ক্লান্ত দেহটাকে এলিয়ে দিল। ইট হ্যাস বিন এ লং ডে। টিডিয়াস শুট। ফেরার পথে দোকান থেকে মোমো কিনে এনেছে। ফ্রিজে সুপ আছে। মাইক্রোওয়েভে গরম করে নেবে। এ সময় ওজন বাড়লেই মুশকিল। হাতে এতগুলো ছবি। হলিউডের এজেন্ট মার্কের সঙ্গেও কথা বলেছে। কপাল থাকলে, লেগেও যেতে পারে।

শ্লথ পায়ে বেডরুমের বার থেকে ভডকা, ফ্রিজ থেকে তাজার বোতল আর বরফ নিয়ে ঘরে ফিরে এল। লোখান্ডওয়ালার এই ফ্ল্যাটটা হুট করে কিনে ফেলেছিল। এক এনআরআই তাড়াতাড়ি ফ্ল্যাটটা বিক্রি করতে চাইছিল বলে বাজার থেকে অনেক সস্তায় পেয়েছে। তখনও সিওর ছিল না মুম্বাইতে তার ফিউচার আছে কি না, যদিও ‘কভার স্টোরি’ টা হিট করেছে। না লাগলে, বিক্রি করে কলকাতায় ফেরত চলে যাবে। আফটার অল, লসে তো রান করবে না। মুম্বাইয়ের প্রপার্টি মার্কেট ব্যুমিং। এখনও তো বেশ কয়েকটা ছবি হাতে। লেগে গেলে এখানেই টাকা। ইন্টারন্যাশনাল ফেম। কলকাতায় কী সে সব আছে? স্বপ্নটা আকাশচুম্বী। ফাস্ট রানিং পোরশেতে যখন বসেছে, অ্যাক্সিলেটারে পা না রাখলেই বিপত্তি। বাই-লেনে সটকে যেতে পারে।

আমের রসে ভডকা মিশিয়ে খাওয়ার যে কী তৃপ্তি, টেম্পারেট দেশের লোকেরা কী বুঝবে? আহঃ... সারাদিনের ধকলের পর প্রাণটা জুড়িয়ে গেল। বেশ অনেকটাই খেয়ে ফেলল। আজকাল একটু-আধটুতে হয় না। কালকে আফটারনুন শিফট। দেরি করে উঠলেও চলবে।

বছর পাঁচেক আগের কথা। তখনও ইন্ডাস্ট্রিতে স্ট্রাগল করছে। গড়িয়ার নাকতালায় রাজাদিত্য এমনিভাবেই তাজা মিশিয়ে ভডকা এগিয়ে দিত। অ্যাডভাইস দিত কেরিয়ারের ব্যাপারে। তখন রাজাদিত্যর ছবি ‘মোমের বউ’-তে কাজ করছে। ফ্রেন্ড, ফিলসফার, গাইড রাজা। ইন্ডাস্ট্রির নাড়িনক্ষত্র শেখাচ্ছে, সঙ্গে অ্যাক্টিং। পারফেকশন কী করে অ্যাচিভ করতে হয় ওর কাছেই শেখা।

“বুঝলে দেওয়ালি, ইন্ডাস্ট্রিতে কোয়ালিটি সিনেমা না করলে টিকতে পারবে না। ইনস্ট্যান্ট সাকসেস উইদাউট কোয়ালিটি বেশিদিন ধোপে টেকে না...” কথাটা ভুল বলেনি। কোয়ালিটি না থাকলে, লং রানে টেকে না। আজও যে এগিয়ে চলেছে, তার মূলে রাজার অ্যাডভাইস। সি ইজ গ্রেটফুল টু হিম। বাট দ্যাট ডাসেন্ট মিন হি ক্যান কন্ট্রোল হার। শুনেছে আর্টিস্ট রিয়া ঘোষালও একদিন ওর খপ্পর থেকে পালিয়েছিল। সত্যি-মিথ্যে জানে না। পুরোটাই শোনা। রাজাদিত্যকে বিছানায় কম্প্যানি দেওয়া এক জিনিস, আর পুরো সত্ত্বাটাকে বন্ধক রাখা আরেক।

গ্লাসটা বেডসাইড টেবিলে নামিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া এসির হাওয়ায় ছুড়ে, নিজেকে নিয়ে খেলতে লাগল। দেয়ার আর এ ফিউ থিংস সি লার্নট ফ্রম হার কেরিয়ার ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি। আফটার এ হার্ড ডে ইউ নিড টু রিল্যাক্স, টু ফ্রেশেন আপ ফর ইয়োর নেক্সট ডেইজ ওয়ার্ক। টু রিল্যাক্স ইউ নিড এ ড্রিঙ্ক অ্যান্ড অ্যান অরগ্যাজম। বয়ফ্রেন্ড যখন নেই, সি নিডস টু কয়েঞ্চ হার লাস্ট অন হার অউন। এই অ্যাক্টিভ কেরিয়ারে বয়ফ্রেন্ড রাখার অনেক ঝক্কি। স্বাধীনতাই কেবল যায় না, ওয়ান্স দে নো ইউ আর হুকড, কন্ডিশনস ফর বেটার অফার নিয়ে অ্যাপ্রচ করতে অনেকেই দ্বিধা করে। ফ্রিডম অনেক বেশি ডাইভারসিটি দেয়। বিশেষ করে সে যখন হলিউডের স্বপ্ন দেখছে।

ভডকার স্টিমুলেশন, কি নিজের হাতের, জানে না। অরগ্যাজমটা ঝট করে এসে গেল। নেতিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিল। আহঃ... হোয়াট এ রিলিফ! পুঞ্জিভূত চাপা উচ্ছ্বাসকে মুক্তি দেওয়ার মধ্যে অন্য স্যাটিসফ্যাকশন। ঠিক স্যাম্পেনের কর্ক খুললে যেমন ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসে, সেলিব্রেশন। রাজাদিত্যর নাগপাশ থেকে বেরিয়ে তেমনই অনুভব করেছিল, রিলিফ।

দেওয়ালি ছোটবেলা থেকেই স্বতন্ত্র। কারও অধীনে থাকার মেয়ে নয়। বাবা চিরকালই বলত “যত পারিস আমার ওপর রোয়াব দেখিয়ে নে। যখন শ্বশুরবাড়ি যাবি, তখন সব রোয়াব ঠান্ডা হয়ে যাবে। মেয়ে হয়ে জন্মেছিস। মেনে নিতে শেখ...” পারেনি।

টিপিক্যাল বাঙালি শ্বশুরবাড়ির কথা এখন আর ভাবতেই পারে না। এমনিতে খারাপ ছিল না রাজা, তবে রোগ একটাই। ইনহেরেন্ট নেচার অফ অথরিটি। ইন্ডাস্ট্রিতে নতুন দেওয়ালিকে গ্যেজ করতে পারেনি। যদি শোনা কথা সত্যি হয়, তবে রিয়া তো সেভাবে দেওয়ালির মতো সাকসেসের সিঁড়ি বাইতেও পারেনি। যে কারণেই হোক, সেও তো জাল ভেঙে বেরিয়ে গেছে। হয়ত তখনও নভিস বলেই মেনে নিয়েছিল। কিন্তু দেওয়ালি তো রিয়া নয়, অন্য ধাতুতে গড়া। অস্বীকার করে লাভ নেই। তার উত্তরণ কাজ দিয়েছে। অজান্তে এই সার্বিক নির্ভরতার জাল ছেড়ে বেরবার ইন্ধন জুগিয়েছে।

এখন আর রাজাদিত্যের সঙ্গে যোগাযোগ নেই। তবুও সেদিন যখন দেখা করতে চাইল, পুরনো দিনের কথা মনে করে, বালি থেকে ফেরার পর কথামত দেখা করেছিল। নাকতলার বাড়িতে নয়, নিজের ফ্ল্যাটেও নয়, প্রিন্সটন ক্লাবের ডিসক্রিট লাউঞ্জে।

“আবার পুরনো সম্পর্কটা ফিরিয়ে আনা যায় না” চায়ে চিনি মেশাচ্ছিল রাজাদিত্য।

“রাজাদা, এখন তো আমার সে টাইম নেই। কলকাতা-মুম্বাই মিলে, হাতে সময় কম”

“তুমি আমায় ভুল বুঝছ। মানে ফ্রেন্ডশিপটা”

“সে তো সব সময়ই আছে। আমি অতীতকে ভুলি না রাজাদা। তোমার কোনও কাজে আমায় নিশ্চয়ই পাবে। যদি ফিউচারে কোনও ছবি কর, নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে কাজ করব”

“থ্যাংকস। আপাতত হাতে নেই, প্রডিউসার পাচ্ছি না”

“যদি কখনও পাও, ভাল স্ক্রিপ্ট থাকলে বোলো” দেওয়ালি ম্যাচিওরড, প্রফেশনাল।

“তোমার তো এখন অনেক কন্ট্যাক্টস। কোনও প্রডিউসারের কাছে আমার নাম রেকমেন্ড করতে পারবে?”

“প্রডিউসাররা কী চেনা লোকেদের কথায় ইনভেস্ট করে, ওদের নিজেদের ইকোয়েশনে ছাড়া। যোগ-বিয়োগটা ওদের বুঝতে হয় আমাদের থেকে বেশি”

“তবুও...”

“কথা উঠলে নিশ্চয়ই বলব”

“থ্যাংকস” রাজাদিত্য বুঝতে পারছিল, ভদ্রতার আড়ালে দুজনের মধ্যে বিরাট একটা কাচের দেওয়াল। একজন সাকসেসফুল হিরোইন। আরেকজন পরিচিত কোয়ালিটি ডিরেক্টর হলেও, ডিসকোয়ালিফায়েড।

মাঝে মাঝে একান্তে এক অজানা ভয় গ্রাস করে। এই নাম টাকা সাকসেস যদি একদিন চলে যায়, নিতে পারবে? বিশেষ করে রাজাদিত্যের মতো কোয়ালিটি ডিরেক্টর যখন সাইডলাইনে চলে যায়, তখন সেও তো এভাবে যে কোনওদিন। খ্যাতিরও ইতি আছে। তাই দুটো ফর্মেই হিসেব করে এগোবার চেষ্টা করছে।

অরগ্যাজমের নিবৃত্তি হয়েছে। সাময়িক আরাম। ভডকায় সিপ। স্টারডমও ঠিক অরগ্যাজমের মতো। ক্ষণিকের আনন্দ। তৃপ্তির নিরসন হতে কতক্ষণ? তারপর? পুরনো স্মৃতি আঁকড়ে বসে থাকা। এই বিপুল পৃথিবীর অন্ধকারে জীবনের সার্থকতা খোঁজা চাই। কে জানে? কোনদিন সেই স্ফুলিঙ্গ দাবানল হয়ে ছড়িয়ে পড়বে কোনও এক প্রান্তে। সেদিন হয়ত সে থাকবে না সাধারণ পরিধির চিন্তাধারায়।

সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স মারফত উত্তরসূরি রেখে যাওয়ার মধ্যে প্রপাগেশন অফ জিন-এর বহিঃপ্রকাশ। অমরত্ব লাভের ব্যর্থ প্রচেষ্টা। উত্তরসূরির সংকীর্ণ চিন্তাধারার বাইরেও তো অনেক দিক আছে। অস্তিত্ব যখন পাকাপাকিভাবে মননে ঠাঁই নেয় তখনই বৃহত্তর পরিমণ্ডল আকৃষ্ট করে।

নেশা ক্রমশ গাঢ়। মোমও আর সুপ গরম করে খেয়ে নিল। অন্ধকারে পর্দাটা ফাঁক করে আকাশের দিকে চেয়ে রইল। ঠিক যেমন রাইম পড়তে পড়তে, চেয়ে থাকত... হাউ আই ওয়ান্ডার হোয়াট ইউ আর...

নিঝুম অতিকায় শহর। এসির হিমেল ছোঁয়া নগ্ন দেহের প্রতিটা কোষে। বাহ্যিক স্বস্তিও ভেতরের আলোড়ন থামাতে অক্ষম। অস্থির শিহরণ বা কম্পন, নাকি জাগরণ?

অন্ধকারের বুকে অনেক নক্ষত্র। নামগুলো ঠিক মনে নেই। সাতাশটা। ছোটবেলায় মা যখন জ্যোতিষের কাছে নিয়ে যেত, ওদের মুখেই শুনেছিল। বহু আলোকবর্ষ দূরের সেই তারাগুলো নিশ্চয়ই গতিশীল।

এই দুনিয়ায় সবাই এক-একটা নক্ষত্র। সেও ওদের মতোই আরেকজন। খুঁজছে... কিছু একটা... কক্ষপথ... সরলরেখায়, যদিও বৃত্তাকার।

অব্যক্ত উচ্ছ্বাস অরগ্যাজমের চেয়েও ভয়াবহ। মোচড় দিয়ে উঠছে বুকটা। ইচ্ছে হচ্ছে, দুটি সুডৌল মাংসপিণ্ড সরিয়ে তাকে মুক্তি দেয়। কিন্তু রক্ত মাংসের খোলসটাই বাধা। চাঁদের আলোর ফিকে রেশটাও ওই মুচড়ে ওঠা বুকে আলো ছড়াতে পারছে না। শুধু লুকোচুরি খেলছে।

আঠারো

ওদের মধ্যে বসে ঋষিকা অস্থির হয়ে উঠছে। ওরা এখন গেঁড়ে বসেছে। সহজে উঠবে বলে মনে হয় না। ফুড অ্যান্ড ড্রিঙ্কস অন দ্য হাউস। কার্টসি রাজ নেওটিয়া। ফুডের পালা কখন শেষ হয়ে গেছে। ফোকটে ড্রিঙ্কস, কেউ ছাড়ে? অঞ্জনদা, অভিজিৎ দুজনেই তো সমান।

খাওয়া শেষ। তাজ বেঙ্গলের দ্য জাংশনে ম্যাকলাকান সিঙ্গল মল্ট নিয়ে বসেছে। খাওয়ার সঙ্গে দু গ্লাস দামি হোয়াইট ওয়াইন খেয়ে ফেলেছে। ওর পক্ষে, এটাই যথেষ্ট। কী যেন নাম বলল? গেউটজট্রেমিনার, ফ্রান্সের হোয়াইট ওয়াইন। কোন্নগরের মেয়ের কী এসব বিদেশি নাম মনে থাকে? না আগে কখনো শুনছে?

নেহাৎ এখন দুর্জয়ের কারুণ্যে রূপজিৎ-এর পেছন থেকে তদবিরে, খবরের কাগজে মাঝেমধ্যেই ছবি বেরয় বলে 'সেলিব্রিটি'র আখ্যা পেয়েছে। তাই তো শিল্পপতি রাজ নেওটিয়ার এসব সাংস্কৃতিক পার্টিতে গান গাইবার ডাক পায়। নইলে যতদিন অভিজিতের লেজুড় হয়ে ঘুরত, কেউ কী পুঁছত? অরিজিৎদা ব্যঙ্গ করে 'ছেলেবৃত্তি'। বাচাল লোকটাকে কিছু বলতে পারে না। অসময়ে অনেক সাহায্য করেছে।

বেলভিউ থেকে ফেরার পর এতদিন বাদে অভিজিৎ বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। ডাক্তার সার্টিফাই করেছে, কার্ডিয়াক সিচুয়েশন আন্ডার কন্ট্রোল। চুপচাপ ওদের মাঝে বসে বোর হয়ে যাচ্ছে।

ঋষিকাকে ছটফট করতে দেখে অভিজিৎ বলল "তুমি চলে যাও। আমি অঞ্জনদার সঙ্গে পরে যাব"

"তোমাকে একা ছেড়ে?"

"অঞ্জনদা তো আছে। ফেরার পথে নামিয়ে দিয়ে যাবে"

ইতস্তত করছিল। তারপর মনে হল, কতক্ষণ এভাবে চুপ করে বসে থাকবে? ওদের কী শেষ করার কোনও টাইম আছে?

"কোনও অসুবিধা হলে ফোন করে দিও। গাড়ি নিয়ে যাচ্ছি"

"চিন্তা করো না। উই আর জাস্ট ফাইন" অঞ্জনদার আশ্বাস।

ঋষিকা চলে যেতে অভিজিৎ যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। অঞ্জনদার সঙ্গে অনেক কথা আছে। একটু পরে রাজীবও এসে যোগ দেবে। এই পুরুষদের মেহফিলে ঋষিকা সত্যিই বাড়তি। না থাকলেই বরং ভাল, মন খুলে কথা বলা যাবে। ও এসব বোঝে না। খালি পেপারে ছবি বেরলেই খুশি। রূপচর্চা আর স্তাবক নিয়ে পড়ে থাকে। অভিজিতের বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই এসবে। স্টার হবে। সেলিব্রিটি হবে। পঞ্চম থেকে নবম কবির গানের প্যাকেজ দিয়ে বাজার ধরবে।

কেন? অভিজিতের সঙ্গে থাকলে কী ক্ষতি হত? উস্কানির পেছনে ওর মায়ের প্ররোচনা না থাকলে কী এসবে নামত? জাহান্নামে যাক। খালি সোশালি বউ হয়ে থাকলেই হল। ফান্টুস তো আয়ার কাছে মানুষ হচ্ছে। কতটুকু সময় দেয় ছেলেটার জন্য? পেছনে ওই লেডিস মার্কা পোঁ জুটেছে, দুর্জয়। যেখানে যায়, ঋষিকাকে বগলদাবা করে নিয়ে যায়। সে নর্থ অ্যামেরিকান বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন হোক, আর ইন্দ্রিজিতের জলাপাহাড়ের বাংলো হোক। সবকিছু ঋষিকা না বললেও, খবর ঠিকই পেয়ে যায়। ভাগ্যিস ছেলেটা হোমো। নইলে ঋষিকাকে নিয়ে চিন্তায় থাকত।

রাজ নেওটিয়া তো সচরাচর এরকম পার্টি দেয় না। খাওয়া-দাওয়া মাল যখন ফোকটে, মেক হে হোয়াইল দ্য সান সাইন্স। অঞ্জনদা ভাল করেই জানে। সেলিব্রিটি হাওয়ার প্রথম ক্রাইটেরিয়া, অন্যের পকেট ভেঙে খেয়ে তাকে ধন্য করা, তাতে উভয়েরই স্ট্যাটাস বাড়ে। এসব ব্যাপারে অঞ্জনদা সিদ্ধহস্ত, বিগ বস। ওর কাছে অভিজিৎ এখনও শিশু।

"আরেক পেগ?" বেয়ারাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অঞ্জনদা অভিজিতের দিকে তাকাল।

"ডবল। তোমার ড্রাইভার আছে তো?"

"ভাবলে কী করে, মাল খেয়ে গাড়ি চালাব। এমনিতেই আমি গাড়ি চালাই না। মা মারা যাওয়ার পর আমার ওখানেই থাকে। রাতবেরাতে ফিরতে দেরি হলে ট্রেন পাবে কোত্থেকে?"

"কোথায় থাকে?"

"সুভাষগ্রাম। যখন থাকে না বা ছুটির প্রয়োজন হয়, শোভনের কাছ থেকে গাড়ি চেয়ে নিই। কত চাইব বল? মায়া তো সব সময়ই ওর গাড়িই ইউজ করে। সবাই যদি প্রত্যেকদিন চায়, দেবে কোত্থেকে? তোমার কী ড্রাইভার আছে?"

"আছে, তবে রাতে কথাও বেরলে ঋষিকাই ড্রাইভ করে। রাস্তা ফাঁকা, ম্যানেজ করে নেয়"

কথা শেষ না হতেই অঞ্জনের ফোন বেজে উঠল "সেদিন ফোন করেছিলাম। ফোন ব্যাক করলেন না তো"

"টাইম পাইনি। আমি এখন তাজে একটা ইম্পরট্যান্ট মিটিং-এ আছি। বাড়ি ফিরেই আজ ফোন করব। পসিটিভ"

"ঠিক? এটা আর্জেন্ট, আগেও বলেছি"

"বললাম তো পসিটিভ। ইউ ক্যান কাউন্ট মাই ওয়ার্ড"

অভিজিৎ লক্ষ করেছে, অঞ্জনদার হুইস্কির মাত্রা যত বাড়তে থাকে, তত বেশি ইংরেজি বলতে শুরু করে। এক সময় ইংরেজির অধ্যাপক ছিল তো। অভ্যাসটা অগোচরে আত্মপ্রকাশ করে।

ফোন ডিসকানেক্ট করতে বলল "কে?"

"আরে ইমা, প্রোগ্রাম চাইছে। কোত্থেকে প্রোগ্রাম দেব বলত? এই পঞ্জি স্ক্যামের পর সব স্পন্সারশিপ শিকেয় উঠছে। প্রোগ্রাম আসবে কোত্থেকে? ওই শোভন যেটুকু স্পন্সর করে। সারাক্ষণ পেছনে ঘ্যানঘ্যান করে যাচ্ছে"

"ওর আর কী দোষ? সব প্রফেশনল আর্টিস্টদের তো একই অবস্থা। আমাদের সব প্রোগ্রাম বন্ধ হয়ে গেছে। নেহাৎ প্রতি বছরের শেষে চেনা জনের কাছ থেকে আমার নাটকের ইয়ারলি থ্রি-ডে প্রোগ্রামের টাকা উঠে আসে বলে এখনও চালিয়ে যাচ্ছি"

"তোমার আর কী চিন্তা? প্রফেসারি কর। বউ এধার-ওধার ফাংশন করে কিছু কামিয়ে নিচ্ছে। আইডিয়াটা ভাল বার করেছে পঞ্চকবির গান। কে দিল? তুমি?"

"নাঃ, ওর মাথা থেকেই বেরিয়েছে"

"ইমার তো রবীন্দ্রসংগীত ছাড়া কোনও অল্টারনেটিভ নেই। কিছু ফোক গায় বটে, কিন্তু শুভজিতের মতো এস্ট্যাব্লিসড তো নয়। চোখে এখন সরষে ফুল দেখছে"

ওদের কথার মাঝে রাজীব ঢুকে বলল “আজ আর বসতে পারব না। রুমকি ফোন করেছিল, পেট ব্যথা করছে। বোধহয় খাওয়া থেকে। কেটে পড়ছি। তোমরা চালিয়ে যাও”

দ্য জাংশন-এর অপর প্রান্তে গিয়ে, ফিরে বলল “অভিজিৎদা তোমার আগের বইটা লাইব্রেরিগুলোতে পাঠিয়ে দিয়েছি। নেক্সট আর কিছু লিখছ?”

“লিখছি, এখনও কমপ্লিট হয়নি। হলে জানাব”

রাজীব জানে যদ্দিন শোভন আছে, সিরিয়াস বই ছাপাবার টাকার অভাব হবে না। বিক্রি না হলেও মিত্র ভারতীর গ্ল্যামার বাড়ে। কলেক্টরস আইটেম। যখন অঞ্জনদাকে বড়বাজার থেকে বার করে দেয়, তখন শুধু অঞ্জনদারই নয়, ওরও খারাপ দশা। এতদিনের হাউসটা তখন ধুঁকছে। পলিটিক্যাল রিসাফলের পর শূন্যে ঝুলছিল। ধীরে ধীরে, বুদ্ধি খাটিয়ে, সেই অবস্থা থেকে বার করে এনেছে। আফটার অল, বালিগঞ্জ সাইন্স কলেজের ছাত্র, ঘটে একটু তো বুদ্ধি আছে।

“কাটি” রাজীব বেরিয়ে গেল।

অঞ্জন বেয়ারাকে ইশারা করল “ডবল, দুজনের জন্য”

তাজের বাইরে ভ্যালেটের গাড়ি আনার অপেক্ষা করতে গিয়ে ঋষিকার মনে হল, অভিজিৎ আর অঞ্জনদা যে ভাবে জাঁকিয়ে বসেছে, মনে হয় না, ঘণ্টা দুয়েকের আগে বেরবে। অন্তত যতক্ষণ না, বার বন্ধ হয়ে যায়। দেখাই যাক না কেন, রূপজিৎ কোথায় আছে “কোথায়?”

“আজকের লেখাটা জমা দিয়ে অফিস থেকে বেরচ্ছি। তুমি?”

“তাজ বেঙ্গল থেকে বেরচ্ছি। তোমায় বাড়িতে নামিয়ে দিতে পারি...”

ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে রূপজিৎ বলল “তোমায় এদ্দুর আসতে হবে না। আমি মেট্রো করে রবীন্দ্রসদন স্টেশনে চলে আসছি। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকব”

গাড়িতে বসে মনে হল, এই সম্পর্কের মায়াজালে কোনটা আসল আর কোনটা মেকি, সেটাই তো বুঝে উঠতে পারল না। বাষ্পীয় সম্পর্কে সাংসারিক ঘেরাটোপ পেরিয়ে, মুহূর্তটাই বোধহয় পাওয়া। বেশি কিছু আশা করার মানেই হয় না। আজ যা সত্য, কালকে ধোঁয়াশার চাদরে মোড়া হতেও পারে।

ফাঁকা রাস্তা। শুধু টার্ফ ভিউর সামনে ট্র্যাফিক লাইটে কিছুক্ষণ। রবীন্দ্রসদন ছাড়িয়ে ডান দিকে বাঁক নিয়ে প্রতীক্ষা।

“অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছ? হেঁটে মেট্রো ধরতে যেটুকু সময়” রূপজিৎ পাশের সিটে বসে বলল “সোজা মুদিয়ালি হয়ে আনোয়ার শাহ রোড ধরলে এই সময় মিনিট পনেরোর বেশি লাগবে না”

উত্তর না দিয়ে রাস্তার ট্র্যাফিকে মনোনিবেশ করল ঋষিকা। দিনে এই রাস্তায় চালাতে সাহস করে না। রাত বলেই সাহসটুকু পায়। জীবনেও, রাত অনেক বেশি সাহস জোগায়।

ফ্ল্যাটের আলোটা জ্বালিয়ে রূপজিৎ বলল “তুমি প্রিপেয়ারড হয়ে নাও। আমি বাথরুম থেকে আসছি। বড্ড হিসি পেয়ে গেছে”

ঠিক যেমন বাচ্চারা বলে। হাসি পেল ঋষিকার। রূপজিৎ যখন মুখহাত ধুয়ে হিসি করছে, শাড়ি জামা ব্লাউজ ব্রা ওয়ার্ডরবে পরিপাটি করে সাজাতে গিয়ে ফ্লাশের শব্দে বুঝল, এবার বেরবে। খাটের ওপর নগ্ন

শ্যামলা দেহটাকে এলিয়ে, বসে রইল ওর প্রতীক্ষায়...

মুখ থেকে বুক। চুমুতে ভরিয়ে দিচ্ছে ঋষিকার ঊর্ধ্ব থেকে নিম্নাঙ্গ। এই যৌবন, এই আবেগ, এই উচ্ছ্বাসের জন্য সে হা পিত্যেস করে বসে থেকে, রূপজিতের প্রতীক্ষায়। অভিজিতের সঙ্গে বয়সের পার্থক্যটা এত না হলে সম্পর্কের মাধুর্যটা আরও গাঢ় হত। উচ্ছ্বাস কদ্দুর, বলা যায় না। অন্তত রূপজিতের মতো কখনোই নয়।

প্রত্যেক মধ্যবয়স্কা মহিলারই কমবয়সী ছেলের সঙ্গে শারীরিক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্তত যৌবনকে সতেজ সজীব রাখতে। নইলে মানসিক ভারসাম্য আটুট রাখা মুশকিল। বিশেষ করে মেনপজ এগিয়ে এলে। কথাটা সামাজিক সংস্কারের বাইরে হলেও সত্যি। ক্ষয়িষ্ণু চাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে একান্তই জৈবিক। কোথায় যেন জীবনের নতুন ঘ্রাণ খুঁজে পাওয়া যায়।

বিষ? সে তো সামাজিক কাঠামোয় তোতার বুলি।

অমৃত? যে স্বাদ না পেয়েছে জানবে কী করে? সেই অমৃত আস্বাদন করছে, উত্তেজিত রোমশ দেহের স্পর্শে, ছন্দে, গীতিতে, আবেগে। যতক্ষণ না ঝর্নার প্লাবনে ভেসে যায় কিছুদিনের না পাওয়ার ক্লান্তি।

সেখানেই মুক্তি...

সেখানেই তৃপ্তি...

সেখানেই আগামীর প্রেরণা...

বেঁচে থাকার সূক্ষ্ম সংগীত।

উচ্ছ্বাসের পরিপূর্ণ অবসাদে নেতিয়ে শুয়ে রইল কিছুক্ষণ। বাথরুমে ধুয়ে জামাকাপড় পড়ে নিল। রাত অনেক হয়েছে। অভিজিতের ফেরার আগেই বাড়ি ঢুকতে হবে।

চাবি খুলে ঘরে ঢুকতেই দেখল অভিজিৎ খাটে শুয়ে আছে। জামাকাপড় খুলে বাথরুমে ঢোকবার আগে অভিজিতের গলা “দেরি হল যে?”

“গাড়িটা মাঝপথে ট্র্যাফিক লাইটে স্টার্ট নিচ্ছিল না”

“শেষ পর্যন্ত নিল?”

“হ্যাঁ। লোকাল এক মেকানিক জাম্প স্টার্ট দিয়ে চালিয়ে দিল। বলল ব্যাটারির প্রবলেম আছে। ব্যাটারিটা চেক করিয়ে নিতে”

“তাই নিও। রাতে মাঝপথে গাড়ি থেমে যাওয়া আনসেফ। স্ট্র্যান্ডেড হয়ে পড়তে পার”

“কাল করিয়ে নেব”

ঋষিকা বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

অনেক রাত হয়ে গেছে। মাল খেয়ে এত রাতে ইমাকে ফোন করাটা ঠিক হবে কি না, ভাবছিল অঞ্জন। কথা যখন দিয়েছে, আর্জেন্ট কাহিনিটা শুনেই নেওয়া যাক।

“এই মাত্র ফিরলাম। ঘুম ভাঙালাম?”

“নাঃ, জেগেই ছিলাম। একটু ধরুন... বারান্দায় যাচ্ছি”

মিনিট খানেক। ইমা বলল “আমি প্রেগন্যান্ট”

“কী করে বুঝলে?”

“পিরিয়ড মিস করেছি। প্রেগন্যান্সি কিট এনে টেস্ট করে দেখেছি, পসিটিভ”

“ডাক্তার দেখিয়েছ?”

“না। আগে আপনাকে জানালাম”

“আমাকে জানাচ্ছ কেন? ডাক্তার দেখিয়ে নাও”

“কারণ ডেটটা যদি ভুলে গিয়ে না থাকেন, সেদিন থেকে হিসেব করলে পরিষ্কার হয়ে যাবে। ডাক্তারের কনফার্ম করার অসুবিধা হবে না”

মহা ফাঁপর। কলকাতার নামজাদা গায়িকা হওয়ার স্বপ্ন। সেলিব্রিটি হবে। হতে গেলে এসব একটু-আধটু করতে হয়, এটা তো জানা। প্রিকশন না নিয়ে কী সেলিব্রিটি হওয়া সাজে? যেন ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানে না। ন্যাকা... মাঝরাতে আদিখ্যেতা। শুনলেই পিত্তি জ্বলে যায়। ম্যাকলাকানের মেজাজটাই নষ্ট করে দিচ্ছে। এই মেয়েগুলো নেশার মর্মটুকুও বুঝতে শেখেনি। যত সব ন্যাকামি। মেয়ে হয়ে জন্মেছ, একদিন না একদিন প্রেগন্যান্ট তো হতেই হবে। এতে টেনশন করার কী আছে? বিয়ে হলে বাচ্চা পয়দা করে ঘর-সংসার কর। নইলে খালাস করিয়ে আবার স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফেরত এস। রাতবেরাতে নেশা ভাঙানোর কী আছে? এই চুয়াত্তর বছরের জীবনে কী কম মেয়েকে প্রেগন্যান্ট করেছে? নিজেও হিসেব ভুলে গেছে। মেয়েদের প্রেগন্যান্সির হিসেব রাখতে গেলে তো এবার থেকে ছোটদের গল্প লিখতে হবে। সারা জীবন বিয়ে না করেই নারীর যৌনতা বিক্রি করে কাটিয়ে দিল, এখন কি না বুড়ো বয়সে বসে ছোটদের ছড়া লিখবে! নিকুচি করেছে প্রেগন্যান্সির। চুলোয় যাক মাঝরাতের ব্যভিচার। পুরুষ মাত্রই তো এসব করবে। এটাই পুরুষের ধর্ম। এটাই পৌরুষ।

“পিল খাওনি?”

“ফাংশনের ছোটাছুটিতে ভুলে গেছিলাম”

“কী আর করা যাবে। কালকে আমার চেনা গায়েনকলজিস্টের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দিচ্ছি। অ্যাবর্শান করিয়ে নাও, ব্যস। এতে এত টেনশনের কী আছে?”

“আগে তো কখনো প্রেগন্যান্ট হইনি, এই প্রথম” ইমার গলা কাঁপছে।

“সব মেয়েকেই একদিন প্রেগন্যান্ট হতে হয়। কেউ বাচ্চা রাখে, কেউ খালাস করিয়ে এগিয়ে চলে। ডোন্ট ওয়ারি, কাল সব বন্দোবস্ত করে ফোন করব। এখন অনেক রাত, ঘুমিয়ে পড়ো”

“এই প্রেগন্যান্সি নিয়ে কী ঘুম আসে?”

“তো শুয়ে শুয়ে নাগরের স্বপ্ন দেখ। এর বেশি আমি আর কী করতে পারি? লাইনে নেমেছ, সেলিব্রিটি হতে চেয়েছ, সব করে দিয়েছি। নইলে কোথায় থাকতে? পাড়ার ছোটখাটো ফাংশনে গান গাইতে আর মাস্টারি করতে। দেয়ার ইজ এ প্রাইস ফর এভ্রিথিং। এটা তো মিনিমাম প্রাইস” ফোনটা কেটে দিল অঞ্জন। অনেক রাত হয়েছে। নেশার আমেজটা নষ্ট করাই বোকামি। খাটে শুয়ে সুখটান দিয়ে আমাজটাকে উপভোগ করছে। আহাঃ... এ জন্যেই তো সংস্কৃতি জগতের অলিখিত কর্ণধার হওয়া। এরকম কত ইমা এল, গেল। তাতে আর যারই হোক, অঞ্জনের কিছু হওয়ার নয়।

অঞ্জন ফোনটা কেটে দিতে, বারান্দায় দাঁড়িয়ে, আকাশের দিকে চেয়ে রইল ইমা। অন্ধকার আকাশে, ওই যে তারাগুলো জ্বলছে, ওদের মতোই কী হতে চেয়েছিল ইমা? পৃথিবীর চৌহদ্দির মধ্যে দাঁড়িয়ে অন্ধকারের মধ্যে তারা ধরার চেষ্টা। না কি, হওয়ার? হাজার হাজার তারাদের মতো, নিজেও আর একটা। তারারা তো স্বপ্ন-পাড়ের রূপের প্রতীক। বাস্তবে কী তাদের ছোঁয়া যায়? না পাওয়া যায়? না কি, ওদের মতো হওয়া যায়? এতদিন ধরে স্বপ্নটাকে বাস্তবে আনতে চেয়েছে। বুঝতেও পারেনি, স্বপ্নের আঁতুড়ঘর থেকে বাস্তব অনেক অনেক অনেক দূর।

ছিটকে যাওয়া বহুদূরের তারার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে বুকটা মোচড় দিয়ে উঠছে। কান্নাটা গলার কাছে এসেও বেরতে পারছে না। হাঁসফাঁস করছে, এই তারকা হওয়ার নেশায় রুদ্ধ কারাগারে। উল্লাস, উচ্ছ্বাস থেমে গেছে। হঠাৎ হাজার লোকের হাততালি, অট্টহাসি পালটে গেছে। রয়েছে পরিহাস, বিদ্রুপ করছে তার সরল মূর্খতায় আবদ্ধ ভাবনাকে।

তার প্রথম সন্তান। যারই উন্মাদনায় হোক না কেন তার ঔরসে নারীত্বের পূর্ণতা কেবল মাত্র আজ রাতের মেহমান। ঈশ্বরের দান। বিদায় নেবে কাল অথবা পরশু, ইহলোক থেকে, তাকে অপূর্ণ রেখে। ভ্রূণর মধ্যে তো তারই জিন। তারই আমির পূর্ণতর বিকাশ। সেখানেই সে প্রোজ্জ্বল নিজ মহিমায়। ওই তারাদের মধ্যে তার কোনও জায়গা নেই। আছে স্বপ্ন ছেড়ে বাস্তবের বারন্দায়। যেখানে সে এখন দাঁড়িয়ে।

এই বাস্তবের মেঝটাই তো তার পৃথিবী, তার আসল ঠিকানা, তার নারীত্ব, মাতৃত্বের পূর্ণতা, তার অপ্রকাশিত আমি। সেখানেই সে সব থেকে বেশি উজ্জ্বল। ওই দূরের তারাদের ভিড়ে নয়।

উনিশ

"কংগ্র্যাচুলেশনস"

ফোনের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। টুইটার, ফেসবুক, লিঙ্কডিনে শুভেচ্ছা। ন্যাশেনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে শৌভিকের ছবি 'অঙ্গার'। খবরটা দাবাগ্নির মতো ছড়াচ্ছে। মিডিয়ার ফোন, বন্ধুদের শুভেচ্ছা। অভিবাদনে ভেসে যাচ্ছে শৌভিক, বহ্নি। সেন্সেশন, অনেকদিন পর বাংলা ছবি ন্যাশনাল ক্যাটাগরিতে স্বীকৃতি পেল। কংগ্র্যাচুলেশনের উচ্ছ্বাসে ভেতরে একটা চাপা কান্না জমাট বেঁধে আনন্দের ভাগীদারি থেকে বঞ্চিত করছে ওদের। উচ্ছ্বাসে ভাগ নেওয়ার মতো মুখ নেই। আসলটা ওরা কেউ জানে না। একমাত্র দুজনে।

"তোমার কৃতিত্বে জয়জয়কার" ফোনের ফাঁকে গরম চা এগিয়ে দিল বহ্নি।

"কৃতিত্ব! মাই ফুট" কাপটা হাতে নিয়ে বলল "কৃতিত্ব একটাই, বউকে ওই ওল্ড হ্যাগারডের বিছনায় এগিয়ে দেওয়া। বিজিত অনেক লাইন মেরেছিল। অ্যাওয়ার্ড-এ বোধহয় সব লাইনই মার খেয়ে যায়। মহিলার থেকে বেস্ট বেট আর কী কিছু আছে?"

"দিস ইজ লাইফ। দিস ইজ হাউ দ্য ওয়ার্ল্ড মুভস। যে দেবতার যে পূজা" চিনিটা নেড়ে বহ্নি বলল "ক্রুড অ্যাস ইট মে সিম, দিস ইজ রিয়ালিটি। লাইক ইট অর নট"

"লাইক ডিসলাইকের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। দুজনেই এগ্রি করে নেমেছি। ছবিটা এতগুলো অ্যাওয়ার্ড পাবে ভাবিনি"

"ছবিটা খারাপ করনি, ফাইন্যাল টচটুকু বাকি ছিল। বউ হিসেবে, সেটুকুই দিয়ে দিলাম। ইউ ডিসার্ভ ইট ইন ইওর ওন রাইট" শৌভিককে মরাল বুস্ট দেওয়ার চেষ্টা। এত বছর ঘর করছে। লোকটাকে হাড়ে হাড়ে চেনে। যদিও ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে বড় কিছু করার কেপেবিলিটি নেই। লোকাল এরিনাতে অন্যদের চেয়ে ভাল। পুরুষোত্তম ঘোষ যদিও ভীষণভাবে বিজিতকে ব্যাক করার চেষ্টা করেছিল। এমনকী জুরি পালটে ওর সিনেমাকে ফোরফ্রন্টে আনতেও। কিন্তু চ্যাটার্জি সাহেব ঝানু মাল। সে রাতে যে খেলা সে খেলেছে, সেটা অঙ্কের ইকোয়েশন উলটে দেওয়ার পক্ষে কাফি। হোয়েন অ্যান এজুকেটেড লেডি রিসর্টস টু হোরডম, দ্য প্যারামিটারস আর ডিফারেন্ট।

যাদবপুর ভারসাস প্রেসিডেন্সি। ফিমেল ভারসাস মেল। কোয়ালিটি ওভার গ্রুপিজম। যত গ্রুপবাজিই করুক না এখানে, উইথ রাইট পলিটিক্যাল কানেকশনস, হি কান্ট মেডেল উইথ শৌভিক হিয়ার। স্ট্রেঞ্জ। শৌভিক একবারও জানতে চায়নি সেই রাতের কথা। হয়ত বিবেক থেকে মেনে নিতে পারেনি। বহ্নিও কিছু বলে ওকে আরও অপ্রস্তুত করতে চায়নি। এতটা আশা করেনি। বুড়োর আশির ওপর বয়স। হলে কী হবে? এখনও পুরদস্তুর চাঙ্গা। সেটা ভায়াগ্রার জোরে, না নিজ গুণে, বোঝবার যো নেই। যখন মানসিকভাবে প্রস্তুত, তখন ভেবে কী হবে? বরং পরিণতিটাই বেশি ভাবার।

মুম্বাই-এর সুসজ্জিত বিলাসবহুল ফ্ল্যাটে পরের দিন সকালে ওনাকে চায়ের কাপটা এগিয়ে দিয়ে বলেছিল "হবে তো?"

"ছবির নাম 'অঙ্গার' তো?"

"হ্যাঁ"

"গ্যারান্টি দিতে পারছি না। চেষ্টা করে দেখি"

কাজটা সহজ নয়, নিজেও জানে। বিশেষ করে, সে যখন কমিটির চেয়ারম্যান। নিজে থেকে তদবির করতে গেলে, বদনাম হয়ে যাবে। জুরি ঠিক হয় মিনিস্ট্রি থেকে। পলিটিক্যাল ইনফ্লুয়েন্স খাটাতে গেলে হিতে বিপরীত হতে পারে। সহজ উপায়, যে সমস্ত জুরি ভিন্ন মতামত দিতে পারে, তাদের ফোন না করা। প্রশ্ন করলে, অফিস থেকে উত্তর যাবে 'অনেক চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি'। অবশিষ্ট যারা রইল, তাদের নিজের ইচ্ছেটা আকারে ইঙ্গিতে জানিয়ে রাখা। চেয়ারম্যানকে কেউ চটাতে চায় না। তার ইচ্ছেতে সায় দেওয়া, আশা করাই যেতে পারে।

অঙ্কের পরিপ্রেক্ষিতে 'অঙ্গার' পুরস্কৃত, সম্মানিত, বন্দিত।

"হতাতালি পেতে কার না ভাল লাগে? তবে যেভাবে ক্যাশ ক্রাঞ্চে প্রডিউসাররা হাত গুটিয়ে নিচ্ছে, সেখানে পুরস্কার হয়ত ইন্ধন যোগাতে পারে, ফর ফারদার ইনভেস্টমেন্ট" চায়ের কাপটা নামিয়ে বলল।

"এইট্টিজ অ্যান্ড নাইন্টিজ-এর স্ট্রাগলের দিনগুলো এখনও ভোলনি"

"তখন ইয়াং ছিলাম। জিল অনেক বেশি ছিল। বয়সটাও তো বাড়ছে। এই বয়সে আউট অফ ওয়ার্ক হলে, ফাইন্যানশিয়াল স্টেক তো আছেই, মেন্টাল সেটব্যাকটাও কম নয়"

"তোমাকে সেটাই বেশি করে ভাবাচ্ছে। রাখে কৃষ্ণ মারে কে, মারে কৃষ্ণ রাখে কে?"

আবার ফোন বেজে উঠল "কংগ্র্যাচুলেশনস। শুনে যা আনন্দ হচ্ছে না" বিজিত প্রশংসায় পঞ্চমুখ। পুরুষোত্তম ঘোষের পলিটিক্যাল লবি স্ট্রিং থাকলেও, সেন্ট্রাল-স্টেটের সাময়িক টানাপোড়নে, এখনও পুরপুরি

ফাংশনাল নয়। তাই তাকে ধরে পুরোটা ম্যানেজ করতে পারেনি। শৌভিকের পলিটিক্যাল পেট্রনেজ ছাড়াও অ্যাডিশনাল তুরুপের তাস বহ্নি। সেখানেই আপার হ্যান্ড।

“তুমিও খুব ভালই করেছিলে। ইটস জাস্ট এ ম্যাটার অফ লাক। আমারা যারা ছবি করি, সেটাই তো সব থেকে বেশি ইম্পরট্যান্ট। নয় কি?”

“যা বলেছ শৌভিকদা। স্টিল হন্যার ইজ এ হন্যার। নোবডি ক্যান ডিনাই দা ফেদার”

“নেক্সট টাইম, ইট উইল বি ইওর টার্ন”

ফোনটা রেখে বিজিত ভাবছে পুরুষোত্তমদার এত ক্যালকুলেটেড ছকে জ্যাকপটটা শৌভিক পেল কী করে? পুরুষোত্তমদা তো কম ধুরন্ধর নয়। নিজেও কয়েকবার অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে। ভেটারান লোক, খেলাটা ভালভাবেই জানে। অন্তত শৌভিকের থেকে অনেক ভাল। তাহলে কোন দাবার ছকে শৌভিক বাজি মাত করল?

তার লেটেস্ট ছবি ‘নিঃশব্দ’ বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়ার পর, প্রযোজক চামুণ্ডেশ্বরী ফিল্মস-এর নির্লিপ্ততা লক্ষণীয়। মনিকান্ত মোহতাকে নতুন স্ক্রিপ্ট নিয়ে কথাটা পাড়তেই বলল “জলদি কেয়া হ্যায়? অভি তো এক মুভি রিলিজ কিয়া। কলেকশন পুরা নেই হুয়া। অভি তো ইয়ে পিকচার কা ডিজিট্যাল রাইটস ভি নেহি সেল হুয়া...” স্পষ্ট কিছু না বললেও আকারে ইঙ্গিতে অনীহাটা প্রকট। ফ্লপ দিয়েছ। নেক্সট প্রোডাকশনের ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে ভাবতে হবে।

যদ্দিন ইয়ারের দোস্ত শুভ্রজিৎ মধ্যগগনে ছিল, তার কথার দাম ছিল। এখন সে গুড়ে বালি। শুভ্রজিতের হাতে সিনেমা নেই। ফিতে কেটে যা কামাবার কামাচ্ছে। আগে দু-দুবার প্রোডাকশন কম্প্যানি খুলে ফ্লপ করেছে। মাঝে সমর্পিতা থাকতে রিয়ালিটি শো ইভেন্টগুলো অরগ্যানাইজ করে টিকে থাকার চেষ্টা করলেও, সমর্পিতা চলে যাওয়ার পর তার কন্ট্র্যাক্টও বেহাত হয়েছে। এখন টেলিফিল্ম প্রোডিউস করে টিকে থাকার মরিয়া চেষ্টা।

ওর কথা এখন চামুণ্ডেশ্বরীর মনিকান্ত বা গজেন্দ্র শুনবে বলে মনে হয় না। এখন নিজেই পথ দেখতে হবে। তবু যদি অ্যাওয়ার্ড পেত, তাহলেও কনভিন্স করা যেত। সেটাও শৌভিক হাতিয়ে নিয়ে, জল ঢেলে দিয়েছে।

এই ছোট্ট কুয়োর মধ্যেই তো এদের বাস। সেখানে ঠেলাঠেলি, গুঁতোগুতি, মারামারি, খেওখেয়ি। শালা, বাইরে মিষ্টি ব্যাবহার। ভেতরে একে অপরকে লেঙ্গি মেরে টেক্কা দেওয়ার চেষ্টা। সেও দেখে নেবে। তার নাম বিজিত মুখার্জি। এক মাঘে শীত যায় না।

“শৌভিক একটা চটজলদি ইন্টার্ভিউ নেব। সবার আগে” সৈকতের ফোন।

“আমার তো এখন স্টুডিওতে গিয়ে ইন্টার্ভিউ দেওয়ার টাইম নেই ভাই”

“তোমাকে কোথাও যেতে হবে না। আমি নিজে ক্রু নিয়ে তোমার বাড়ি চলে আসছি। সঙ্গে বহ্নিরও নেব”

“এক মিনিট, বহ্নিকে জিজ্ঞেস করি” ফোনটা মিউট করে জিজ্ঞেস করল “সৈকত বাংলা টিভি থেকে এখন আমাদের দুজনের ইন্টার্ভিউ নিতে চাইছে। হ্যাঁ বলব?” মাথা নাড়ল বহ্নি।

“ঠিক আছে। চলে এস। কতক্ষণ লাগবে?”

“ম্যাক্সিমাম হাফ অ্যান আওয়ার”

সৈকতের অন্য ছক। ফিল্ম ডিরেক্টর হিসেবে ছাইপাঁশ যাই করুক না কেন, আকাল দেখছে। বিজিতের ফ্লপ বিশেষ করে ভাবাচ্ছে। আগের ছবিতেই বাংলা ধূর্জটি টাকা ঢালতে গাঁইগুই করছিল। ফিউচারে ঢালবে কি না যথেষ্ট সন্দেহ। নতুন লাইন ফিট করতে হবে। এখন শৌভিকের তুঙ্গে বৃহস্পতি। ওর সঙ্গে লাইন ঠিক রাখলে পরে সুবিধা পাওয়া যেতে পারে।

কুড়ি

“নতুন রাতদিনের টিভি চ্যানেল। পার্টনারশিপ উইথ স্টেলার মিডিয়া গ্রুপ। তোমাদের কতগুলো জিনিস জানা দরকার। কী খবর নিউসকাস্ট করলে সেটা বড় কথা নয়। ভিউয়ারশিপ ধরে রাখতে হবে” বোর্ড রুমে বিমান স্টাফদের ব্রিফ করছে “এখনও চালু হয়নি। চালু হওয়ার আগে তোমাদের সিঙ্গাপুরে ট্রেনিং-এ পাঠাবার বন্দোবস্ত করেছি। ট্রেনিং শেষ করে ফিরলে মাস্টার গেম প্ল্যান বলব। প্রথম কথা হচ্ছে, যাকে যে কাজে পাঠাচ্ছি, সেটা মাস্টার করে ফিরবে। কাজ না জানলে, কোয়ালিটি দিতে পারবে না” বিমান দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে বলল। স্টেলার-সানন্দর জয়েন্ট ভেঞ্চারে নতুন যে চ্যানেলের সিইও-র গুরুদায়িত্ব নিয়ে এসেছে, যে কোনও প্রকারে সফল করতেই হবে।

“তোমাদের সত্তর জনকে সিলেক্ট করেছি এই ট্রেনিং প্রোগ্রামের জন্য। একটা চার্টও তৈরি করেছি। টেবিলে ওগুলো রাখা আছে। কে কী কাজ শিখবে, ওখানে ডিটেল লিস্ট করা আছে। লিস্ট দেখে বুঝে নাও, কাকে কী শিখতে হবে। গো থ্রু ইট ইন ডিটেলস। কারও কোনও প্রশ্ন থাকলে আমরা সন্ধেবেলা আবার বসব টু আনসার ইওর কোয়ারিস”

বিমান উঠে পড়ল দ্য ম্যাগ্নিফিসেন্ট সেভেন্টির অপারেটিং প্রোটকল ধরিয়ে। কাল ভোরের ফ্লাইটে দিল্লি। কয়েকজন চেনা মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে স্মুদ ওয়ার্কিং এনশিওর করতে হবে। এদের মধ্যে কেউ যদি স্পন্সর করে, তার বক্তব্যকে প্রায়রিটি দিতে হবে। মিডিয়ার একটাই ভাষা। দেয়ার ইজ নাথিং আনফেয়ার ইন লাভ অ্যান্ড ওয়ারের মতো, দেয়ার ইজ নাথিং এথিক্যাল ইন মিডিয়া বিজনেস। মিডিয়ায় নেমেছ, একটাই মন্ত্র। সাকসেস অ্যাট এনি কস্ট...

বাবা স্যার কিথ আরথার মারডকের মৃত্যুর পর একুশ বছর বয়েসে অস্ট্রেলিয়ান রুপার্ট মারডক, ১৯৫২ সালে বাবার নিউজ লিমিটেড-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয়ে, বাবার সীমিত মিডিয়ার দায়িত্ব তুলে নেয়। নতুন নাম নিউস কর্পোরেশন নামে কম্প্যানিকে ভূষিত করে। অস্ট্রেলিয়া আর নিউজিল্যান্ডে একটার পর একটা খবরের কাগজের অধিগ্রহণ। ষাটের শেষভাগে ইংল্যান্ডের নিউজ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ও সান-এর মালিকানা অধিগ্রহণ। সত্তরের মাঝামাঝি অ্যামেরিকায় বিজনেস এক্সপ্যানশনের সময় ইংল্যান্ডে দ্য টাইম পত্রিকা কিনে নেয়। টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্স, হারপার কলিন্স, দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল কেনার পর বিস্কাই-বি তৈরি থেকে শুরু করে তার নিউজ কর্পোরেশন ৮০০ টি সংস্থা দখল করে...

বিমান এই ভাষাটাই বোঝে, এই ভাষাই মানে। যেনতেন প্রকারে মুনাফা। দিল্লি থেকে কলকাতা, রক্ষাকর্তাদের সঙ্গে ডিল, সামঝোতা। শুধু ডিল করলে তো চলবে না। ইউ হ্যাভ টু ডেলিভার।

দ্যা ম্যাগ্নিফিসেন্ট সেভেন্টি ফেরার পর, পুরোদমে চ্যানেল শুরু। নতুন নতুন ক্যাপশন - ব্রেকিং নিউজ, খবর বারোটা, বুদ্ধজীবী বনাম বুদ্ধিজীবী। বিমানের চমক লাগানো ভেল্কি। অল্প সময়েই চ্যানেল শীর্ষস্থানে। তার ইমেজও। মধ্যগগনে বিচরণ। বিচক্ষণ বিমলের বুঝতে অসুবিধা হয়নি, সে-ই তো বাংলা মিডিয়ার বাদশা। সদর্পে ফের ছড়ি ঘোরানো শুরু।

সরকারবাবু একদিন কিছু বলতে এলেন। বিমান বাধা দিয়ে বলল “মালিক আপনি হতে পারেন, চ্যানেল চালাই আমি। আপনি যান তো, আমাকে কাজ করতে দিন”

নিঃশব্দে বাবু চলে গেলেও কথাটা ভালভাবে নেননি। আফটার অল বিমান যত বড়ই হোক না কেন, তাঁর কর্মচারী। মাইনে করা লোকের কাছ থেকে এ ধরনের তাচ্ছিল্যে অভ্যস্ত নন। ভেতরে ভেতরে ফুঁসছেন। বিমান হ্যাস বিকাম গ্রেটার দ্যান ইন্সটিটিউশন।

কে তৈরি করেছিল বিমানকে? সে ছাড়া বিমান কোথায়? চ্যালেঞ্জ? আর নয়... অনেক হয়েছে।

যত হম্বিতম্বিই করুক না কেন, বিমানের একটাই ভয়। বড়বাজার থেকে সরেছে। চ্যানেল থেকে সরতে কতক্ষণ? লাইফ বোট বানাতে হবে। ভেতরে অন্য অঙ্ক। সরকারবাবুর ছায়া থাকুক চাই না থাকুক, এখন থেকে নিজের পরিচয়ে বাঁচতে হবে। আপন মহিমায়। স্পন্সরশিপ নিয়ে চায়না...

সৌগত দত্ত ও মনু ঘোষকে বলল “চায়নায় গিয়ে দেখলাম স্ক্র্যাপ কম্পিউটার কী ভাবে রিফারবিস করে বাজারে চালাতে হয়। এখানেও তো আমরা এমন কিছু একটা করতে পারি?”

“কে রিফারবিশড মাল কিনবে?”

“সস্তার কম্পিউটার কেনার অনেক লোক আছে। ইনভেস্টমেন্ট তো বেশি নয়। টাকা উঠে আসবে”

“ঠিক সিওর নই” সৌগতর দ্বিধা।

“তোমার সিওরিটির গ্যারান্টি আমি। তোমার ইনভেস্টমেন্টের রিটার্ন এলেই তো হল”

“তুমি পসিটিভ, আমরা লসে রান করব না?”

“অ্যাবসলিউটলি। গভর্নমেন্ট অফিসে টেন্ডার কী করে পাস করাতে হয়, আমার জানা। কন্ট্যাক্টসও আছে, পাস করিয়ে দেবে। কিছু খাওয়াতে হবে”

বাজারে এল নতুন কম্পিউটার কম্প্যানি মেন্টিস।

“নামটা পালটাতে হবে। বাঙালি টচ নেই” বিমান গভর্নমেন্ট অফিসারদের সঙ্গে কথা বলে জানাল।

“কী নাম?”

“বাঙালি নাম, যেটা খাবে। এই ধর আপনা পিসি। হিন্দি বাঙালি দুই কমিউনিটিই খাবে”

মেন্টিসের নতুন নাম হল আপনা পিসি।

গুছিয়ে নেওয়ার পর বিমান আরও বেপরোয়া। চ্যানেলের সর্বময় কর্তা। মালিকের কোনও বক্তব্য থাকবে না, তা কী হয়? প্রত্যাশিত গোল্ডেন হ্যান্ডসেক দিয়ে সরকারবাবু বিদায় দিলেন। সঙ্গে স্বাধীনতা, যা খুশি করার।

আপনা পিসি থেকে তো রোজগার এসে যাচ্ছে। কিন্তু তাতে কি সাংবাদিকের মন ভরে? তরুণ পাঁজা আর ধূর্জটি রায়কে ধরে কেয়াতলায় একটা দৈনিক শুরু করল। শেষ পর্যন্ত চলল না। বিমান তখন নতুন ছক সাজাচ্ছে। সৌগত দত্ত ও মনু ঘোষের সঙ্গে চ্যানেল। বাংলা টিভি। ইন পার্টনারশিপ উইথ চ্যানেল এক্স অফ চেন্নাই।

সোজা ম্যাগ্নিফিসেন্ট সেভেন্টির অন্যতম প্রকাশ চক্রবর্তীকে ফোন “নতুন চ্যানেল শুরু করছি, বাংলা টিভি। জয়েন করবি?”

হঠাৎ ফোন পেয়ে ঘাবড়ে গেল প্রকাশ। ততদিনে বিবিপি সুপ্রতিষ্ঠিত। বিমানের তৈরি মাস্টার প্ল্যানে সদর্পে এগিয়ে যাচ্ছে। কোনটা বড়? ইন্সটিটিউশন, না তার পেছনের কারিগর? প্রতিষ্ঠিত ইন্সটিটিউশন ছাড়া মানেই সিওরিটি থেকে আনসিওরিটি।

“ব্যাপারটা একটু খোলসা করে বলত”

“সব্বাই আমার বাড়িতে চলে আয়। সব পরিষ্কার করে বলছি”

মিটিং, আলোচনা, দ্বন্দ্বের পর, সত্তরের মধ্যে পঞ্চাশ জন বিমানের সঙ্গে এল। বাকি কুড়ি রয়ে গেল। পার্ক স্ট্রিটের প্লাজা কনক্লেভে বিশাল অফিস, মাত্র সাত লক্ষ টাকায় ভাড়া নিয়ে, মাস্টার প্ল্যান কষা হচ্ছে। বিমান, সৌগত, মনু, জয়েন করা পঞ্চাশ। কাজ বিশেষ কিছুই নেই। তিন মাস পরে চ্যানেল অন এয়ার হবে, তারই পরিকল্পনা। পার্টনার চ্যানেল এক্স-এর টাকায় মৌজ মস্তি। বিমানের ক্ষমতা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই, প্রশ্ন সততা নিয়ে। প্রকাশের সেখানেই দ্বিধা, সংশয়। চিত্রতারকা, পরিচালক সুপর্ণা সেন সঙ্গে থাকলেও, যতটা সৌগতদা আর মনুদা আনন্দে বিহ্বল, প্রকাশ অতটা নয়। মিডিয়া লাইনে এতদিনে হাড়েহাড়ে মালকে চিনে ফেলেছে। আরেকটা গ্ল্যামার আইকন দরকার। যদি সুপর্ণাদি ঝোলায়, একটা লাইফবোট চাই।

উঠতি তারকা দেওয়ালিকে ফোন “দেখা করতে পারি?”

“নিশ্চয়ই প্রকাশদা। আজকে তো ফ্রি নই। বরং শনিবার আমার ফ্ল্যাটে চলে এস”

দেওয়ালির সঙ্গে পরিচয়টা কি আজকের? সেই কবে, যখন দেওয়ালি স্টার হয়নি। বিবিপিতে একটু পাবলিসিটির জন্য কত অনুনয়। জানে প্রকাশের কথা বিমান ফেলতে পারবে না। বিমানকে দিয়ে দেওয়ালির অতিরিক্ত পাবলিসিটি ম্যানেজ করেছিল। ডেফিনেটলি সেটা তার উত্তরণের পথে সহায়ক হয়েছে।

একটা স্লিভলেস ফিনফিনে হাউসকোটে নিজেই দরজা খুলে দিল দেওয়ালি “অনেকদিন পর। এস এস ভেতরে এস। কী খাবে? হুইস্কি, রাম, ভডকা?” দেওয়ালির আন্তরিক আপ্যায়নে সোফায় গা এলিয়ে বসে বলল “হুইস্কি”

“বস, নিয়ে আসছি। জল দিয়ে, না বরফ?”

“বরফ হলে ভাল হত”

হুইস্কির বোতল টেবিলে রেখে বলল “কিছু মনে করো না। যা গরম না। এই বাড়ির জামায়-ই আছি। সব সময় তো মেক আপ করে শট দিতে হয়। বাড়িতে আর এসব লাগানো পোষায় না”

“আমার সৌভাগ্য। স্বনামধন্য স্টারকে নিজের মতো করে পাচ্ছি”

সিগারেট ধরিয়ে বলল “আওয়াজ দিও না প্রকাশদা। স্টার তো বাইরের লোকের কাছে। তোমার কাছে আমি সেই স্ট্রাগ্লিং দেওয়ালি” হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে বলল “এখনও বিবিপিতে আছ?”

“না ছেড়ে দিয়েছি। বিমানের সঙ্গে একটা নতুন চ্যানেলে জয়েন করেছি, বাংলা টিভি। মাস তিনেকের মধ্যে এয়ার হবে”

“এটা কার?”

“তুমি চেন না। সৌগত দত্ত আর মনু ঘোষ বলে দুজনের। তবে ম্যাক্সিমাম শেয়ার চেন্নাই-এর একটা কম্প্যানির, চ্যানেল এক্স। তবে বিমান-ই সর্বেসর্বা”

সিঙ্গল মল্ট হুইস্কি কদ্দিন খায়নি। তবু আজ দেওয়ালির দৌলতে জুটে গেল। মেয়েটা তরতরিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে, কিন্তু এই উত্তরণের পেছনে যারা সাহায্য করেছে, তাদের এখনও ভোলেনি। স্টারডমের দুনিয়ায় বিরল। এই লাইনে এত বছর কম সেলেব ঘাঁটল না। একটু উঠলেই ধরাকে সরা জ্ঞান করে। অথচ এই মেয়েটা, ঠিক আগের মতোই।

"জারনালিজম পাস করার পর থেকেই ইচ্ছে ছিল, একটা সৎ প্রতিষ্ঠানে কাজ করব। স্পন্সরড নিউজ করতে আর ভাল লাগছে না। অনেক হয়েছে, হাঁপিয়ে উঠেছি" দেওয়ালির দিকে তাকিয়ে বলল "তোমার কাছে একটা দরকারে এসেছি। আমাদের এই চ্যানেলের পাশে কি তোমায় পাব?"

"আগের মতো হয়ত অত সময় দিতে পারব না। লাইন দিয়ে ডেটস। তবে তুমি ডাকলে, ফ্রি থাকলে সব সময়ই আছি। জাস্ট প্রে, তোমার ইচ্ছে পূরণ হয়" চাকচিক্যের বাইরে, নিরাভরণ দেওয়ালি যেন অন্য সুর শোনাচ্ছে। যা এতদিন কোনও তারকার মুখে শোনেনি। নাম হলেই, টাকা ছাড়া কথা বলে না। অথচ দেওয়ালি তার ধার পাশেও গেল না।

"সুপর্ণাদিকে বিমান ভেড়ালেও, ওর ওপর আমার কোনও আস্থা নেই। যে কোনও সময় ডিচ করতে পারে। আমি বিশ্বাস করি, তুমি করবে না। তাই তোমার কাছে আসা"

"তুমি সিওর থাকতে পার, আমি ডোবাব না। যদি তোমার ডাকে আসতে না পারি, বুঝবে কোথাও ফেঁসে গেছি"

"তা আমি ভাল করেই জানি"

তিন মাস পর ঘটা করে বাংলা টিভির গালা ওপেনিং। ওবেরয় গ্র্যান্ডের ব্যাঙ্কয়েট। বহু তারকা ফ্রিতে এন্তার মাল খেয়ে টাল। বাংলা টিভির মহরতে শুভ কামনা করে সৌগত আর মনুর দেদার খসিয়ে, বাহাবা বেচে গেল।

ফলাও পাবলিসিটি সত্ত্বেও ছ মাস ধরে লাভের মুখ দেখল না কম্পানি। প্রকাশ এবং ম্যাগ্নিফিসেন্ট ফিফটি আঁচ করতে পারেনি, বিমান যথারীতি আখের গুছিয়ে নিচ্ছে। চ্যানেল গোল্লায়।

"না রে, আর ভাল লাগছে না। এবার এসব মিডিয়া ছেড়ে দেব" একদিন হঠাৎ ঘোষণা করল বিমান।

"কী করবে?"

"ছেলেটা মেডিক্যাল পড়ছে, ওকে দেখতে হবে। বাড়ির জন্য একটুও সময় দিতে পারছি না"

"আমাদের কী হবে বিমানদা?"

"তোরা কাজ করে যা। সৌগত, মনু তো আছেই"

বিমান যখন কেটে পড়ল, তখনও ওরা আঁচ করতে পারেনি ভাঁড়ার শূন্য। প্রফিট হচ্ছে না বলে চ্যানেল এক্স ফারদার ইনভেস্ট করবে না। বিপাক দেখে মুনু ঘোষ সৌগতর হাতে চ্যানেলের ভার দিয়ে, শেয়ার ছেড়ে সরে পড়ল।

যে স্বপ্ন নিয়ে বিবিপি ছেড়ে প্রকাশ বাংলা টিভিতে জয়েন করেছিল, সেই স্বপ্ন তখন টিপিক্যাল মরীচিকা। মাইনে নেই, কাল হাঁড়ি কী করে চড়বে, জানা নেই। তবুও চ্যানেল চালিয়ে যেতে হবে। তিন মিনিট অফ এয়ার হলেই লাইসেন্স ক্যান্সেল। রিপিট রেকর্ডেড প্রোগ্রাম দিয়ে কোনরকমে ভাসছে নিঃশেষ বাংলা টিভি।

প্রকাশ তখন একবার ভেবেছিল দেওয়ালিকে ব্যাপারটা জানায়। দেওয়ালি ব্যস্ত, হাতে একদম সময় নেই। পর মুহূর্তেই মনে হল, এধরনের স্টারদের কাছে তার একটা আলাদা জায়গা আছে। দুর্দিনেও সামনে দাঁড়িয়ে ভিক্ষে চাইতে পারবে না। কোনও ভাবেই সম্ভব নয়।

প্রবলেমটা ঠিক ইগোর নয়, কিছুটা পজিশনের। প্রতারকের পাল্লায় পড়েছি - কথাটা কাউকে তো বুক ঠুকে বলা যায় না। বিশেষ করে তাঁর মতো পরিচিত মুখের কাছে লজ্জার ব্যাপার। কেউ বিশ্বাস করবে না। যা কপালে আছে, তাই হবে। সানি পার্কে সৌগত দত্তর বাড়ির সামনে ধরনায় বসে বুঝল, সৌগত বাড়িতে নেই - অ্যাবস্কন্ডিং!

একুশ

ড্যম ইট।

আচমকা প্রাগের ওয়েস্ট চেক মিউজিয়ামে এক্সিবিশন করার মধ্যেই খবরটা এল, সুভাষ কর্মকার আর নেই। প্রথমে ছ্যাঁত করে উঠেছিল বুকটা। পর মুহূর্তেই, অদৃশ্য এক অসহায়তা গ্রাস করল রিয়াকে। মনে হচ্ছে, মিউজিয়ামের শক্ত মেঝের ওপর দাঁড়িয়েও পায়ের তলার মাটি ক্রমশ সরে যাচ্ছে। দমকা ঝটকা হাওয়ায়, ছাউনিটা যেন হঠাৎ ভেসে গেল। এখন সে একা, সম্পূর্ণভাবে। তার চিত্রশিল্পী জগতের কাণ্ডারি হারিয়ে গেছে অজানার বাঁকে, তাকে শূন্যে ভাসিয়ে। কলকাতার বুকে এখনও যেটুকু ক্ষীণ আশা ছিল, তাও পলকে হারিয়ে গেল। এমন শক্তি নেই, ওই সুবিধাবাদী হাঙরদের সঙ্গে একা পাঞ্জা লড়ার, যদিও জেদটা আগের মতোই।

"হোয়াটস দ্য ম্যাটার রিয়া?" ড্রাহতস্লাভের চোখ এড়ায়নি।

"সুভাষদা ইজ নো মোর"

"মাই গস! ইউ গট দিস নিউজ নাউ?"

"অন মাই মোবাইল ফ্রম ক্যালকাটা"

"আই হ্যাড কুকড সো মেনি টাইমস ফর হিম। বিন টু কেন্ডুলি মেলা, শান্তিনিকেতন..."

"হি ওয়াজ মাই মেন্টর। হি পাসড অ্যাওয়ে টুডে"

ড্রাহতস্লাভ চুপ করে রইল। খুব ভালভাবেই জানে এই ফেমাস পেইন্টারের ইতিবৃত্ত। রিয়ার যা কিছু আর্টের শিক্ষা, সবই ওঁর কাছে।

মাইকেলের সঙ্গে বিয়েটা হিসেবের অঙ্কে হলেও রিয়া জানত, বিয়ে টিকবে না। বিয়ের পিঁড়ি থেকে পালাতে গিয়েও, শেষ পর্যন্ত মালাবদলটা করে ফেলেছিল। বিয়ে না করলে যে, তার ইউরোপে থাকা অনিশ্চিত হয়ে পড়বে, খুব ভাল করেই জানত। উপায় নেই। চেকস্লভাকিয়ান সিটিজেনশিপ নিয়ে ইউরোপে ভাগ্য ফেরানোটাই একমাত্র পথ। কলকাতায় এতদিন চেষ্টা করেও তো লাইন ফিট করতে পারল না।

আর্ট তো বাইরের আভরণ। রোজগার কী শুধু আর্ট থেকে হয়?

টালিগঞ্জের এঁদো একচিলতে হাফ-বস্তির মধ্যেও একটা স্বপ্ন দেখত, বড় হওয়ার। কেউকেটা হওয়ার, নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে কিছু করার। তার কী এমন আছে, যা অন্যদের থেকে একটু বেশি? চমক লাগানো দেহসৌষ্ঠব ছাড়া। ভরা যৌবনে উপচে পড়া বুক। স্তনের প্রশস্তিতে নিতম্ব গৌণ। লোকে তার দিকে তাকালে, তাৎক্ষণিক ভাবে যেটা লক্ষণীয়। ঈশ্বরের বরমাল্যকে আশীর্বাদ মেনে সে পথেই হাঁটা। ছেলেবাজি নয়। গ্র্যাজুয়েশনের সময় থেকেই নেটওয়ার্কিং-এর প্রথম সূত্র। বাবা বুঝতে পারেননি। কিংবা ভুল বুঝেছিলেন। হয়ত বুঝতে চাননি। নিম্নমধ্যবিত্ত সংকীর্ণতার বলয়ে বৃহত্তরকে দেখা যায় না। সেই সীমিত দৃষ্টিভঙ্গির ঘেরাটোপে বাবা রিয়াকে দেখতে শেখেনি, বুঝতে চায়নি। তার তন্বী ঘন যৌবনা মেয়েকে দেখেছে আর পাঁচটা বাপের মতোই।

বিদ্রুপ করে বলেছিল "এমন ধিঙ্গি মেয়ে, ছোট ছোট জামা পড়ে সারা পাড়া নাচিয়ে বেড়াচ্ছিস। পড়াশোনার বালাই নেই। তোকে দিয়ে কিসসু হবে না"

উঠতি বয়সের ঠিকরে পড়া দেহসৌষ্ঠব। মডার্ন ওয়ান-পিসের দৌলতে ঠিকরে পড়ছে। কিছুই করেনি, শুধু চাঁদের মতো দ্যুতি ছড়িয়েছে। সেই রোশনাইয়ে যে কত হৃদয় মুখ থুবড়ে পড়ে ছটফট করেছে, হিসেব রাখেনি। প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট সোপানের ধাপ। বাবা বুঝতেই পারেনি।

যৌবনের বুদবুদে এদের চোবাও। ডুবিয়ে দাও শ্রাবণধারায়। কে তাকে সঙ্গী করল, সেটা বড় কথা নয়। বিনিময়ে কী পেল, সেটাই সব। বাবার তির্যক ব্যঙ্গ "যে ভাবে চলছিস, কেউ তোকে বিয়েও করবে না। নেহাৎ মেয়ে হয়ে জন্মেছিস, তাই ফেলে দিতে পারব না"

"তোমাকে আমার বিয়ে, ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। আমার কপালে যা আছে তাই হবে"ঝাঁঝিয়ে উত্তর দিয়েছে।

রিয়া যে একটা স্বত্বা, বুঝতেও পারেনি। এটাই ওর টিআরপি অথবা অধঃপতন। বাবা হয়ত ক্ষুদ্র শান্তিতেই তৃপ্ত, তাই বৃহত্তর পাওয়াকে দেখতে শেখেনি। বুড়ো হয়ে গেছে তো। কী আর করা যাবে? যেখানেই থাকুক সুখে থাকুক... মেয়ের মঙ্গলকামনায় তার আশীর্বাদ, আকাঙ্ক্ষা...

টালি থেকে বালি, স্বপ্নের থলি, মাঝখানে খালি। আধুরা স্বপ্নে নতুন দিশা। স্বপ্ন হারিয়ে গেলে, প্রত্যাশা।

স্বপ্নটা নতুন মোড় নিল। কলকাতায় আর্টে যেটুকু এগোবার সুযোগ ছিল, তাও গেল। এই ক্রিয়েটিভ ফিল্ডটা এমনই। সবাই লড়ে যাচ্ছে, একটু জায়গা করে নেওয়ার জন্য। তবুও সুভাষদার মতো কিংবদন্তি শিল্পী পেছনে ছিল বলেই এতদিন এদের মধ্যে থাকার চেষ্টা করেছিল। এখন সে গুড়ে বালি।

সোজা নিত্যানন্দ দাস বাউলকে ফোন "আমাদের বৈষ্ণবের আখড়া গ্রুপটা আবার চালু করা যায় না?"

"কেন যাবে না দিদি? আপনি চাইলেই যাবে"

"তবে কাজ শুরু করে দিন। যা টাকা লাগে আমি দেব। প্রাগে এক্সিবিশন চলছে। শেষ হলেই ইন্ডিয়া যাচ্ছি"

কমার্সিয়াল বাউলদের মিডিয়ায় দাপাদাপিতে নিত্যানন্দ দাস বাউল একঘরে। এই মন্দার বাজারে, রিয়ার ফোনে যেন ধড়ে নতুন করে প্রাণ এল। সিনেমার মতো গ্রামে গ্রামে ঘুরে কামাই নেই। পূর্ণদাস বাউল সেই কবে উত্তমকুমারের 'নায়িকা সংবাদ' ছবিতে গান গেয়ে স্থায়ীভাবে বাউল গানের কিংবদন্তি হয়ে নিজের জায়গা করে নিয়েছেন। এখন হাফ-বাউলরা মিডিয়ার শোতে অংশগ্রহণ করে যা পারছে করছে। এদের নেটওয়ার্কিং মহিমায় নিতু বাউল একঘরে। মেয়েটা যদি সত্যি চায়, তবে এদের মধ্যেই ফিরে আসতে পারে। রিয়ার টাকা আছে, নেটওয়ার্ক আছে।

টাকা কী আর ছবি বিক্রি বা বাউল গান গেয়ে আসে? মডেলিং শুট করেই আসল আয়। কলকাতায় দুটো ফ্ল্যাট, শান্তিনিকেতনে জমি-বাড়ি। বাবা কী কল্পনাও করতে পেরেছিল? উদ্যমটাই আসল। সংস্কার গৌণ। এখন ছেলেমানুষি মনে হয়।

যা আশা করেছিল তাই, বিয়েটা টেকেনি। বিয়ে মানেই বন্ধন। রিয়া মুক্তচিন্তার পূজারি। বাউলদের মতো। লাগাম ছাড়া জীবনের আনন্দ নিতে হবে। গে লাইফে অভ্যস্ত মাইকেলকে মুক্তি দিয়েছে সিটিজেনশিপ পাওয়ার পরেই। দুজনেই হাঁফ ছেড়েছিল।

ইংল্যান্ডের এজেন্টকে কল "এনি ওয়ার্ক ফর মি?"

"হ্যাভ টু চেক ইট আউট"

"প্লিজ আই অ্যাম ইন ডায়ার নিড অফ ক্যাশ, মোর দ্য বেটার"

"সিওর ম্যাম। উইল ট্রাই মাই লেভেল বেস্ট"

"থ্যাঙ্কস"

ডিসকানেক্ট করে, রাজা চক্রবর্তীকে ফোন। রাজা অনেকদিনের বন্ধু, তার ভক্ত, বাউল সংগীতে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট। এখানে ওখানে প্রোগ্রাম করে বেড়ায় "সুভাষদা মারা গেছে শুনেছ?"

"খবরে দেখলাম"

"প্রাগে আমার আর্ট এক্সিবিশন চলছে। শেষ হলে কিছুদিনের মধ্যেই কলকাতায় আসছি। ফ্লাইট কনফার্ম করে জানাব। আমাদের বৈষ্ণবের আখড়া গ্রুপটাকে আবার চাঙ্গা করতে হবে"

অনেক বাউলদের মতো রিয়াও তান্ত্রিক যোগে বিশ্বাসী। এখানে মুক্তি আছে। দেহের লীলা অপবিত্র নয়। সাইকো-ফিসিক্যাল ম্যানুপুলেশনের মাধ্যমে দৈহিক মিলনকে নাকি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। যুগলে চেনা গণ্ডি ভেঙে নাকি এক অভূতপূর্ব মার্গে পৌঁছে যায়। এই তান্ত্রিক যোগের মাধ্যমে পরিচিত জীবনচক্র ভেঙে চিরশান্তি বা সমাধির পথে যাওয়াও সম্ভব। চিন্তার সেই সুদূর স্তরে না পৌঁছলেও, দেহমিলনের বৈধতাকে সর্বসমক্ষে অন্তত প্রতিষ্ঠা করা যায়। তান্ত্রিক সেক্স। শুধু দেহ নয়, সর্বগ্রাসী কামনার নিয়ন্ত্রণ। মিলনের ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছে সিমেনের সংবরণ ও দৈহিক সিক্রিশনের আস্বাদন, সুধাবৎ।

ব্যক্তিগত জীবনযাত্রাকে যদি দর্শনে রূপান্তরিত করে নিজের মধুমাখা জীবনকে বৈধতা দিতে পারে, মন্দ কী? দৈনন্দিন রাসলীলায় জাস্ট একটা সিলমোহর। ষোলোর জায়গায় আঠারো আনা বজায় থাকবে। আশ্চর্য সংস্কারাচ্ছন্ন একুশ শতকের বাঙালি সম্প্রদায়ের কাছে স্বতন্ত্র জীবনযাত্রাও বৈধতা পাবে।

"টাকা চাই। তোমার বাজেটে, আমাদের বৈষ্ণবের আখড়া গ্রুপটাকে দাঁড় করাতে গেলে আরও টাকার প্রয়োজন" রাজা রিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল।

"ছবিগুলো সব গ্যালারিতেই তো রাখা আছে। বিক্রি হচ্ছে আর কোথায়? এখানে কোনও মার্কেটিং নেই। আমাদের মতো আর্টিস্টদের কেউ ব্যাক করে না। ওই নামকাওয়াস্তে এক্সিবিশন। বাইরে আমার যে কটা ছবি বিক্রি করতে পেরেছি, এখানে কিছুই পারিনি" রিয়া গলফ রোডের স্টুডিওতে আঁকা ছবিগুলোর দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

দিন দুই লেগেছে জেট ল্যাগ কাটিয়ে উঠতে। এখনও ঘুমঘুম পাচ্ছে। তার মধ্যেই রাজাকে ডেকে নিয়েছে গ্রুপের মাস্টার প্ল্যান করার জন্য "এখানে ওই যে কটা আর্টিস্ট পলিটিক্যাল অ্যাসসিয়েশনে গোটা ইন্ডাস্ট্রিটাকে আঁকড়ে রেখেছে, তারাই করে খাচ্ছে। বাকি সব ভোঁ ভা"

"শুনলাম, এখানে অনেক আর্টিস্ট নিজের আঁকা ছবি বিক্রি করে, নামী আর্টিস্টদের কাছে। ভালই টাকা পায়। ওই নামীদামি আর্টিস্টরা নিজের নাম দিয়ে ছবিগুলো চালায়"

"ওটা তো বরাবরই আছে। যারা কোনও নাম করতে পারেনি, অথচ টাকার প্রয়োজন। আমি সে পথে কোনদিন হাঁটিনি। এখন সার্কেলে আমার নামটা পরিচিত। বদনাম হয়ে যাবে। বাইরে প্রফেশনালিজম অনেক

বেশি। আমার যা কিছু ছবি বিক্রি হয়েছে বেশিভাগই অন্য দেশে”

“তাহলে ওখানেই বিক্রি করে এলে না কেন?”

“আগে বিক্রি হত, হঠাৎ ইকনমিক রিসেশনের জন্য অনেক কমে গেছে। ইউরোপে রিসেশন সাংঘাতিক। লোকে সারভাইভ করবে, না ছবি কিনবে?”

তবু বারবার কলকাতায় ফেরা কেন? হ্যাংওভার কাটাতে...

প্রাগে লাইন ফিট করতে কিছুটা সক্ষম হলেও, ইংল্যান্ডে নেহেরু সেন্টারে কিছু এক্সিবিশন করে প্রচার ছাড়া, তেমন কিছুই হয়নি। এখানে কিছু বিজনেসম্যানদের সঙ্গে ব্যক্তিগত রিলেশনের জন্য আগে কিছু ছবি কাটলেও ইদানীং ওদের উৎসাহ কম। বুঝতে পারছে, বয়সের সঙ্গে ফেমিনাইন চার্মসও কমছে। এতদিন নিজের শিল্পদক্ষতার ঘটতি অন্যভাবে পুষিয়ে নিলেও, এখন কাজে লাগছে না। মাথার ওপর ছিলেন সুভাষদা। সেও নেই। সব মিলিয়ে আর্টের দুনিয়ায় মাটি সরে যাচ্ছে। আসার আগে, মনে মনে ঠিকই করে ফেলেছিল, শান্তিকেতনের জমিটায় বাউলদের আখড়া বানাবে। এক সময় ইচ্ছে ছিল, ওখানে পটশিল্পীদের স্কুল খুলবে। এখন আর আগ্রহ নেই।

মুক্ত জীবনে রস আস্বাদন। বাংলায় বসে অবাধ যৌন জীবনকে সামাজিক মোড়ক দেওয়ার একটাই পথ। বাউল জীবনে ঢুকে যাওয়ার মধ্যেই, অপূর্ণতার পাথেয়। বেঁচে থাকার রসদ। সেখানেই আগামীর মন্ত্র।

সে কথাই এখন ভাবছে... মনেপ্রাণে বৈষ্ণবের আখড়া...

বাইশ

"দশ লাখ। যাকে চাও হাজির করে দেব" দিগ্বিজয়ের ঠান্ডা আওয়াজ।

স্টেটসে বঙ্গ সংস্কৃতির আগে অঞ্জনদার লেখা নতুন বই-এর একটা ঘটা করে পাবলিসিটি চাইছে শোভন। প্রেফারেবলি মুম্বাই বা চেন্নাই-এর কাউকে দিয়ে। দিগ্বিজয়ের বিশাল নেটওয়ার্ক। জোগাড় করা প্রবলেম নয়।

"ঠিক আছে" অসহায়ভাবে মাথা নাড়ল শোভন।

"মুম্বাই না চেন্নাই?"

"যে বেশি গ্ল্যামারাস"

যদিও চেন্নাই-এর কন্ট্যাক্টগুলো বেশি মজবুত, তবে মুম্বাই বাজারে বেশি খায়। ছোটবেলা কেটেছে চেন্নাইতে। সেখানে বিস্তর কন্ট্যাক্ট। যেমন সুবিমল, মাল্টিন্যাশনাল কম্প্যানির জিএম। উঁচু মহলে অবাধ বিচরণ। ওদের ব্র্যান্ড প্রোমোট করার জন্য প্রায়শই দক্ষিণি তারকাদের ডাকতে হয়। তারাও উপরি রোজগারের জন্য সুবিমলের কাছে দায়বদ্ধ। তারপর দিগ্বিজয়-মায়ার মধুচক্র থেকে উইকএন্ডে আরও কামাই। ওদের অনেক কম ধরিয়ে, কমিশন দ্বিগুণ। বাবা অ্যাকাউন্টস অফিসার থাকলেও, ছেলে হিসেবনিকেশ তাঁর থেকে বেশি বোঝে।

কোন হিরোইনকে হাজির করল, সেটা শোভনের চিন্তার বিষয় হতে পারে, দিগ্বিজয়ের নয়। বিনিময়ে কী পেল, সেটাই বড় কথা। শোভন থাকুক ওর পাবলিসিটির ঘোরে, তার কাছে পাত্তিটাই মুখ্য। অবশ্য মিডিয়াকে খাওয়াতে গেলে, মুম্বাই-এর হিরোইন জরুরি। এদের মেধায় লুক ওয়েস্ট। তাতে কমিশন কম থাকলেও, দিগ্বিজয়ের সেটাই কাম্য। ওর মতো টাটকা মুরগি হারনো, ওদের দুজনেরই ক্ষতি।

শোভনের অফিস থেকে বেরতে গিয়ে মোবাইল বেজে উঠল। ব্রিফলি শুনেই বলল "খবরটা জেনুইন?"

"পাক্কা, অথেনটিক সোর্স"

"গাড়িতে উঠছি। বাড়ি গিয়ে কথা হবে"

"অমন হন্তদন্ত হয়ে চললে কোথায়?" দিগ্বিজয়কে তাড়াহুড়ো করে বেরতে দেখে, মায়ার প্রশ্ন।

"একটা স্কুপ পেয়েছি। বিগ স্টোরি। ঠিক হলে, জ্যাকপট"

"সুবিমলকে টাইম দিয়েছিলে। ও চেন্নাই থেকে আসছে তোমার সঙ্গে দেখা করতে"

"সুবিমল ক্যান ওয়েট, দিস কান্ট" মায়াকে কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বেরিয়ে গেল।

মায়া বুঝতে পারছে না, এমন কী ঘটল যে হঠাৎ বেরিয়ে যাচ্ছে? সুবিমল নতুন অনেক মুরগি ধরেছে। ভাল পারসেন্টেজ...

"তুমি কী ফ্লাইট বোর্ড করেছ?" মায়া সুবিমলকে ফোন করল।

"এখনও না, জাস্ট বাড়ি থেকে বেরচ্ছি"

"দেন ডোন্ট। দাদা কী একটা কাজ নিয়ে হুড়মুড় করে বেরিয়ে গেল। বলল আর্জেন্ট। তুমি তাহলে এখন এস না। আমি দাদার সঙ্গে সময়মত কথা বলে, তোমায় রিং ব্যাক করছি"

খবরটা যদি সত্যি হয়, ইট ইজ এ বিগ স্কুপ। অনিন্দ্য দেওরা মুম্বাই-এর উঠতি পলিটিশিয়ানদের অন্যতম। হ্যান্ডসম, সুবক্তা, ডাইন্যামিক। তার স্কুপ খাবে তো বটেই। ঠিক জাল ছড়াতে পারলে মোটা কামাই। এ তো আর শোভনের কলকাতা নয়। যেখানে লাখ নিয়ে কারবার। এ দিল্লি, টাকার ফানুস উড়ছে। কোটি টাকার গল্প। ঠিকমতো খেলতে পারলে শুধু স্কুপই নয়, বড় দাঁও। লাইফটাইম কামাই, ফিউচার সিকিওর্ড। খুচরো কমিশনের ওপর গণ্ডা গণ্ডা লোকেদের দিনভোর তোয়াজ করতে হবে না। এ সুযোগ ছাড়া যায় না।

কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে এল "এক্ষুনি দিল্লি যাচ্ছি"

মায়া বুঝতে পারছে না ব্যাপারটা কী! হঠাৎ এমন কী হল, যে তড়িঘড়ি দিল্লি ছুটতে হবে "কী ব্যাপার? একটু খুলে বলবে?"

"টাইম নেই, ফিরে এসে বলব" দিগ্বিজয় সুটেকেস প্যাক করতে করতে বলল "বিশাল স্কুপ। বড় স্টোরি। ধরতে পারলে..."

এত বছর ধরে দেখছে। লোকটার টাকার প্রতি অসম্ভব আসক্তি। কার নেই? মায়ারও কী কম? এমন কী খবর পেল, কত বড় দাঁও? সুবিমল তুচ্ছ...

খবর জোগাড় করে একবার থমকাল। রিজিওন্যাল নিউজে ছাড়লে কিছুই পাবে না। বরং ন্যাশনাল নিউজে খবরটা বিক্রি করতে পারলে মোটা কামাই।

"ইজ ইট জেনুইন?" ডিটিভির বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার মুকেশ লাল জিজ্ঞেস করল।

"হান্ড্রেড পারসেন্ট। হাউ মাচ উড ইউ পে মি?" দিগ্বিজয় কনফিডেন্ট।

"টু ক্রোড়স"

"দ্যাটস পিনাটস। দিস ইজ দ্য বিগেস্ট স্টোরি ইন রিসেন্ট টাইমস। আদার চ্যানেলস হ্যাভ অফার্ড মি মাচ মাচ মোর..."

"হ্যাভ টু চেক উইথ চেয়ারম্যান। কেয়ার টু ওয়েট?"

"নো প্রবলেমস অ্যাট অল"

আধ ঘণ্টা। বুক দুরু দুরু। শেষ পর্যন্ত কতয় রফা হয়। এসি কনফারেন্স রুমেও দরদর করে ঘামছে।

"বস সেইড ফোর ক্রোড়স অ্যাট মোস্ট"

"টেন। টেক ইট, অর লিভ ইট"

আবার প্রতীক্ষা। ব্যাবসাদারের ছেলে না হলেও হিসেবটা জানে। এতদিন ধরে খেলছে। কোথায় কত দাঁও নখের ডগায়। বাংলার থেকে দিল্লির লোকেরা অনেক বেশি উদার। তবে ভার যাচাই না করে মালকড়ি ছাড়ে না। দুই থেকে চারে যখন উঠেছে, বিশ্বাস না করলে অফারটা দিত না। এখন বাড়তি বোনাসের জন্য লড়ে যাচ্ছে। দেখা যাক শেষমেশ কত দাঁড়ায়।

"ওকে সিক্স। দ্যাটস ফাইন্যাল"

"ক্যাশ?"

"গিভ মি অ্যান আওয়ার। উইল ড্র দ্য মানি"

এত টাকা নিয়ে ট্র্যাভেল করবে। আজকের দিনে? ভয় ভয় করছিল। বলা তো যায় না...

"ওয়েল মেক এ ব্যাঙ্ক ড্রাফট ইন মাই নেম"

"অ্যাজ ইউ প্রেফার"

"আই উইল হুইজ অফ অ্যান্ড বি ব্যাক ইন অ্যান আওয়ার"

চড়া রোদে ঠান্ডা অফিস থেকে বেরিয়ে এল। গোটা দিল্লি শহর ড্রাই হিটে তপ্ত। সুনসান। ট্যাক্সিতে হোটেল লীলা প্যালেস। বিয়ার আর স্যান্ডুইচ। ড্রাফটের বদলে হেডলাইন স্টোরি।

কলকাতায় যাওয়ার আগে আরেকটা কাজ বাকি। শোভনের বই লঞ্চের জন্য হিরোইন ফিট করা। ভাবছে, কাকে নিলে পাবলিসিটিও হবে, কমিশনও বেশি থাকবে। মুম্বাই-এর কোনও পড়ন্ত নায়িকা। 'দ্য লাইব্রেরির' ঠান্ডা লাউঞ্জে মোবাইলে আনমনা। কন্ট্যাক্ট স্ক্রোল করেই যাচ্ছে। অনসূয়া বসু। গ্ল্যামার এখনও আগের মতোই। এখন হাতে তেমন কাজ নেই। কম টাকায় রফা করতে পারবে। ফ্লাইট প্লাস অ্যাপিয়ারেন্স ফি। সঙ্গে ফাইভ স্টার হোটেলের এক্সপেন্স।

"দিগ্বিজয় ভট্টাচার্য। চিনতে পারছ?"

"কলকাতা থেকে। কেন চিনব না? কেমন আছেন?"

"ফ্রি আছ। কথা বলা যাবে?"

"অ্যাবসলিউটলি ফ্রি" অনসূয়ার স্বরে হৃদ্যতার আভাস।

"একটা বুক লঞ্চ করতে হবে। কলকাতায়। ফ্লাইটস, হোটেল প্লাস দু-লাখ"

"এত কমে তো আমি কোথাও যাই না"

"কলকাতায় আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে দেখা হবে। সেই সঙ্গে কিছু কামিয়ে নিয়ে যাও"

"সেভেন ডেইজের কমে কলকাতা গেলে নট ওয়ার্থ দ্য জার্নি। কিছু লোকের সঙ্গেও দেখা করতে হবে। বাংলা সিনেমায় একটা রোল নিয়ে কথা চলছে..."

"ফাইন"

"হায়ার কার আর চার লাখ। মুম্বাইতে থেকে স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং বেড়ে গেছে"

অন্য সময় হলে দরাদরি করত। সামনে ছ কোটি টাকার ব্যাঙ্ক ড্রাফট ঝুলছে। মনটা এমনিতেই প্রসন্ন। দিগ্বিজয় দরাদরির মধ্যে গেল না "এক সপ্তাহের হোটেল এক্সপেন্স নিয়ে পোষাবে না। তোমার রিকোয়েস্টে থ্রি ল্যখস। দ্যটস ফাইন্যাল"

"বিজনেস ক্লাস ফ্লাইট" মুম্বাইয়ের বাসিন্দা অনসূয়া হাসিল করতে ভালই শিখেছে।

"ডান। ফোরথ জুলাই। বিবেকানন্দর ডেথ অ্যানিভারসারি। দিনটা মার্ক করে রাখ। অন-লাইন ফ্লাইট আর হোটেল বুকিং করে মেল করে দেব। তোমার মেল অ্যাড্রেসটা টেক্সট করে দিও"

বিয়ারটা শেষ করে উঠে পড়ল। ড্রাফট নিয়ে সিডিটা মুকেশ লালকে হ্যান্ড ওভার করে আজই কলকাতা ফিরবে।

সেন্সেশন। ঝড় তুলল সারা দেশে। মিডিয়া থেকে সোশাল নেটওয়ার্কিং থেকে ক্লাবে, পাবে। ভাইরাসের মতো ভিডিওটা ছড়াচ্ছে এমএমএস-এ, হোয়াটস অ্যাপে। ইউ টিউবে উঠেছিল। কিন্তু কোর্ট ইঞ্জাংশনে ডিলিট

করে দেওয়া হয়েছে। ডিটিভি-র টিআরপি তুঙ্গে। হাইপ তো একদিন মিলিয়ে যাবে। কিন্তু এর ফাঁকে যে যা কামাবার, কামিয়ে নিচ্ছে।

কেন্দ্রের মন্ত্রী অনিন্দ্য দেওরার এক বিরল অন্তরঙ্গ ভিডিও। সুপ্রিম কোর্টের স্বনামধন্য মহিলা অ্যাডভোকেট সুহাসিনী রাথডের সঙ্গে, সুপ্রিম কোর্টের চেম্বারেই লাইভ সেক্স। অনিন্দ্যর অবয়বটা অস্পষ্ট হলেও, সুহাসিনীর নগ্ন দেহের প্রতিটা লোভনীয় অংশ স্পষ্ট। বয়স হলেও খারাপ দেখতে তো নয়। সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা। এখনও স্তন থেকে ভরাট নিতম্ব আবরণেই আকর্ষণীয়। যখন বে-আব্রু হয়ে আমোদে লিপ্ত হয়, আকর্ষণ দ্বিগুণ। সত্যি খবর সাড়া ফেলে না, যতটা এসব। তার ওপর সুপ্রিম কোর্টের চেম্বারে। তাও আবার এক হ্যান্ডসম কমবয়সী মন্ত্রীর সঙ্গে। রমরমিয়ে বাজারে খাচ্ছে। দেশের কোথায় কী সমস্যা, কী ভাবে তার উন্নতি করা যায়, কতটা কাজ এগিয়েছে, কী ভাবে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, সে নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই। সেক্স, রেপ, স্ক্যাম, মিডিয়ার হেডলাইন্স। টাকা এতেই আসে।

দিগ্বিজয় ড্রিঙ্কস হাতে, লেদার সোফায় হেলান দিয়ে, চ্যানেল সার্ফ করছিল। মায়া সুবিমলের সঙ্গে বেরিয়েছে। মেয়ে কলেজের এক্সকারশনে দার্জিলিং। ভাবছে, কী ভাবে টাকাটা ইনভেস্ট করবে। কলেজ শেষে মেয়েকে অ্যামেরিকায় পড়তে পাঠানোর ইচ্ছে। মা-মেয়ে দুজনেরই সেরকম ইচ্ছে। লুক ওয়েস্ট...

"হোয়ার ডিড ইউ গেট দিস ভিডিও ফ্রম?" মোবাইলে মুকেশের গম্ভীর আওয়াজ। টিভি মিউট করে দিল।

"হোয়াই? ফ্রম ওয়ান অফ মাই কন্ট্যাক্টস"

"দ্য ভিডিও ইজ হোক্স। ইট ইজ নট অফ অনিন্দ্য দেওরা"

"ইট ক্লিয়ারলি শোস অনিন্দ্য দেওরা"

"ইট ইজ নট। হি র‍্যাং আওয়ার অফিস। হি ডিসক্লেমড হিজ ইনভলভমেন্ট। হি ইজ মুভিং টু কোর্ট টুমরো ফর এ ফিফটি ক্রোর কম্পেনসেশন। হি অলসো থ্রেটেন্ড, হি উড মেক সিওর আওয়ার চ্যানেল ইজ অফ দ্য এয়ার ফর ম্যাল-অ্যালাইনিং হিম"

ছ্যাঁত করে উঠল বুকটা। অজানা আতঙ্ক যেন মাথা থেকে স্পাইন্যাল কর্ড বেয়ে নামছে। একটা ঝিলিক শরীরটাকে বেসামাল করে দিয়েছে। খোদ অনিন্দ্যর ড্রাইভার ভিডিওটা দিয়েছে। প্রশ্ন করেছিল "কইসে মিলা?"

"বাবুকা লেট হো রহা থা। মোবাইল মে কই বার ফোন করনে পর ভি নেহি পাকরায়া। মেরা বেটিকা বহুত তবিয়ত খারাপ, ঘর জানা জরুরি থা। ইসলিয়ে উধার গয়া, তো দেখা, বাবু রঙ্গালিয়া মনা রহা হ্যাঁয়। বেটিকো হাসপাতাল লে জানা জরুরি থা। বিবি আকেলে নেহি সকেগি। মুঝে রহা নেহি গয়া। মোবাইল মে ভিডিও খিঁচ কর, চল বসা। হামারে বেটিকা জিন্দেগি বাবুকা রঙ্গালিয়া সে জ্যাদা কিমতি। সহ নেহি গয়া"

অবিশ্বাস হওয়ার কোনও কারণ নেই। দিগ্বিজয়েরও অবিশ্বাস হয়নি। ইমোশনে মানুষ অনেক কিছু করে। সেখানে বদলা নেওয়ার জন্য ভিডিও তোলা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

"আই গট ইট ফ্রম সামওয়ান ভেরি ক্লোজ..." নামটা চেপে গেল।

"ড্যাম ইট, ফ্রম হুম ইউ গট। আই অ্যাম কনসার্নড অ্যাবাউট দ্য অথেন্টিসিটি। উই হ্যাভ সেন্ট দ্য ভিডিও টু দ্য টেকনিক্যাল ল্যাবরেটরি ফর অ্যানালসিস" কঠোরভাবে বলল "ইফ ইট ইজ রং ইউ আর ইন শিট"

মুকেশ ফোন কেটে দেওয়ার পর এসির মধ্যে দরদর করে ঘামছে। যদি ভুল প্রমাণিত হয়, ডিটিভি তাকে ছেড়ে দেবে না। এত কোটির কম্পেনসেশন! চ্যানেল বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা। ওই ছ কোটি টাকা সাপের মতো ছোবল মারছে। টাকার চেয়েও বড় তার রিপোর্টার জীবনের অস্তিত্ব সংকট। এত বড় খেলায় কোথায় দাঁড়াবে তার ঠিক নেই।

টিভি বন্ধ করে ঢকঢক করে বেশ কয়েক পেগ হুইস্কি গিলে ফেলল। মায়া কখন ফিরেছে জানা নেই। বিছানায় শুয়ে ঘুমের ভান। তবু ঘুম আসছে না। এত বছর তো, ছোটমোট এরকম অনেক খেলাই খেলেছে। কোথাও তো এভাবে ফাঁসেনি। এই প্রথম। শেষ কী?

কয়েকদিন পর মোবাইলে একটা অজানা নম্বর।

“দিগ্বিজয় ভট্টাচার্য?”

“ইয়েস”

“অনিন্দ্য দেওরা। ইউ আর দ্য পারসেন হু সোল্ড দিস ফলস ভিডিও অফ মি টু ডিটিভি। হু গেভ ইউ দ্য গাটস? নাউ এনজয় দ্য টিউন...”

তেইশ

ঘুম ভেঙে গেল দেওয়ালির। শীত করছে। হিমশীতল বেডরুম। চারদিকে অন্ধকার। চাদর ঢেকে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। সকালের এই ঘুমটা বড্ড আদুরে। বাবার বকুনি, তাও ছোটবেলায় সকালের ঘুমটা বড় প্রিয় ছিল। কাজের ফাঁকে ঝালিয়ে নেওয়া।

"এত দেরি করে উঠলে তোর কিসসু হবে না। সকালে উঠে ফ্রেস হয়ে পড়াশোনা করলে মনে থাকে। যে শুয়ে থাকে, তার ভাগ্যও শুয়ে থাকে"

"আহঃ বাপি... আরেকটু ঘুমতে দাও না" দেওয়ালি উলটো দিক ফিরে আবার সুখনিদ্রায় ডুব দিত।

যখন শুটিং নেই, জীবনটা হাতের মুঠোয়। এই লোখান্ডওয়ালা কমপ্লেক্সে সে-ই কর্ত্রী। বাধা দেওয়ার কেউ নেই, বাবাও আজ অবশ্য পৃথিবীতে নেই। অবচেতনে বাবার কথাগুলোই বোধহয় বেশিক্ষণ ঘুমোতে দিল না। এসির টেম্পারেচার বাড়িয়ে, চাদর সরিয়ে উঠে বাথরুমের দিকে এগোতেই চোখ পড়ল আয়নায়। উলঙ্গ দেহটাকে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে দেখল। রংটা শ্যামলা হলে কী হবে, তন্বী দেহে বুক আর নিতম্ব যেন ঢেউ খেলিয়েছে। আঁটসাঁট শরীরে কোথাও কি ফ্যাট জমেছে? বুকটা কী ঝুলে গেছে? নিতম্ব কী এখনও পুষ্ট? বোঝা যাচ্ছে না। ড্রেসিং টেবিলের আলো জ্বালিয়ে ঘুরেফিরে আবার দেখল তন্বী অবয়ব। নাঃ...

কাল রাতে ফেসটাইমে, অ্যামেরিকার এজেন্ট মার্ক হিগিন্সের সঙ্গে কথা বলার পর সচেতনতা দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। ডিসকানেক্ট করার পরও উত্তেজনা থামেনি। আনন্দের সঙ্গে অজানা আশংকা। পারবে তো? স্বপ্নটা মাটিতে নামলেও, তাকে ছুঁতে ভয়।

"গট ইট। ওয়ারনার ব্রাদ্যারস হ্যাভ সিলেক্টেড ইউ ফর ওয়ান অফ দেয়ার হলিউড প্রোডাকশনস"

"ইজ ইট? কান্ট বিলিভ"

"ইট ইজ ট্রু। দে কনফার্মড ইট বাই মেইল। আই অ্যাম ফরোয়ার্ডিং দ্য মেইল। অ্যান্ড বিলিভ ইট, ফর দ্য লিড রোল ইন দেয়ার আপকামিং প্রোডাকশন, দ্য পারসুইট"

স্তম্ভিত, বেশ কিছুক্ষণ মুখ দিয়ে কথা বেরয়নি। রিফিউজি কলোনি থেকে উঠে আসা মেয়ে হলিউডের নায়িকা! স্বপ্নেরও বাইরে। মার্কের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিল, তার বেশ কয়েকটা হিন্দি ছবির প্রোডিউসার, সত্যম ভাট। মার্ক ওর ফরেন লোকেশনে শুট-এর জন্য প্রায়শই বিদেশিনী সাপ্লাই করে। দেশ থেকে কাউকে সাইড রোলের জন্য ডেভস বা ইন্সক্রুকে নিয়ে যাওয়া অনেক এক্সপেন্সিভ। দেশ-বিদেশে লোকাল মহিলাদের রেক্রুট করে, কম খরচে কাজ হাসিল করে।

"প্রোফাইল ভেজ দে না। ফির নসিব মে লগে তো..."

সত্যম নিজেও আসা করেনি। কত মেয়েকেই না হদিস দিয়েছে। এদের মধ্যে কতজন পোর্টফোলিও পাঠিয়েছে, দেওয়ালির পরিচিত বন্ধুবান্ধবরাও। এর আগে কারও লেগেছে বলে তো শোনেনি। মার্ক বলছে, সি হ্যাস বিন সিলেক্টেড। দ্যাটস ইট। রোল কী তাও জানে না। ঠিকমতো করতে পারবে কি... ইংরেজির কতখানি পারফেকশন দরকার, তাও জানা নেই। লরেটোর ইংলিশে চলবে? না আরও বেটার? ছবির নাম পারসুইট, প্রোটাগনিস্ট বাঙালি। ওরা ইন্ডিয়ান ইংলিশই আশা করবে...

“ডোন্ট ফরগেট মাই এনহ্যান্সড পারসেন্টেজ উইথ দ্য লিড রোল, ইন অ্যাডিশন টু দ্য কন্ট্র্যাক্টেড পারসেন্টেজ”

“বাই অল মিনস। উডন্ট ডিপ্রাইভ ইউ অ্যাট অল আফটার দ্য গুড নিউজ” ভয় মেশানো আনন্দে বুকটা কাঁপছে।

আয়নায় আরেকবার নিজেকে দেখল। পর্দা সরিয়ে, আলো জ্বালিয়ে। পুরুষের ছোঁয়ার চেয়ে যা এই মুহূর্তে অনেক রোমাঞ্চকর। কী ভাবে নিজেকে সাজাবে... দেশি থেকে বিদেশি আঙ্গিকে। আরেকবার দেখল, ৫-৩ অবয়বটাকে।

চপল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তার ইউ এস পি। ৩৪বি-২৫-৩৫। পঞ্চাশ কেজির তন্বী দেহটা নিশ্চিত আগুন ছড়াবে। ব্রেস্ট অগমেন্টেশনের কী প্রয়োজন? মার্ক-ই ভাল বলতে পারবে। চরিত্রটা কী, না জেনে প্লাস্টিক সার্জারির পথে এগোনো ঠিক হবে না।

আজ গোয়েঙ্কা সাহেবের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট। ব্যান্ড্রা-কুরলা কমপ্লেক্সে ব্যান্ডস্ট্যান্ডের ওপর তাজ ল্যান্ডস এন্ড। ঠিক ছটায়, শার্প। সেদিন যখন কলকাতা থেকে রাজীব গোয়েঙ্কা ফোন করল, হকচকিয়ে গেছিল। ওর মতো ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের কাছ থেকে আচমকা ফোন আশা করেনি। খুব পোলাইটলি জিজ্ঞেস করেছিল “রাজীব গোয়েঙ্কা। আর ইউ ফ্রি টু টক?”

“সিওর”

“ওয়ান্ট টু মিট ইউ”

“আই অ্যাম ইন মুম্বাই, ফর শুটিং...”

“আই অ্যাম অন এ বিজনেস ট্রিপ টু মুম্বাই নেক্সট উইক। ক্যান ইউ মিট মি অ্যাট তাজ ল্যান্ডস এন্ড ইন ব্যান্ড্রা অন স্যাটারডে অ্যাট সিক্স?”

“আই থিংক দ্যাট ইজ মাই ডে অফ। আই উইল ডবলি চেক অ্যান্ড গেট ব্যাক টু ইউ”

স্যাটারডে, আজ ডে অফ। ইউসুয়ালি, সকালে শপিং সেরে দুপুরে ঘুম দেয়। বিকেলে কোনও পার্টি বা লঞ্চ প্রোগ্রাম থাকলে যায়। কিছু না থাকলে, জুহুতে কলেজের পুরনো বন্ধু শ্রেয়সীর সঙ্গে আড্ডা মারে। ওর বাড়িতে, নয় এখানে। কাজের বাইরে ফিল্ম সার্কেলের সঙ্গে মেশে না। তার মুম্বাই-এর সংক্ষিপ্ত জীবনে ফিল্ম ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে সে রকম দহরম-মহরম নেই। আবাহন নেই, বিসর্জনের প্রশ্নও ওঠে না। গোয়েঙ্কা সাহেবের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য আগে থেকেই শ্রেয়সীকে বলে এ সপ্তাহের আড্ডা অফ করে দিয়েছে।

আজ শপিং-এ যাবে না। সারাদিন একা ঘরে বসে হলিউডের ব্রেক সেলিব্রেট করবে, নিজে রান্না করে। ফ্রেঞ্চ কুসাইন। বাথরুম থেকে ফ্রেসেন্ড হয়ে, হাউসকোট জড়িয়ে, ফ্রিজ থেকে ব্রেইসড বিফ রেড ওয়াইনে ম্যারিনেট করতে দিল। ছ-ঘণ্টা ম্যারিনেট করতে হবে। জুস ডি বুফ ব্রেসি। বিফের সঙ্গে গাজর, মাশরুম আর আলু। শ্রেয়সীর কাছেই শেখা।

“ব্যস্ত আছ?” দিগ্বিজয় ভট্টাচার্য মোবাইলে।

“নাঃ ফ্রি”

“তুমি তো এখন মুম্বাইতে? ভাবছিলাম, যদি আমায় সাহায্য করতে পার। আই অ্যাম ইন বিগ ট্রবল”

“কেন? কী হল?”

"আরে তোমাদের মুম্বাই-এর এমপি অনিন্দ্য দেওরার একটা স্কুপ..." একটু থেমে বলল "লাইভ সেক্স রেকর্ডিং উইথ ওয়ান ফিমেল অ্যাডভোকেট অফ সুপ্রিম কোর্ট, ইন দ্য অ্যান্টি চেম্বার অফ দ্য কোর্ট, ডিটিভিতে বের করে দিয়েছি"

"টিভিতে দেখেছি, পেপারেও পড়েছি। আপনি ইনভলভড, জানতাম না"

"আমিই স্কুপটা দিয়েছিলাম। এখন ভিডিও এক্সপার্টরা প্রুভ করেছে, ওই সেক্স ভিডিওতে অনিন্দ্য ছিলই না। ইট ওয়াজ সামওয়ান এলস"

"আপনি ডবল চেক করেননি?"

"সেটাই তো ভুল করেছি। টাইম ওয়াজ শর্ট। পাছে অন্য কেউ বার করে ক্রেডিট নেয়, তাই আমিই ফাঁস করে দিই। জানই তো, এত মিডিয়া। দ্য লাইন ইজ হাইলি কম্পিটিটিভ। ওয়েস্টিং টাইম ইজ লুজিং বিজনেস। এখন ও থ্রেটেন করছে, আমার ইহকাল-পরকাল বরবাদ করে দেবে। ইফ হি পিকস দ্য স্টিক, আই অ্যাম ফিনিশড"

এই কী সেই লোক যে 'ফিফটি-ফিফটি' কমিশনে অভ্যাস্ত? এই কী সেই লোক, যে তার দেহটাকে ছিঁড়ে খাবে বলে শোভনের টাকায় বালি নিয়ে গেছিল? এই কী সেই মিডিয়ার আলিখিত ডন, যার ওপর ভর করে এক সময় রথের স্বপ্ন দেখেছে। তার এত কনট্যাক্ট থাকতে হঠাৎ দেওয়ালিকে কেন?

"তোমার তো মুম্বাইতে প্রচুর কনট্যাক্টস। কোনওভাবে ওর হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না?" পলিসড ওয়েতে জীবন-ভিক্ষা। ভাবছে... করবে? কিছু কী তার এক্তিয়ারে আছে যা করা যায়, নিজের পজিশন বজায় রেখে? কেনই বা করবে? দেয়ার ইজ নো ফ্রি লাঞ্চ ইন দিস ওয়ার্ল্ড। দিগ্বিজয়ের থেকে তার কী পাওয়ার আছে? বিশেষ করে, এই হলিউডে ঢোকার প্রারাম্ভে?

খেয়ালই করেনি, মোবাইল হাতে কখন জানলার পাশে চলে এসেছে। আনমনে তাকিয়ে আছে বিশাল মহানগরীর দিকে। দিনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভিড় বাড়ছে। দিগ্বিজয়ও দিনরাত ধান্দায় ব্যস্ত। আজ সে যেখানে যাওয়ার অফার পেয়েছে, তা কি এত লোক ধান্দাবাজি করেও হাসিল করতে পারে?

পুজোপাঠ করে না, তবু ঈশ্বর আর ভাগ্যকে তো ফেলতে পারে না। না হলে, এতজনের মধ্যে সে আর এমন কী, যে হলিউডে ডাক পাবে? ওখানেও একটা রোলের আশায় তার মতো অনেকেই রাতদিন মাথা ঠুকছে। ভাগ্যই যদি পরিণতি ঠিক করে, তাহলে ভবিতব্যই দিগ্বিজয়কে তার সামনে এনেছে। লোকটা ভাল না মন্দ, সে বিচারের দায় তার নয়। যদি কিছু করার থাকে, করে দিলেই হয়। ঈশ্বর কি তাকে পুরস্কৃত করার বদলে, দিগ্বিজয়ের মাধ্যমে কিছু চাইছে। ওকে ফিরিয়ে দেওয়া মানে কি ঈশ্বরকে অবজ্ঞা করা। ভাবছে... কোনও পরিচিতিকে যদি কাজে লাগাতে পারে। ক্লিক... সেলিব্রাল কম্পিউটার স্ক্রিনে। কে যেন আর্কাইভ থেকে নামটা ভাসিয়ে দিল...

"অনিন্দ্যকে চিনি না, তবে ওর স্ত্রী লিজার সঙ্গে পরিচয় আছে। ওর একটা প্রোডাকশন কম্প্যানি আছে। ওয়াটার এন্টারটেনমেন্টস। তেমন আহামরি নয়। তবে হ্যাঁ, চেনা আছে। কথা বলে দেখি। ফোনে হবে না, দেখা করতে হবে। আজ ফ্রি নই। কাল সকালে যদি পারি"

"তোমাকে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করব না"

"নাই-বা দিলেন। কথা বলে আপনাকে জানাব"

ফোনটা নামিয়ে তৃপ্তিতে মন ভরে গেল। হলিউডে নায়িকা হওয়ার থেকে যা একটুও কম নয়। যাকে জাগতিক সাকসেস বা ফেলিওরের মাপকাঠিতে হিসেব করা যায় না। শুধুই অনুভব।

সিক্স ও'ক্লক। তাজ ল্যান্ডস। রিসেপশন বলল "সুইট নাম্বার ১৩১৩। থারটিন্থ ফ্লোর"

রাজীব দরজা খুলে দিল "কাম ইন। মেক ইওরসেলফ অ্যাট হোম। ড্রিঙ্ক? সফট অর হার্ড?"

"মক্টেল প্লিজ"

"গিভ মি এ মোমেন্ট টু প্লেস দ্য অর্ডার"

তেরো তালার ওপর পর্দা টানা এক্সিকিউটিভ স্যুট। নীচে টোয়াইলাইটের আঁচলে মোড়া ব্যস্ত মেট্রোপলিস। দূরে তার আঁচলে ঢাকা, বিস্তৃত অ্যারেবিয়ান সি। সূর্যের শেষ আলোয়, সাগরের অদ্ভুত মায়াময় রূপ। সরু বিচের বালিগুলো ছাই রঙা, রুপালি রাজপুত্তুরের মতো ঝিকমিক করছে। দামাল ঢেউ। হাজার সূর্যের কুচি গায়ে মেখে খেলা করছে। কাড়াকাড়ি করছে আলোর টুকরোগুলো নিয়ে। মাঝেমাঝেই ঝাঁপিয়ে পড়ছে বালিয়াড়িতে।

"কমফরটেবল?" মাথা নাড়ল দেওয়ালি "আই হ্যাভ অর্ডারড ইওর টম কলিন্স উইথ সাম রিসোটো উইথ প্রন্স অ্যান্ড ক্রগেটেস। ইউ আর নট অ্যালারজিক টু প্রন্স, আর ইউ?"

"নো"

"আমারা কলকাতার লোক তো, মাছটাই প্রিয়। অবশ্য আমি ভেজিটেরিয়ান। ইউ হ্যাভ টু এক্সকিউজ মি" এবার স্পষ্ট বাংলায়।

মাছ খাইয়ে কী মাছ তুলতে এসেছে বোঝা যাচ্ছে না। এন্টারটেন্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রি হাতের মুঠয়। মাথা নাড়া ছাড়া কোনও উপায় নেই। যতক্ষণ না উদ্দেশ্যটা প্রকাশ পায়।

"তোমার বিজি সেড্যুলের মধ্যে ডেকে পাঠিয়েছি একটা প্রপোসাল নিয়ে" কোনও ভণিতা না করেই রাজীব সরাসরি কথায় এল "আমরা তোমাকে আমাদের নতুন গ্রুপের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার করতে চাই। অবশ্য তোমার যদি আপত্তি না থাকে..."

"আমি কলকাতার মেয়ে। আপনাদের গ্রুপের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার হওয়া তো আমার সৌভাগ্য" দেওয়ালি টম কলিন্সে চুমুক দিয়ে বলল "তবে আমার বিজি সিড্যুলে কতখানি সময় দিতে পারব, তাই ভাবছি"

"সব সময় ফিসিক্যাল প্রেসেন্স যে জরুরি, তা নয়। মেইনলি দ্য প্রেসেন্স অফ ইওর নেম অ্যান্ড পিকচার। ফিসিক্যাল প্রেসেন্স লাগলে, উই উইল গিভ ইউ এনাফ নোটিস। অফ কোর্স, উই উইল রেমুনারেট ইউ অ্যাডিকোয়েটলি অন এ ইয়ারলি রিটেইনার"

"ইফ ইউ ক্যান অ্যাডজাস্ট টু মাই সিডিউল, আমি রাজি"

টেবিলে রাখা ব্রিফকেস থেকে একগোছা লিগ্যাল কাগজ এগিয়ে বলল "দেন হিয়ার ইজ দ্য কন্ট্র্যাক্ট ফর্ম। মন দিয়ে পড়। ডিনার খেয়ে যাবে?"

"নাঃ... আই হ্যাভ আদার এনগেজমেন্টস"

লিগ্যাল মারপ্যাঁচ তেমন কিছু নেই। রাজীব যা বলেছে, তাই। অ্যানুয়াল রেমুনারেশন এক কোটি কুড়ি লক্ষ। মানে মাসে দশ লাখ সিকিওর্ড ইনকাম। নট এ ব্যাড প্রপোসাল আফটার অল... আজ সিনেমা আছে,

অফারস আছে, কালকে নাও থাকতে পারে।

"কোথায় সই করতে হবে?"

রাজীব ডুপ্লিকেট কনট্র্যাক্ট ডকুমেন্ট বার করে বলল "দুটো কপিতেই। একটা তোমার জন্য"

চেক লিখে বলল "হিয়ার ইউ আর... ওয়ান ক্রোর টুয়েন্টি ল্যাখস, অ্যাস আই সেইড"

দেওয়ালি চেকটা দেখল। অ্যাকাউন্ট পেয়ি। যা বলেছে তাই।

"দিস ইজ এ অফিশিয়াল রেক্রুটমেন্ট। সো ইট হ্যাস টু বি হোয়াইট। অবশ্য তোমার ট্রিপস অ্যান্ড ইন্সিডেন্টাল এক্সপেন্সেস, মানে পার্কস, আমরা অন্যভাবে রেমুনারেট করে দেব"

"ইট ইজ এ প্লেসার টু বি অফ সার্ভিস টু ইউ" চেকটা লেদার পার্সে গুঁজে দেওয়ালি বলল।

"আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ডিটেন ইউ এনি লঙ্গার। বললে না, এনগেজমেন্টস আছে। আমাকেও বিজনেস ডিনারে বেরোতে হবে"

তাজ ল্যান্ডস এন্ড থেকে বেরিয়ে ব্যস্ত ওয়েস্টার্ন এক্সপ্রেসওয়ে। তাকিয়ে আছে সামনের গাড়ির টেল ল্যাম্পে। উইকএন্ডে দু-দুটো অফার! আজ দেওয়ালি ভাবছে জীবনটা কতখানি সত্যি!

সত্যিই তো। রাতের আকাশে তাকিয়ে, তারা গোনার প্রয়োজন নেই। মন্দির, মসজিদ, গির্জায় মাথা ঠুকে চাওয়ারও কিছু নেই। সিনেমার স্ক্রিপ্ট থেকে একটু আলাদা। পরের সিকোয়েন্সটাও অজানা, গল্পটা তো বটেই। শুধু সেই অদৃশ্য স্ক্রিপ্ট-রাইটারের নোটে নিপুণ অভিনয় করে যেতে হবে ভবিতব্যের ডিরেকশনে, লাইফের ফুল লেংথ ফিচার ফিল্ম।

মোবাইলটা বেজে যাচ্ছে। সি এল আই তে উঠেছে দিগ্বিজয় ভট্টাচার্যের নাম। বাজুক। ফোন তুলল না। এখন কথা বলে সময় নষ্ট করার মানে হয় না। যা করার, সেটাই করবে। ফ্ল্যাটে ফিরে একবার মনে হল রিং ব্যাক করে। যদি এর মধ্যে আর্জেন্ট কিছু ঘটে থাকে... না থাক। লিজাকে ফোন করল "ক্যান উই মিট টুমরো টু ডিসকাস সামথিং ভেরি আর্জেন্ট?"

"সিওর। জয়েন মি ফর ব্রেকফাস্ট অ্যাট মাই প্লেস। উড বি এক্সপেক্টিং ইউ"

চব্বিশ

"থ্যাংক ইউ ফর ইওর কাইন্ড সার্ভিসেস। অ্যাস ইউ আর মোর বিজি উইথ ফিল্ম প্রোডাকশন অ্যান্ড ইন মুম্বাই, উই রিলিভ ইউ ফ্রম ইওর কমিটমেন্টস অ্যাস এ ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার অফ আওয়ার গ্রুপ"

ছ্যাঁত করে উঠল পদ্মপর্ণার বুকটা। একদিন হয়ত হওয়ারই ছিল। কিন্তু তিন বছর এক নাগাড়ে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার থাকার পর প্রদীপ গোয়েঙ্কার কাছ থেকে এই মুহূর্তে কথাগুলো আসবে, আঁচ করতে পারেনি। তাহলে কী সত্যিই ফুরিয়ে গেছে! বুড়ো হয়ে যাচ্ছে? গ্ল্যামার কমে যাচ্ছে? নাকি কালের নিয়মে ক্রমশ হারিয়ে যাওয়ার পথে?

সে তো শুধু এই সময়ের উজ্জ্বল তারকা নয়, রাজীবের ঘনিষ্ঠও। নাকি, পুরনো সম্পর্কগুলো শিথিল হয়ে যাচ্ছে? প্রদীপ ব্যবসাদার মানুষ। ইনভেস্টমেন্ট ভালই বোঝে। বিজনেসম্যানের কাছে ব্যালেন্সশিটের চেয়ে বড় কিছু নেই। সেখানেই ভয় - নিজের ভাও কমে যাওয়ার ভয়। এই লাইনে ভাও কমলে, হারিয়ে যাওয়া অনিবার্য। কেউ রুখতে পারবে না।

স্বপ্নপরির মতো তার উত্থান যেন হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়েছে অজানা বাঁকে। 'শান্তির দূত' সিরিয়াল দিয়ে অভিনয় জগতে প্রবেশ। প্রথম ছবি জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত 'মার্বেল প্লেট'-এ সহ-অভিনেত্রীর ভূমিকায় টলিউডের চোখ পড়েছিল সেই নবাগতার অভিনয় দক্ষতার দিকে। পরে 'ফেরিওয়ালা' সিরিয়ালে দর্শকের মনে পাকাপাকি জায়গা, যেন নিজের জীবনকেই বেচতে বসেছে মেহফিলে। শুভ্রজিৎ তখন ধীরে ধীরে উঠছে। তার সঙ্গে জুটি বেঁধে একের পর এক ছবি হিট। উত্তম-সুচিত্রার পর, বাংলা বাজারের হিট পেয়ার। টলিউডের আকাশ ছেয়ে ফেলেছে মায়াবী আকর্ষণে। তামাম বাংলা মাতিয়েছে।

টলিউডে টাকা নেই, তাই বলিউড। কপাল মন্দ, লাগল না। ব্যাক টু হোম। আবার আধিপত্য। কমার্শিয়াল সাকসেসের মাঝে তার নক্ষত্রলোকে আচমকা কর্ণ ঘোষের আবির্ভাব। 'জ্বালা' ছবিতে অভিনয়ের জন্য ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড। খ্যতি, যশ, প্রতিপত্তি। শুধু গ্ল্যামারাস নায়িকাই নয়, ক্যারেক্টার রোলেও নাম্বার ওয়ান।

শুভ্রজিতের বিচ্ছেদে তিক্ত অভিজ্ঞতা। মুম্বাইতে দ্বিতীয় চেষ্টা। ভাগ্যদেবী মুখ তুলে চাইলেন। 'পত্নী কে রং' 'জীবন মেল' 'জানে ইয়া আনজানে' - বলিউডের বেলাভূমিতে জায়গা পাকা। শুধু তার কেন, স্বামী মৃত্যুঞ্জয়ের ভাগ্যের চাকাও একই সঙ্গে ঘুরতে শুরু করল। মাস মাইনের চাকরি ছেড়ে সিঙ্গাপুরে নিজের কন্সাল্টেন্সি। ঠিক একই সময় প্রদীপের সঙ্গে ওদের গ্রুপের চুক্তি।

"ব্যাপারটা আর কিছু নয়। বিজনেসের নিয়ম মোর হ্যপেনিং ফিগার দিয়ে মার্কেট করা, টু ইনক্রিজ দ্য অ্যাট্রাকশন। দেওয়ালি সিমস টু বি মোর ইন ডিমান্ড এভ্রিহয়ার। কান্ট হেল্প। আই হ্যাভ এ বিজনেস টু রান" এটাই স্টারডমের পরিণতি। কিন্তু মেনে নিতে মন চায় না।

"আপনি যা ভাল বোঝেন..." বললেও ভাবছে, হারনো দুনিয়ায় আবার কী ভাবে বিরাজ করা যায়। নতুন ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার তাহলে দেওয়ালি। আপকামিং ফেস অফ দ্য সোবিজ ইন্ডাস্ট্রি। স্টারডমের আসনটা নড়বড়ে। বয়সের সঙ্গে নতুনরা জায়গা করে নেয়। সিঙ্গাপুরে কর্তার ব্যবসায় যোগ দিয়ে ঘরসংসার করতেই

পারে। সেখানে গ্ল্যামারের চাকচিক্য মরীচিকা। চুম্বকের আকর্ষণ থেকে বেরনো সহজ নয়... রাজীবের অফিস থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠে ফোন করল এক সময়ের প্রতিষ্ঠিত চিত্র পরিচালক অমিয় মজুমদারকে।

"ফ্রি আছেন? আসতে পারি?"

"চলে এস আমার ফ্ল্যাটে"

রিজেন্ট এস্টেটের ফ্ল্যাটে ঢুকতেই অমিয়বাবুর সাদর আপ্যায়ন "অনেকদিন পরে। কী খাবে, চা না সরবত?"

"বড্ড গরম। সরবত" জিরাপানিতে চুমুক দিয়ে বলল "আপনি অনেকদিন আগে বলেছিলেন না, ছবির স্ক্রিপ্ট লিখেছেন"

"হ্যাঁ অনেকদিন ধরে বসে আছি। প্রোডিউসার পাচ্ছি না। আজকালকার ছেলেদের মতো ধান্দাবাজিও করতে পারি না। এত ভাল ছবি করার পর, এই বয়সে কার কাছে হাত পাতব? বিবেকে লাগে। আমার বোধহয় ছবি করার দিন শেষ হয়ে এসেছে"

"একদম নয়। আমি আপনার ছবি প্রোডিউস করব। আমাকে কিন্তু নায়িকার রোল দিতে হবে"

"বেশ, তাই দেব। স্ক্রিপ্টটা শুনবে? সময় আছে?"

মাথা নাড়ল পদ্মপর্ণা "বাজেট কত?"

"রিসেন্টলি ক্যাল্কুলেট করিনি। আগে করেছিলাম। এক কোটি কুড়ি লক্ষ মতো। এখন অবশ্য দাম বেড়ে গেছে। দেড় কোটি মতো ধরে রাখতে পার"

"নো প্রবলেম"

টাকাটা কোনও ফ্যাক্টর নয়। ফিল্মি অস্তিত্বটাই সব। এখনও এমন বয়স হয়নি যে সিনেমা ছেড়ে দিতে হবে। চেহারাটা একটু ভারী হয়েছে, তাতে কী? মিনি স্কারট নয় না-ই পরল। মেক-আপ লাগালে গ্ল্যামার এখনও আটুট। অভিনয়ে কোনও খামতি নেই। তাহলে সেন্টার স্টেজ ছেড়ে দেবে কেন? যদি নিজেই প্রোডাকশন করে লাইমলাইটে থাকা যায়... এখনও রিটায়ারমেন্টের সময় হয়নি। অমিয়বাবুর মতো দক্ষ চিত্র পরিচালকের হাতে পড়লে, রাজীবকে বোঝানো মুস্কিল হবে না, তার আসন কোথায়।

"আজ আমি টোটালি ফ্রি। স্ক্রিপ্ট শুনতে তো সময় লাগবে। আমি এখানেই খাব"

"বস। তোমার খাবারের কথা বলে, স্ক্রিপ্টটা নিয়ে আসি"

"কাম ইমিডিয়েটলি। টেক দ্য নেক্সট ফ্লাইট" মৃত্যুঞ্জয়ের ফ্র্যান্টিক কলে ঘাবড়ে গেল পদ্মপর্ণা।

"কেন, কী হয়েছে?"

"স্পন্দনের স্কুলে খেলতে গিয়ে অ্যাঙ্কেলে ফ্র্যাকচার হয়েছে। বোধহয় অপারেট করতে হবে"

"আই অ্যাম অন মাই ওয়ে"

ছাঙ্গি এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে গাড়িতে বসে মৃত্যুঞ্জয় বলল "আমি একা কদ্দিক সামলাই? আমারও তো বিজনেস বাড়ছে। এবার তোমার ছবির নেশা কমাও। ঘর সংসারের দিকে মন দাও"

পদ্মপর্ণা চুপ। দুনিয়ার গুড বাই মেনে না নিতে চাইলেও, কর্তার আবদার তো উপেক্ষা করা যায় না। সত্যি তো, কতটা সময় দিয়েছে সংসারের জন্য? এত বছর শুধু কেরিয়ার, স্টারডমের পেছনে ছুটেছে।

মৃত্যুঞ্জয় বাধা দেয়নি। এখন আর একা সামলে উঠতে পারছে না। এই পনেরো বছরে নীরবে বউয়ের স্টারডমের নেশায় তাল মিলিয়ে সাপোর্ট দিয়ে গেছে। এখন একটু আশা করতেই পারে...

"অপারেশন করতে হবে?"

"তাই তো বলছে। পায় স্ক্রু লাগাতে হবে"

"ও কোথায়?"

"স্কুল থেকে হাসপাতালে ভর্তি করেছি। ওখানেই যাচ্ছি"

স্পন্দন মাকে দেখে ভরসা পেল "মম আই অ্যাম গ্ল্যাড ইউ আর হিয়ার"

"আই উইল বি উইথ ইউ অ্যাস লং অ্যাস ইউ ওয়ান্ট মি"

"দেন ডোন্ট গো ব্যাক টু কোল। আই ফিল সিকিওর্ড হোয়েন বোথ আফ ইউ আর অ্যারাউন্ড"

ছেলের আবদার যেন অন্য সুর শোনাচ্ছে। বহুদিন পর অনুভব করছে, সে কলকাতার গ্লিটজ-এর উজ্জ্বল নক্ষত্র নয়, শুধুই মা। নাই-বা রইল স্টারডম, ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডারের মুখোস। ওই কৃত্রিম দুনিয়ার বাইরেও তো আর পাঁচ জনের মতো একটা জীবন আছে, তার ছোট্ট একটা সংসার। বিয়ে হলেও, মাহাত্ম্য বোঝেনি। আজ অনুভব করছে, অবহেলিত সত্ত্বাকে। এখানেই সে সম্পূর্ণ।

"আই উইল বি উইথ ইউ অ্যাস লং অ্যাস ইউ ওয়ান্ট মি হিয়ার। ইফ নিড বি, পার্মানেন্টলি"

ঠিক করেই ফেলেছে, অমিয়দার ছবিটা শেষ করে, নিজেকে গুটিয়ে আনবে। তার এত বছরের সাজনো বাগান, যেখানে হাজার ফ্ল্যাশের ঝলক নেই। ওই গ্লিটজের বাইরে।

মৃত্যুঞ্জয়কে বলল "সেই ছোটবেলায় কী সুন্দর বাজাতে। এখন কী রেওয়াজ ছেড়ে দিয়েছ?"

"আবার ধরতে পারি, তুমি এখানে থাকলে..."

"ছেলেকে বললাম তো, এখানেই থাকব। আমিও আবার ছবি আঁকায় মন দেব"

মৃত্যুঞ্জয় মৃদু হেসে বলল "বেশ তো। আজ থেকেই তবে আবার রেওয়াজ শুরু করব। রাগ রামকলি"

"এটা কীসের রাগ?"

"প্রত্যুষের, শান্তির রাগ। এখনও সব ভুলে যাইনি"

হাসপাতালের বাইরে, তীব্র গতিতে গাড়িগুলো ছুটছে। সেদিকে তাকিয়ে পদ্মপর্ণার মনে হল, ওরা পাগল। ছোটার কী কোনও শেষ আছে? হাসপাতালের এই কেবিনে স্পন্দনের হাতে হাত রেখে, মৃত্যুঞ্জয়ের পাশে দাঁড়িয়ে অনেকের মতো আরেক জগৎ হাতছানি দিচ্ছে। এখানে কেউ তাকে চেনে না। শুধু স্বামী, ছেলে আর মেয়ে। এটুকুই যথেষ্ট। এর বাইরের ছুটে চলা দমকা হাওয়া, সব লণ্ডভণ্ড করে দিতে পারে। তার থেকে ভোরে উঠে ওর হাতে সেতারের ঝংকার শোনাই ভাল।

মৃত্যুঞ্জয় বুঝতে পেরে পদ্মপর্ণার দিকে তাকিয়ে বলল "তবে কাল থেকে ললিত রাগ দিয়ে শুরু করা যাক"

"সেটা কীসের রাগ?"

"প্রত্যুষের। সেই ছোটবেলা থেকে আলাপ। দেখতে দেখতে বিয়ের পর পনেরোটা বছর পার হয়ে গেল। তোমার ফেরার আশায় থাট কাইফির তালটাও ভুলে যেতে বসেছি"

"কী সব বলছ, কিছুই বুঝতে পারছি না..."

“সাহানা রাগের গ্র্যামার। ওসব ভেবে কাজ নেই। তুমি যে রংমহল থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছ, সেটাই বড়। অনেক তো ছোটাছুটি, লাফালাফি হল। এখন স্পন্দনের তোমাকে প্রয়োজন। আর কদ্দিন তোমাকে ছেড়ে থাকবে?”

“ও ভাল হয়ে গেলে আর এক মাস। অমিয়বাবুকে কথা দিয়েছি, ওনার আগামী ছবি প্রডিউস করব। ব্যস... ওটার পর আমি এখানেই”

“সত্যি? নামের এমনই মোহ, সব ছেড়ে আসতে পারবে?”

“কেন পারব না? তোমাকে যখন বিয়ে করেছিলাম, তখন আমি একাই রাজ করছি টলিউডে। সেদিন কী কোনও নামী দামি লোককে চেয়েছি। সেদিনও ছিলাম ছোটবেলায়। আজও আবার ফিরে আসব স্পন্দনের হাত ধরে। যেদিন তোমার সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল ম্যালে। স্পষ্ট মনে আছে, সেদিন ছিল ভূপতি নাথ। মাঝখানের রাগগুলো বাদ দিলে, আজকে তো আবার ললিত”

মৃত্যুঞ্জয় বুঝতে পারছে, পদ্মপর্ণা কিছুই ভোলেনি। হয়ত ঠিকই বলছে। স্পন্দনের হাত ধরে ললিত রামকলি হতে কতক্ষণ?

আলতো করে পদ্মপর্ণার হাতে চাপ দিয়ে বলল “ইট ইজ নেভার টু লেট টু স্টার্ট ইয়েট ওয়ান্স এগেন”

পঁচিশ

কাতার এয়ারওয়েজের কলকাতা-হিউস্টন ফ্লাইট। প্রায় চব্বিশ ঘণ্টার মাঝে দোহায় দু-ঘণ্টা হল্ট।

ঋষিকা কায়দা করে শোভনদার পাশে জানলার আয়েলসের সিটটা দখল করে নিল, অঞ্জনদা ডাইভ দেওয়ার আগেই। এমনিতে তো শোভনদাকে এতটা সময়ের জন্য একা পাওয়া যায় না। এই লং ফ্লাইটে শোভনদার সঙ্গে কিছু কথা সেরে ফেলতে হবে। শোভনের জন্যই তো তার এই বঙ্গ সংস্কৃতিতে গাওয়ার সুযোগ। নইলে এত গায়ক-গায়িকা থাকতে, ঋষিকা সুযোগ পায়? সবটাই লাইনের খেলা। এত গায়িকার মধ্যে সে আর ইমা ম্যানেজ করেছে। কারণ শোভন স্পন্সর। তাই কলকাতার লিটারারি অ্যাম্বাসাডার। যে মালকড়ি ছাড়ে, অ্যামেরিকার বাৎসরিক উৎসবে, তারই সব থেকে বেশি ভেক। বিদিতা বসুর মতো সাংস্কৃতিক উদ্যোক্তারা খুব ভাল করেই জানে।

পঞ্জি কেলেঙ্কারি ফাঁস হওয়ার পর গোটা রাজ্যে স্পন্সরশিপের খরা। এখন আর সাধারণ মানুষের টাকা নিয়ে ফুর্তি করার জন্য কেউ মালকড়ি ছাড়ছে না। বছরের আসল কামাই, এই ফরেন অনুষ্ঠানের দৌলতে। কলকাতার উদীয়মান সংস্কৃতির হিসেব চল্লিশ বছর আগে দেশছাড়া এনআরআই বাঙালিরা রাখে না। কিছু অতীতের নাম আর স্পন্সরের রেকমেন্ডেশন অনুযায়ী পারটিসিপ্যান্ট ঠিক করা হয়।

"আপনি জানলার ধারে বসবেন?"

"না না, তুমি বস। আমি এখানেই ঠিক আছি" অ্যাটাচিটা সন্তর্পণে ওভারহেড লকারে গুছিয়ে রেখে বলল।

"লং ফ্লাইটের জানলায় বসলে ঘুমিয়ে নেওয়া যায়"

পেছনে ফিরে দেখল, ইমা জায়েগা খুঁজছে। ওই তো, অঞ্জনদার পাশে একটা সিট খালি আছে। ওখানে বসছে না কেন? কে জানে? মরুক গে। ওর ব্যক্তিগত ব্যাপার। যেখানে খুশি বসবে।

ক্রুইজিং হাইটে পৌঁছতে ঋষিকা বলল "তোমার জন্যই এই সুযোগ। থ্যাংক ইউ"

তৃপ্তির হাসি। শোভনের নিজেকে ইম্পরট্যান্ট মনে হল। এই আত্মতৃপ্তিটাই তো বাঁচার পাথেয়। কদরের মধ্যে যে তৃপ্তি আছে, টাকার মধ্যে নেই। ঋষিকার দিকে তাকাল। এখন আর সে শাড়ি পড়ে নয়। এই ভারিক্কি চেহারায় জিনস, টপস মন্দ লাগছে না। তবুও তো গিন্নির থেকে রোগা। মেয়েদের দেহে একটু চর্বি না থাকলে ভাল লাগে? গিন্নির মতোও ধুমসি নয়, ইমার মতো শুটকি নয়। ভালই হয়েছে, ঋষিকার পাশে সিট পেয়ে। নইলে ওই বুড়ো অঞ্জনদার পাশে বসে সারা রাস্তা ধান্দার ইতিবৃত্ত শুনতে হত।

"জামাটা নতুন কিনলে? আগে তো দেখিনি"

"কিছুদিন আগে অ্যাটলানটায় প্রোগ্রাম ছিল, ওখান থেকেই কিনেছি। কলকাতায় তো এসব জামা পরা হয় না। এই বাইরে এলেই যা একটু পরা" ঋষিকার মিষ্টি হাসি।

ভোর সাড়ে চারটে। এয়ার হস্টেস লাইট স্ন্যাক্স সার্ভ করার ফাঁকে ঋষিকা বলল "একটা কথা তোমায় অনেকদিন বলা হয়নি। আমাদের অশ্বিনী দত্ত রোডের তিন তলার ফ্ল্যাটটা বড্ড পুরনো। বয়স হচ্ছে তো,

দিনে এতবার সিঁড়ি ভাঙা আর পোষাচ্ছে না। তোমার তো অনেক চেনাজানা। রাজেরহাটে একটা ফ্ল্যাট জোগাড় করে দিতে পারবে?”

“কটা বেডরুম?”

“তুমি যা পারবে। থ্রি হলে ভাল হয়। অফ কোর্স, লিফট থাকা চাই। বুঝতেই পারছ, টাকাপয়সা বিশেষ নেই। দুজনের গান গেয়ে যেটুকু রোজগার। যত কম দামে...”

ভালই বুঝতে পারছে। বিনা পয়সায় না হলেও মিনিমাম খরচে। ইউসুয়ালি এ সব আবদার পাশ কাটিয়ে যায়। কিংবা স্বভাববশত ভুলে যায়। এখানে তেমন কোনও ফায়দা নেই। নিজের নামের ব্যাপ্তির অবকাশও নেই, যা আছে হিউস্টনের বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে “দেখি চেষ্টা করে”

“দেখি না, করে দিতেই হবে। জানি তুমি চাইলেই পারবে”

শোভন কোনও উত্তর দিল না। ম্যাগনো ইন্ডিয়ার কর্তা বলে কথা। নিজের স্বার্থ ছাড়া, অন্য কোনও ব্যাপারে কতখানি প্রাধান্য দিতে হবে, ভালই জানা।

রিসেপশন কমিটি অপেক্ষা করছিল গাড়ি নিয়ে। এয়ারপোর্ট থেকে সোজা লামারের হোটেল হিল্টনে থাকার ব্যাবস্থা। অন্যান্য পার্টিসিপ্যান্টদের জন্য এক্সিকিউটিভ রুম। শোভনের ম্যাগনো ইন্ডিয়া যেহেতু স্পন্সর, তাই ওর জন্য এক্সিকিউটিভ স্যুইট। সেটাই আজকের সংস্কৃতি। যে টাকা দেবে তার খাতিরই আলাদা। সর্বত্রই স্পন্সরের জয়জয়কার। কোথাও কী সংস্কৃতির সঙ্গে, স্পন্সরশিপের এক অলিখিত মেলবন্ধন আছে? উদ্যোক্তারা স্বীকার না করলেও, অবশ্যই আছে।

শুধু বঙ্গ সংস্কৃতি কেন?

কলকাতা বুক ফেয়ার, এপিজে লিটারারি মিট থেকে জয়পুর লিটারারি ফেস্ট। প্রতিভার থেকে মুখ্য নেট-ওয়ার্কিং আর সুবিধার অঙ্ক। প্রবাসী লেখকদের আমন্ত্রণ করে আনতে পারলে, বিনিময়ে বিদেশের ফেস্টে আমন্ত্রণের সম্ভাবনা। তাই পোড়া দেশের লেখকরা কদর না পেলেও, প্রবাসী লেখকদের কদরই বেশি। আর বিদেশি সাদা চামড়া হলে তো কথাই নেই। সাদা চামড়া দেখলেই ভয় জড়োসড়ো কেঁচো হয়ে পা চাটতে শুরু করে। দেশ স্বাধীন হলেও মানসিক পরাধীনতায় ক্রীতদাস জাতি কি এর থেকে কিছু বেশি ভাবতে পারে? পারে না। যদি পারত, তবে শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে, নিজের অস্তিত্ব সদর্পে প্রতিষ্ঠা করত। স্বাধীনতার সাতষট্টি বছর পরেও হিসেবটা সেই এক।

ভাগ্যিস রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন আর স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগোতে বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ। না হলে, বাঙালি কী তাদের মনে রাখত? না তাদের ভজনা করে নিজেদের হারানো গৌরব ফিরে পাওয়ার ব্যর্থ চেষ্টায় লেগে থাকত! দেশে সম্মান পেতে গেলে আজও বিদেশিদের স্বীকৃতিই সব।

দ্য জর্জ আর ব্রাউন কনভেনশন সেন্টারের থার্ড ফ্লোরে এ বছরের বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন, থুড়ি উৎসব। এলাহি আয়োজন। সংস্কৃতির ঝর্নার চেয়ে সাজ-বাহার বন্যাই বেশি। বড়লোক বাঙালি অ্যামেরিকানরা উইক এন্ডে বং-কানেকশনটা ঝালিয়ে নিতে এসেছেন। উপনিবেশের পত্তনকালে কলকাতার বাবুদের হপ্তাশেষের আমোদ মনে পড়ে... চল্লিশ বছর আগে দেশ ছাড়া বাঙালিরা আজকের বিবর্তিত কৃষ্টিকে না জেনে সেই

অতীতকে আঁকড়ে বাঙালিয়ানা বজায় রাখতে চাইছেন। পরের জেনারেশন তো আর বাংলার তোয়াক্কা করে না। বৈভবের মধ্যে অস্তিত্বকে ফিরে পাওয়ার মহোৎসবে মত্ত।

এক ফাঁকে শোভন অঞ্জনদাকে এক কোণে গিয়ে বলল "আমার 'নতুন রূপে বিবেকানন্দ' বইটার ওপর সেমিনার আছে। আমি তো বিবেকানন্দ সম্বন্ধে কিছুই জানি না..."

"সে জন্যে তো আমি আছি। ফ্লাইটে তোমার পাশে বসতে চেয়েছিলাম, পুরো ব্রিফ করার জন্য। কিন্তু ঋষিকা আগেভাগে ওখানে গেঁড়ে বসল বলে, আর হয়ে উঠল না..."

"তাহলে?"

"প্রোগ্রামের ফাঁকে ব্রিফ করে দেব। সুবিধামত ডেকে নিও"

"ইমাকে দেখছি না। ও কোথায়?"

শোভনের প্রশ্নের উত্তরে অঞ্জনদা বলল "কী করে বলি? নিশ্চয়ই অরগ্যানাইজারদের সঙ্গে ধান্দা করছে"

অঞ্জনদার উন্নাসিকতায় খটকা লাগলেও, ভাবার অত সময় নেই। অন্যান্য স্পন্সরদের সঙ্গে একটা স্পেশাল ডিনারের আয়োজন করেছে অরগ্যানাইজাররা। জগৎজং, পিএফপি টেজনলজি এরা সব থেকে বেশি দিয়েছে, তাই কোহিনুর স্পন্সর। তারপর ম্যাগনো এবং অন্যান্যরা প্ল্যাটিনাম স্পন্সার। পরে সোনা, রুপো আরও নানাবিধ অলঙ্কারে স্পন্সররা নামাঙ্কিত। এত হিরে-মাণিক যদি দেশের কোনও কাজে লাগত। আধমরা ইকনমির উঠোনে দাঁড়িয়ে অনেক না হোক, কিছু তো করা যেত। তাতে কার কী? দেশের উন্নতি হল, কি না হল, এনআরআইদের কী কিছু যায় আসে? মাঝেমধ্যে দেশে গিয়ে পরিচিতিটা ঝালিয়ে নেওয়া আর দামি লাইফস্টাইল মাফিক বিদেশের মাটিতে বং সং এনজয় করার মধ্যেই তাদের দেশাত্মবোধ। রাবিন্দ্রিক চর্বিতচর্বণে জাতে ওঠা।

বিবেকানন্দ শিকাগোতে কবে কটা লেকচার দিয়েছিলেন, জানার দরকার নেই। নিদেনপক্ষে, পারলামেন্ট অফ ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়নসে লেকচার দিয়ে বাঙালির মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন, এটুকুই কাফি। বিচক্ষণ কিছু মানুষ হয়ত ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ ডেটটা জানতে পারে। তাহলেই বিবাকানন্দকে জেনে প্রকৃত বাঙালি হওয়া যাবে। এই ফাস্ট লাইফে কার এত সময় আছে, বিবেকানন্দর নটা ভল্যুম পড়ার, বোঝার? সেদিন অ্যামেরিকা জয় করে বিখ্যাত হয়েছিলেন এক বাঙালি। নামটাই কাফি। স্বামী অভেদানন্দ কে? মিশনে দীক্ষিত কিছু শিষ্য হয়ত বলতে পারবেন।

বেঁচে থাকলে বিবেকানন্দকে কীসের মুকুট পরাতেন? কোহিনুর তো এখন স্পন্সরশিপ আর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের রানিসাহেবার তহবিলে গচ্ছিত। ওনাকে কী ভূষণ দিতেন, কে জানে? অন্তরের জহরতের কী কোনও মূল্য নির্ধারণ করা যায়? তবুও ডলারের থলি নিয়ে তাকে সাজাতে হয়। সংস্কৃতি তাই নিলামের পণ্য। মাল ছাড়, সাংস্কৃতিক উত্তরণ অনিবার্য। আজকের যুগে থাকলে বিভূতিভূষণ বোধহয় সাহিত্যিক তকমা পেতেন না। ভাগ্যিস উনবিংস শতাব্দীতে এসেছিলেন, তাই একশো বছর পরেও তাঁকে ভাঙিয়ে টু-পাইস কামানো যায়। আজ ভাঙাবার লোকও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

শোভন হারিয়ে গেল স্পন্সরদের ডিনারে। অঞ্জন মিশে গেল রাজীবের সঙ্গে, লাইন ফিট করতে। শ্রেয়া ঘোষাল আর আমজাদ আলি খান ছাড়া, অন্যেরা গুণের চেয়েও যোগাযোগে অলংকৃত।

ব্রাউন কনভেনশন সেন্টারের থার্ড ফ্লোরে কানাঘুষো চলছিল। কিছুক্ষণ পরেই ওপেন অ্যানাউন্সমেন্ট "আমাদের এই সম্মেলনের বিশিষ্ট শিল্পী ইমার খয়রি রঙের লেদার হ্যান্ডব্যাগটা পাওয়া যাচ্ছে না। কেউ যদি কোথাও কোনও হ্যান্ডব্যাগ খুঁজে পান, দয়া করে ফ্রন্ট অফিসে যোগাযোগ করুন"

উদ্যোক্তাদের একজন, বিদিতা বসু ইমাকে জিজ্ঞেস করছে "কোথায় রেখেছিলে? মনে পড়ছে?"

"হাতেই তো সবসময় থাকে। আজও ছিল। অনেকের সঙ্গেই কথা বলছিলাম। কোথায় যে রাখলাম, খেয়াল করতে পারছি না" ইমার কাঁদো কাঁদো মুখ।

"কী ছিল ব্যাগে?"

"ইউসুয়ালি যা থাকে। কার্ডস, চিরুনি, মেকআপ কিট আর কিছু ডলার"

"পাসপোর্ট?"

"না, সব জায়গায় নিয়ে ঘুরব না বলেই ওটা হোটেল রুমে রেখে এসেছি। কী যে হবে, ওটা না পেলে। আমার হাতে কোনও ডলার নেই। শপিং-এর কথা তো ছেড়েই দিলাম"

"কোথায় আর যাবে? চিন্তা করো না। ঠিক খুঁজে পাওয়া যাবে। তুমি রিল্যাক্স কর, আমি দেখছি"

"কী করে করব? এই বিদেশ বিভুইয়ে হাতে তো কিছুই নেই"

"অত ভাবছ কেন? উই আর দেয়ার টু হেল্প ইউ"

বিদিতার ভয়, টেনশনে ইমা প্রোগ্রাম না নষ্ট করে ফেলে। ইন্ডিয়া থেকে খরচ করে এত আর্টিস্ট এনেছে একটা উইক এন্ডের জন্য। সব কিছু পারফেক্ট না হলে হাজার বদনাম। বিদিতা ব্যাগের সন্ধানে লেগে পড়ল।

ইমার আনন্দটাই মাটি। কারো সঙ্গে ঠিকমত কথা বলতে পারছে না। কেউ আবার সহানুভুতি জানিয়ে যাচ্ছে, অনেকেই সান্ত্বনা দিচ্ছে। কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। এক ফাঁকে সাবেকি টাঙাইল জড়ানো ঋষিকা ইমার কাছে এসে বলল "কোথায় ফেলেছ? পেলে?"

মুখটা করুণ "না দিদি। ওরা তো খুঁজছে। কোথায় রেখেছি, খেয়াল করতে পারছি না"

"কোথায় আর যাবে? এই সেন্টারেই কোথাও আছে। চিন্তা করো না, পেয়ে যাবে"

মুখে সান্ত্বনা দিলেও, মনে মনে খুশিই হল। টেনশনে ইমা তেমন পারফর্ম করতে পারবে না। সে অনুষ্ঠান মাতিয়ে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হবে। এই কম্পিটিশনের বাজারে টিকে থাকতে গেলে যতটা আপার হ্যান্ড পাওয়া যায়। পরের বারে এখানে আসার সম্ভাবনা বাড়বে। সবাই তো সেই এক গান নিয়েই বাজার জমানোর চেষ্টা করছে। এই ট্র্যাকেই তো আসল খেলা। দেশে আর কটা ফাংশন, ক'টাকাই বা পায়? বাজারে দেনা। এক বাংলাদেশি শাড়িওয়ালার কাছে লাখ টাকার ওপরে। সেলিব্রিটি বলেই ধারে দিয়েছে। ইদানীং নানান অজুহাতে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। শেষমেশ কিছু তো ছাড়তেই হবে।

অনেক খুঁজেও ব্যাগটা পাওয়া গেল না। শেষে হয়রান হয়ে বিদিতা বসু বলল "তন্ন তন্ন করে তো খোঁজা হল। পাওয়া যাচ্ছে না" ভরসা দিয়ে বলল "এখানে তো কেউ নেবে না। কিন্তু গেলটা কোথায়?"

"এখন কী করি?" মুখ চুন ইমার।

"কী আর করবে? আমরা কিছু টাকা ডলার দিয়ে দেব"

"আপনারা আর কত দেবেন? হাত খরচ। ব্যাস। এখানে তো আসা হয় না। ভেবেছিলাম বাবা-মা-ভাই-বোনেদের জন্য কিছু কিনে নিয়ে যাব"

“এক্কেবারে চিন্তা কর না। তোমার যা ইচ্ছে কেন। উই উইল বেয়ার অল ইওর এক্সপেন্সেস। খালি ভাল করে গানটা করো”

পুরনো জুটি। বিদেশের মাটিতে দুজনেই ধান্দায় ব্যস্ত। রাবিন্দ্রিক মহিলা সংসর্গ নিয়ে কিছু বলতে গেলে হিতে বিপরীত হতে পারে। পরের বার বং সং থেকে ছাঁটাই হওয়ার সম্ভাবনা। রবীন্দ্রনাথকে ভুলভাল বিক্রি করে ইয়ারলি হলিডে খোয়াতে চায় না অঞ্জন। ভালই জানে কোথায় কতটুকু পাড়তে হবে। তার থেকে রাজীবকে তার বই বিক্রির কাজে সহায়তা করাই ভাল। শুধু সময়মতো রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ‘লিটারারি মিট’-এ নিজের বক্তব্যটুকু রাখা।

বিদিতা বসু রাজীবের দিকে এগিয়ে বলল “লিটারারি মিটের পর, সব বরেণ্য সাহিত্যিকদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন?”

“নিশ্চয়ই”

রাজীব জানে, বিদিতা নতুন পাবলিশিং হাউস খুলেছে। ওর বিজনেস দরকার। ওদের দিয়ে পাবলিসিটি করিয়ে যদি কিছু লেখা বাগাতে পারে, তা হলে হাউজের একটা সম্ভাবনা আছে। পাবলিসিটিতেও কাজে লাগবে। সৃষ্টির উৎকর্ষ বুঝতে অক্ষম কর্পোরেটকে নামী সাহিত্যিকদের পাশে দাঁড় করাতে পারলেই লাভের সম্ভাবনা। প্রতিষ্ঠান-পুষ্ট ছাঁচে গড়া সাহিত্যিকরাই তো আজকের নক্ষত্র। লেখার মান নিয়ে কিছু বলতে যাওয়া মানেই একঘরে হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

প্রবাসী বিদিতার অবশ্য সাহিত্যের মান ঠাহর করা সম্ভব নয়। যারা এই আপাত চাকচিক্যে গৌরবান্বিত, তারা কী করে জানবে ভেতরের রহস্য? প্রতিষ্ঠানের হয়ে লিখতে গেলে অনেক দায়বদ্ধতা। নির্দিষ্ট সময় লেখা শেষ করতে হবে। ওদের ভাষাই বলতে হবে। ওদের ভাবনায় ভাবতে হবে। না হলে, ছাপা হবে না। প্রতি বছর গণ্ডা গণ্ডা লেখা দিতে হলে, তথ্যগত ভুল অনিবার্য। সাহিত্য করতে গেলে তো প্রচুর খাটতে হয়। অন্তত বিদেশের প্রথম সারির সাহিত্যিকরা সেভাবেই চলেন।

বিদিতা আর পাঁচটা এনআরআইয়ের মতো এদের পাশে দাঁড়িয়েই ধন্য। পরিচয় করিয়ে দিয়ে রাজীবও, বাৎসরিক বিদেশ ভ্রমণের নিশ্চিত আশ্বাস পেয়ে। স্তাবক হিসেবে নিজেকে শিল্পিত করে ধ্রুপদী মাত্রায় পৌঁছনই তার লক্ষ্য।

“আর যদি কিছু প্রয়োজন হয়, বলবেন। আমি আপনার পাশে সব সময়ই আছি” রাজীব প্রত্যেকের সঙ্গেই ভদ্র।

“আপনি পাশে থাকলে আমার কোনও চিন্তা নেই”

ঋষিকার আশা অপূর্ণ থেকে গেল। ব্যাগ হারানোর পরেও ইমার রেওয়াজি গলার পারফরম্যান্সে কোনও খামতি নেই। অন্যান্য বারের থেকে ভাল। ঋষিকাকে ছাপিয়ে গেল ওর তরুণ সুরেলা আওয়াজ। জেতার আশা নিয়েও, থামতে হল।

বিদিতা কথা রেখেছিল। ইমার হাতে বেশ কিছু ডলার গুঁজে বলল “মনের আনন্দে শপিং কর, ডলারের চিন্তা করতে হবে না। এই উৎসবে আনন্দ করতে এসেছ, প্রাণ ভরে আনন্দ কর। উই আর হিয়ার টু মেক

এভ্রিওয়ান হ্যাপি”

“ভীষণ গিল্টি লাগছে। হঠাৎ এই ব্যাগটা হারিয়ে”

“ডোন্ট ওয়ারি। ইওর পারফরম্যান্স ওয়াজ এক্সিলেন্ট। এনজয় ইওর স্টে ইন হিউস্টন”

ইমা দেবাশিসকে বলল “আমি তো হিউস্টনের কিছুই চিনি না। তুমি তো কিছুদিন আগেই ঘুরে গেছ। শপিং করব, সঙ্গে যাবে?”

যদিও তার ট্রুপের সঙ্গে নাটকের আগে ফাইন্যাল টাচ-আপ বাকি, তবু ইমার আবদার ফেলতে পারল না। গেসনার রোড থেকে মেমরিয়াল সিটি মলে পৌঁছতে বেশি সময় লাগে না। দেবাশিস আগের বারও ঘুরে গেছে। পকেটে রেস্ত কম থাকায় তেমন কিছুই কেনা হয়নি। তবুও... এত বড় মল। ঘুরে ঘুরে দেখার চার্ম-ই আলাদা।

লক্ষ করছে ইমা দুহাতে শপিং করে যাচ্ছে। ডিসাইনার ড্রেস থেকে বাচ্চাদের খেলনা, বয়স্কদের জন্য জামাকাপড়। অভাবের সংসারে আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব অনেক আশা নিয়ে থাকে। ওদের আনন্দ দেখলে মনটা ভরে যায়, কদরও বাড়ে। একমাত্র ইমা ছাড়া, আর কেউ তো ফ্যামিলিতে তারকা হতে পারেনি। দেবাশিসও ওদের সঙ্গেই এসেছে, পকেটে অত ডলার নেই। ইমা পেল কোত্থেকে! বিশেষ করে ব্যাগ হারনোর খবরটা শোনার পর, হিসেব মিলছে না।

কিছুটা ঘুরে বলল “টায়ার্ড লাগছে। তুমি ঘোর, আমি একটু জিরিয়ে নিই” অসংখ্য লোকের আনাগোনা। কতক্ষণ পার হয়ে গেছে, খেয়াল করেনি। সম্বিত ফিরল এক কোনায় লোকের ভিড় আর সোরগোল শুনে।

“সি ইজ ওয়ান ইন্ডিয়ান লেডি। ওহ মাই গস, সি ইজ ব্লিডিং। উই হ্যাভ টু টেক হার টু হস্পিট্যাল”

‘ইন্ডিয়ান লেডি’ শুনেই ওই ভিড়ের মধ্যে এগিয়ে গেল। ভিড় ঠেলে কাছে যেতেই দেখল, ইমা একরাশ রক্তের মধ্যে পড়ে আছে। কী হয়েছে? এত রক্ত কেন? বেঁচে আছে তো? অ্যামেরিকায় যত্রতত্র গুলিগোলার কাহিনি অজানা নয়। তবে কি কেউ স্যুট করেছে? ব্যথায় কাতরাচ্ছে ইমা। জিনস-টপস রক্তে ভেসে গেছে। হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। সে তো ছাই এ জায়গার হালচালও জানে না।

বিদিতাকে মোবাইলে ধরল “মেমরিয়াল সিটি মলে ইমার সঙ্গে শপিং-এ এসেছিলাম। কী হয়েছে ঠিক জানি না। পড়ে গেছে, ব্যথায় কাতরাচ্ছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে”

“আমি এক্ষুনি আসছি”

বিদিতা পৌঁছনোর আগেই হারমান্যান মেডিক্যাল সেন্টারের ট্রমা টিম পৌঁছে গেছে। স্ট্রেচারে ইমাকে তুলছে। সঙ্গে দেবাশিস। বিদিতা অ্যাম্বুলেন্সকে ফলো করে লেভেল ওয়ানে পৌঁছে গেল। ওরা ইমাকে রিসাসিটেশন রুমে নিয়ে গেছে। বিদিতা রিসেপশনে রেজিস্টার করাচ্ছে।

ওদের জিজ্ঞেস করল “ইজ সি ইন্সিওরড?”

“সি ইজ ফ্রম ইন্ডিয়া। সি হ্যাস কাম টু অ্যাটেন্ড এ কনফারেন্স অ্যাট দ্য জর্জ আর ব্রাউন কনভেনশন সেন্টার। উই অরগ্যানাইজারস হ্যাভ কভারড অল দ্য গেস্টস অ্যাটেন্ডিং দ্য কনফারেন্স। হোয়াট হ্যাপেন্ড?”

“আই ডোন্ট নো। দ্য ডক উইল বি উইথ ইউ ইন এ মোমেন্ট অ্যান্ড এক্সপ্লেন এভ্রিথিং”

“কী হয়েছিল?” বিদিতার প্রশ্ন।

“ঠিক জানি না। ও ঘুরে ঘুরে শপিং করছিল। আমি টায়ার্ড হয়ে রেস্ট নিচ্ছিলাম। সন্ধেতে প্রোগ্রাম আছে বলে বেশি স্ট্রেন নিতে চাইনি” দেবাশিস ভ্যাবাচ্যাকা...

আধ ঘণ্টা পর ডাক্তার এসে বলল “ডোন্ট ওয়ারি। এভ্রিথিং ইজ ফাইন অ্যান্ড আন্ডার কন্ট্রোল। সি জাস্ট হ্যাড অ্যান অ্যাবরশান। সি উড বি ফাইন”

অ্যাবরশান! অবিবাহিত মেয়ের অ্যাবরশান!! আকাশ থেকে পড়ল দুজনেই। একে অপরের দিকে তাকাচ্ছে। আজকের মেয়েদের কাছে ইন্টারকোর্সটা কোনও ব্যাপারই নয়। আগের থেকে অনেক বেশি ফ্রি, আনহিবিটেড। কিন্তু প্রিকশন না নিয়ে! আর প্রেগেনেন্সি হলেই বা? অ্যাবরশন না করিয়ে এতদূর অ্যাটেন্ড করতে আসা।

ডক্টর অবশ্য রিঅ্যাসিওর করেছে “আর্লি স্টেজেস। সো দ্য অ্যাবরশন উইল হ্যাভ নো আফটার এফেক্টস”

বিদিতা মেডিক্যাল আফটার এফেক্টস-এর কথা ভাবছে না, ভাবছে সামাজিক রিঅ্যাকশনের কথা। কলকাতায় হলে, ইমা কী ভাবে হ্যান্ডেল করত জানে না। কিন্তু হিউস্টনে সম্মেলন চলাকালীন - ভাবতেই পারেছে না।

দেবাশিস বলল “যেটুকু জানলাম, শপিং করে লাগেজ নিয়ে আসার সময়, ক্যারিকেসে ধাক্কা লেগে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়”

বিদিতা ভাবছে, ভাগ্যিস কনভেনশন সেন্টারে হয়নি। হলে কী যে কেলেঙ্কারি হত, চাপা দেওয়াও যত না। লোকে ঠিক বুঝে যেত। শপিং মলে যখন হয়েছে, যা হোক একটা গল্প বলে দেওয়া যাবে। ওরা ডে কেস অবসারভেশনে রেখে ছেড়ে দিল। ইভিনিং-এ প্রোগ্রাম আছে বলে দেবাশিস আগেই কেটে পড়েছিল। বিদিতা ইমাকে হোটেলের রুমে দিয়ে কনভেনশন সেন্টারে ফেরত এল।

ঋষিকা এক ফাঁকে জিজ্ঞেস করল “ইমাকে দেখছি না। ওর হ্যান্ডব্যাগ পেয়েছে?”

“ও শপিং করতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গেছিল। হসপিটালে নিয়ে যেতে হয়েছিল। এখন ভাল আছে। হোটেলের ঘরে রেস্ট নিচ্ছে। ডক্টর বলেছে, সি সুড হ্যাভ রেস্ট নাউ। নট টু বি ডিস্টার্বড” একটু থেমে বলল “ব্যাগটা পাওয়া যায়নি”

কনফারেন্স শেষে বিদিতাই ইমার ব্যাগ গুছবার ভলান্টিয়ার করতে, ইমা বাধা দিল “না... না... আমিই গুছিয়ে নিতে পারব”

“তোমায় একটু হেল্প করি...”

“আমি নিজেই পারব। এখন অনেক বেটার ফিল করছি”

সাহস হল না জিজ্ঞেস করতে, ডাক্তার কী বলেছে? বুঝতেই পারছে, অঞ্জনদার রাতের অপকীর্তি খালাস হয়ে গেছে।

মাতৃত্ব এসেও ধরা দিল না। অজন্মা শিশুটিও জানে কখন কোথায়, কার উত্তরসূরি হয়ে, পৃথিবীতে আসতে হবে। নিজের ঝোঁকে ইমা ভুলে গেলেও, সে জানে, কোথায় তার শান্তি। কোন পরিচয়ে সে বড় হয়ে উঠবে। ভূমিষ্ঠ না হওয়া শিশুও অলিখিত বিধানে জন্মের পটভূমি ঠিক করে নেয়।

তাড়াহুড়োয়ে একগাদা জিনিস সুটকেসে ঠাসার সময় বোধহয় ভালভাবে লক করেনি। হোটেলের পোর্টার, লাগেজ টানতে গিয়ে, লকটা খুলে, কিছু সরঞ্জাম, উপচে পড়ল। সেগুলো যথাস্থানে তাড়তাড়ি গোছাতে গিয়ে

ইমা এতই ব্যস্ত, লক্ষ করেনি, বিদিতা করিডরে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে আছে।

ইমা না দেখলেও বিদিতা খেয়াল করল, ইমা সন্তর্পণে হারানো হ্যান্ডব্যাগটা ঢুকিয়ে ঠিকঠাক বন্ধ করছে। আর যাতে না খোলে।

ব্যাগটা তাহলে হারায়নি!

ছাব্বিশ

প্রকাশ ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না, কী করবে? শুধু সে নয়, তার সঙ্গে আরও পঞ্চাশ জনের ভবিষ্যৎ জড়িয়ে। কোথায় যাবে? প্রত্যেকের সংসারই তো তার মুখ চেয়ে বসে। সোজা কুট্টিকে ফোন "সৌগত ইজ অ্যাবস্কন্ডিং। মনু ঘোষ অ্যান্ড বিমান হ্যাভ লেফট। দ্য চ্যানেল ইজ অ্যাবাউট টু ক্লোজ। উই আর আউট ইন দ্য স্ট্রিটস। ইফ ইউ গিভ আস দ্য সাপোর্ট, উই আর স্টিল কেপেবল অফ রানিং দ্য চ্যানেল"

"লেট মি চেক উইথ মাই বস। উইল কল ইউ ব্যাক" চ্যানেল এক্স-এর সিএফও কুট্টি সময় চাইল।

শেষমেশ চেন্নাই থেকে কুট্টির ফোন "উই আর কামিং। লেটস ডিসকাস হাউ উই ক্যান স্যালভেজ দ্য চ্যানেল"

এই ডামাডোলের মধ্যে কিছু প্রভাবশালী লোকের সাহায্যে ধূর্জটি রায়ের সিনে আগমন। সৌগত দত্তকে ফিরিয়ে এনে, দেনায় ডোবা চ্যানেলের ২০% নামমাত্র দামে কিনে নিল ধূর্জটি। কিন্তু ৮০% শেয়ার তো চ্যানেল এক্স-এর। অত টাকা তো ওর নেই। তাতে কী? কব্জির জোর তো আছে। নিজস্ব বাহিনী দিয়ে চ্যানেল এক্স-এর লোকদের ঠেকিয়ে দিল। স্ট্রেট হাইজ্যাক। সৈকতকে সিইও করে বাংলা টিভির কতৃত্ব হাতে নিল। নতুন অধ্যায়।

লস এঞ্জেলসে যাবে। কলকাতায় এলেও কাউকে জানায়নি দেওয়ালি। লাস্ট মিনিট শপিং। প্যান্টালুন্স থেকে ডিসাইনার বুটিক। হলিউডে যখন চান্স পেয়েছে, নিশ্চয়ই ইন্ডিয়ান ক্যারেক্টার। ওখানে মনের মতো ড্রেস পাবে কি না কে জানে। ইন্টারন্যাশনাল এরিনাতে হয়ত ভারতীয় মাধুর্য ফুটিয়ে তুলতে হবে। শুধু চেহারায় নয়, পোশাকেও। খবরটা চেপে গেছে। গিয়ে দেখা যাক, ব্যাপারটা কী। সময় মতো লোকে ঠিকই জানতে পারবে। সব কিছু ভুলে মন প্রাণ জুড়ে স্বপ্ননগরী হলিউড। অনেক পরিশ্রম করতে হবে, খুব ভালভাবেই জানে। এই সিন্সিয়ারিটিই তার পাথেয়।

এক ফাঁকে দেবাশিসদাকে ফোন "কলকাতায় এসেছি। তুমি বলেছিলে না বিশেষ কথা আছে। যখন বলবে দেখা করতে পারি। প্লিজ কাউকে জানিও না, আমি কলকাতায়"

"সে নয় জানাব না। আজ হবে না, অ্যাকাডেমিতে আমাদের শো আছে। কাল সকালে ফ্রি আছ?"

"চলে এস না আমার ফ্ল্যাটে। দশটার পর প্লিজ... একটু হেলতে দুলতে উঠব"

"ঠিক আছে। এগারোটা নাগাদ পৌঁছচ্ছি"

বিকেলে কিছু কাজ আছে। একবার পালিত স্ট্রিটে যেতে হবে, অনামিত্রার বুটিকে। গত উইকে যে নতুন দুটো ড্রেস করতে দিয়েছিল, পরশু নিয়ে এসেছে। অন্য কাজের ভিড়ে ট্রাই করে দেখার সময় পায়নি। আজ সকালে ট্রাই করতে গিয়ে দেখল, ফিটিংটা ঠিক হয়নি। কোমরটা একটু টাইট। ব্রেস্টের কাছে ঢলঢলে। ঝুঁকলেই প্রায় সবটা দেখা যাচ্ছে। চার্ম থাকবে না। দুটো ড্রেসেরই এক অবস্থা। রিঅ্যাডজাস্ট করতে হবে।

"হ্যালো অনামিত্রাদি। পরশু তোমার কাছ থেকে যে ড্রেসগুলো এনেছি সেগুলো ফিটিং হয়নি"

"কী হয়েছে?"

“কোমরটা বড্ড বেশি চাপা, বুকটা ঢলঢলে। আজকে বিকেলে ফ্রি আছ?”

“ক’টায় আসতে চাও? আমার একটা বুক লঞ্চ আছে, সাউথ সিটির স্টারমার্কে। সাড়ে সাতটার মধ্যে আশা করি শেষ হয়ে যাবে। আটটা নাগাদ চলে এস। অসুবিধা আছে?”

“নাঃ। পাক্কা আটটায় পোঁছব”

অনামিত্রাদিও সেলিব্রিটি। এমন কিছু পেটোয়া লোককে মিডিয়া করেই থাকে। হলুদের গুঁড়োর মতো বুক লঞ্চ, ডিবেট থেকে যে কোনও পেজ থ্রি প্রোগ্রামে অনামিত্রাদি প্রায় এভ্রি ইভিনিং কোথাও না কোথাও আছেই। ভাগ্যিস আজকে বুক লঞ্চ। তাড়াতাড়ি ফিরবে। নইলে হায়াত বা তাজে কোনও পার্টি সেরে ফিরতে অনেক রাত। ওর বুটিকের অন্যদের দিয়ে হবে না।

ঠিক আটটায় যখন গুরুসদয় রোডে পৌঁছল, অনামিত্রাদি গাড়ি থেকে নামছে। দেওয়ালিকে বলল “জাস্ট ইন টাইম, কাম ইন। আই হোপ দ্য আদার গার্লস হ্যাভেন্ট লেফট। আই হ্যাভ টু এক্সপ্লেন টু দেম, টু মেক নেসেসারি করেকশন ইন ইওর প্রেসেন্স। আই অ্যাম সো সরি”

মেয়েগুলো যাব যাব করে পাততাড়ি গোটাচ্ছিল। অনামিত্রাদি হ্যান্ডব্যাগটা এক কোণায় নামিয়ে বলল “উড ইউ মাইন্ড পুটিং ইট অন সো দ্যাট আই ক্যান সি দ্য প্রবলেম”

“নট অ্যাট অল” দেওয়ালি ড্রেসগুলো নিয়ে চেঞ্জিং রুমে ঢুকল।

সত্যি, লো কাট ড্রেসটার ওপরটা একটু বেশি লুজ। একটু ঝুঁকলেই বুকের অনেকটাই দেখা যাচ্ছে। অবশ্যই টাইট করে দিতে হবে। কোমরের অংশটা খুব চাপা লাগছে না। তবুও দেওয়ালি যখন আনকমফরটেবল ফিল করছে, একটু লুস করে দিলেই হবে। টেপ দিয়ে পাছার মাপটা নিয়ে বলল “এটা ঠিক আছে তো?”

“হ্যাঁ। একটু লুস রেখো। পাছাটা প্রমিনেন্ট হলে মুখের দিকে কেউ তাকাবে না”

মেয়েদের কাজ বুঝিয়ে দিয়ে, অফিসের অ্যানেক্সে গিয়ে বলল “একটু ওয়াইন চলবে। আই অ্যাম ডাইং ফর এ ড্রিঙ্ক”

“অল্প, অনেক কাজ পড়ে আছে...”

“এটা টেইস্ট করে দেখ” অ্যানেক্সের বার ক্যাবিনেট থেকে বোতলটা বার করল “ঝাম্পা লে অ্যামর ব্রুট রোস। আগে কখনো খেয়েছ?”

“নাঃ... নামও শুনিনি”

“এটাই সব থেকে দামি ইন্ডিয়ান ওয়াইন”

চুমুক দিয়ে দেওয়ালি বলল “অনেকটা স্যাম্পেনের মতোই”

“এক বন্ধু নাসিক থেকে এনে দিয়েছে। নাসিকের কাছেই ডিস্টিলারি। কী যেন নাম? হ্যাঁ... হ্যাঁ... মনে পড়েছে... মুকনে ড্যাম” ওয়াইনে চুমুক দিয়ে বলল “এখন কী এখানেই?”

সেলিব্রিটিদের ওরকম দু-একটা ফ্রেন্ড থাকে। সবাই সে কথা জানে। বয়ফ্রেন্ড আছে কি না, সেটা বড় কথা নয়, বয়ফ্রেন্ড চেঞ্জ হয়ে নতুন কেউ এসছে কি না, সেটাই পেজ থ্রি পার্টির গসিপ। এক সময় ইন্টারেস্টেড থাকলেও, এখন অবকাশ নেই। কিছু করার না থাকলে ঘরে শুয়ে বই পড়তে ভালই লাগে। না

হলে সেই এক মুখ, এক কথা, সাজগোজ, একই দেঁতো হাসি হাসতে আর ভাল লাগে না। যাদের ট্যাবলয়েডের পেজ থ্রি-তে ছবি বার করার শখ আছে, তারাই এসব পার্টির রেগুলার কাস্টমার।

"না... না... তোমায় তো বললাম। কিছুদিনের মধ্যেই মুম্বাই ফেরত যাচ্ছি। এবার যে এসেছি কাউকে জানাইনি। তোমার ড্রেসগুলো পছন্দ বলেই যখনই আসি, কিছু করিয়ে নিয়ে যাই। তাছাড়া মুম্বাই-এর ডিসাইনার ড্রেসগুলো অ্যাফরড করতে পারি না। টু এক্সপেন্সিভ, কোটিপতিদের জন্য"

"এখন তো মুম্বাইতে ঢুকে পড়েছ। কিছুদিনের মধ্যেই তুমিও কোটিপতি হয়ে যাবে"

"কোটিপতি তো তুমি আমি আমি দুজনেই। বলা উচিত ছিল, কোটি কোটি পতি। অত টাকা আমার কোথায়?"

"হবে হবে, সব হবে। জাস্ট ওয়েট অ্যান্ড সি"

ন'টা নাগাদ বেরিয়ে এল। অনামিত্রাদিরও রেস্ট দরকার, ড্রাইভারকেও ছাড়তে হবে। মেনল্যান্ড চায়না থেকে ডিনার কিনে ফিরল। জামাগুলো দলা করে ওয়ার্ডরোবে ফেলেই বাথরুমে ঢুকে গেল। আগে স্নান করে ফ্রেস হয়ে নেওয়া যাক।

বিবস্ত্র দেওয়ালি জানলার কাছে দাঁড়িয়ে। অন্ধকারে বাইরে তাকিয়ে আছে। আলো-আঁধারির খেলা দেখতে বেশ লাগে। ছটফট করছে মনটা। এখন আর অনামিত্রাদির মতো আলো ঝলমলে রঙিন মেকি সাজানো নাইট লাইফ ভাল লাগে না।

দেবাশিস এল সাড়ে এগারটায়। সোফায় গা এলিয়ে বলল "কাল নতুন নাটকটায় হিউজ অ্যাপ্লজ পেয়েছি। তুমি কদ্দিন?"

"কয়েকদিন পরেই মুম্বাই ফেরত যাব" হলিউডের খবরটা ইচ্ছে করেই চেপে গেল "তুমি কী বলবে বলেছিলে দেখা হলে..."

"ছবিটা তো রেডি। আগস্টে রিলিজ করবে। আশা করি সে সময় থাকবে। ব্যাপারটা অন্য। তুমি তো জান, ছবি করা আমার প্রধান কাজ নয়। ওটা ওয়ান অফ। আমি নাটকের মানুষ, ওটাই আমার দুনিয়া, ওটা নিয়েই বড় হয়েছি। বেশ কিছুদিন ধরেই অমর্ত্যর সঙ্গে আমার এই নাটকে নিয়ে মনোমালিন্য চলছে"

"ঠিক জানি না"

দেবাশিস সব ঘটনাগুলো আবার রিপিট করল। দেওয়ালি মন দিয়ে শুনছে "যেহেতু অমর্ত্য এখন মন্ত্রী, তাই অবভিয়াসলি ওর ক্ষমতা অনেক বেশি। ওর কথাই চলবে। মানে প্রত্যেকটা শোর আগে ওর পারমিশনের আশায় বসে থাকতে হয়। দুজনে একসঙ্গে বড় হয়েছি, একই সঙ্গে দল গড়েছিলাম। সেখানেই বিবেকে লাগছে। বুঝতে পারছি না কী করে সুরাহা হবে"

"দেবাশিসদা, হাউ ডু আই কাম ইন দ্য পিকচার?"

"আমাদের ওয়ার্ল্ডে, কেউ পক্ষে, কেউ বিপক্ষে থাকবে। সেটাই স্বাভাবিক। তুমি তো আমাদের দুনিয়ার লোক নও। তোমারও তো অমর্ত্যর সঙ্গে ভালই চেনা। যদি কোনওরকমভাবে মিটমাট করে হেল্প করতে পারতে..."

“আমি তো তোমাদের নাটকের দুনিয়ার লোক নই, ভেতরের কাহিনিও জানি না। অমর্ত্যদা কেন-ই বা আমার কথা শুনবে? যদিও তোমার থেকে ছোট, একটা সাজেশন দেব? এই পাওয়ার স্ট্রাগেলের চক্কর থেকে বেরিয়ে এস”

“যাব কোথায়? তোমার নয় মুম্বাইতে একটা আস্তানা হয়েছে। আমার তো এর বাইরে যাওয়ার পথ নেই”

“আছে। ছাড়তে পারলে দেখবে সব ফিরে আসবে। ছেড়ে দাও না। টেম্পোরারি হার স্বীকার করলে কোনও লস নেই। আমি সাদামাটা একটা কথাই বুঝি, ভাগ্যে যা আছে, তাই হবে। অত ধরেবেঁধে কিছু হয় না”

“তোমার ভাগ্য খুলছে বলেই এ কথা বলতে পারলে”

“ভাগ্য খুলছে না বন্ধ হচ্ছে, কে জানে? এই দেখ না। হতে চেয়েছিলাম কেমিস্ট্রিতে ডক্টরেট, হয়ে গেলাম অ্যাক্ট্রেস। কার কপালে কী আছে, কেউ বলতে পারে?”

দেওয়ালির কথাটা আজ নয়, ছোটবেলা থেকেই শুনেছে। মেনে নেওয়াটাই কষ্টকর। এখনও সেই স্তরে পৌঁছয়নি যে, জগৎ ভুলে ভাগ্যের হাতে সব কিছু সঁপে দিয়ে বসে থাকবে। বসে থাকলে কি এখানে আসতে পারত? দুনিয়াদারির টানাপোড়েনে ডারউইনের থিওরি অফ ইভলিউশন-ই প্রযোজ্য - সারভাইভ্যাল অফ দ্য ফিটেস্ট। দেওয়ালি কোনও আধ্যাত্মিক অ্যাঙ্গেল থেকে বলছে না। ডিফিটকে অনেকেই ভবিতব্য আখ্যা দিয়ে শান্তি খোঁজে। সে ওদের দলে নয়।

“কী জানি... মনে হয়েছিল, তুমি সাহায্য করতে পারবে...”

“তাই তো হল”

ফোনটা হঠাৎ বেজে উঠল। দেওয়ালি আশা করেনি, ঠিক এই মুহূর্তে অমর্ত্যর ফোন আসবে। মাঝে মাঝে এমন কিছু হয়... “তুমি কী এখন কলকাতায়?” অমর্ত্যর গলা।

“কেন বলত?”

“রাজীব বলছিল, তোমায় ওদের গ্রুপের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার করেছে। আমাদের গভর্নমেন্টের কিছু পাবলিক অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেনের জন্য তোমার কথা ভাবছিলাম”

“যদিও এই মুহূর্তে কলকাতায়, মুম্বাইতে ফেরত যাচ্ছি। ওখানে ডেটস দেওয়া আছে”

“তুমি কী তাহলে পারবে না?”

“কেন পারব না? তোমারা অরগ্যানাইজ করে জানিও। এসে করে দিয়ে যাব” একটু থেমে বলল “তুমি বললে না এসে পারি?”

“বেশ, জানাব”

ফোনটা কেটে বলল “টক অফ দ্য ডিভিল, অ্যান্ড হিয়ার হি ইজ”

“কে? অমর্ত্য?”

মাথা নাড়ল দেওয়ালি “কী জানি আমায় হয়ত ভবিতব্য তোমাদের এই ঝামেলাটা মিটমাট করার জন্যেই টানছে। নইলে ঠিক এই সময় ফোনটা আসে?”

দেবাশিসের মনে হল, দেওয়ালি হয়ত ঠিকই বলছিল, ভবিতব্যই আসল, বাকিটা ফালতু। মেনে নেওয়াটাই শ্রেয়। দেখা যাক না, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

সাতাশ

হলিউড। অ্যামট্র্যাক-বুরব্যাঙ্ক এয়ারপোর্টের ইমিগ্রেশন পেরিয়ে বাইরে এসে প্রাণ ভরে শ্বাস নিল দেওয়ালি। এক নতুন দুনিয়া, নতুন স্বপ্ন। মাটিতে পা রেখে মনে হল, আবার নতুন করে পথ চলা শুরু, নতুন অধ্যবসায়, নতুন প্রয়াস।

রিসিভ করার জন্য এনক্লোজারে অপেক্ষা করছিল মার্ক। না দেখলেও, প্রোফাইল ঘেঁটে চেহারাটা পরিচিত। এজেন্ট যদি ক্লায়েন্টের চেহারার ইম্প্রেসারিও তার সেরিব্র্যাল কম্পিউটারের অ্যামিগডালাতে রাখতে না পারে, তাকে বিক্রি করবে কী করে?

"ডিওয়ালি? অ্যাম আই রাইট?"

"রাইট ইউ আর"

দেওয়ালির ট্রলি ঠেলে বাইরে আসতেই বলল "হ্যাং অন হিয়ার, হোয়াইল আই ফেচ মাই কার"

লাগেজ ডিকিতে ডাম্প করে, সেভরলে ড্রাইভ করতে করতে বলল "দে হ্যাভ ফিক্সড ইওর স্টে নট টু ফার অফ, অ্যাট দ্য এলএ ম্যারিয়ট। হিয়ার উই এন্টার ওয়েস্ট এম্পায়ার অ্যাভিনিউ। টার্ন লেফট টু নর্থ হলিউড বুলেভারড, অ্যান্ড উই আর দেয়ার"

এলএ ম্যারিয়টের এক্সিকিউটিভ সুইটে চেক-ইন করে আনন্দে উদ্বেল দেওয়ালি সিগারেট ধরাতে গেলে, মার্ক বাধা দিয়ে বলল "স্যরি, দিস হোটেল হ্যাস এ নো স্মকিং পলিসি। আই অ্যাম অ্যাফ্রেড, ইউ হ্যাভ টু কুইট ইওর হ্যাবিট, ওর ইওর ফিউচার ইন হলিউড" মহা ফ্যাসাদ। কিছুই করার নেই। সিগারেট ছাড়, নইলে হলিউডের স্বপ্ন ছাড়। দোটানার মধ্যে দেওয়ালি।

জীবনের স্বপ্নকে পেতে গেলে কিছু ত্যাগ করতে হবে। ত্যাগ ছাড়া প্রাপ্তি শূন্য। কোনটা প্রায়রিটি। উত্তর অজানা নয়। দেহ বিক্রি করে স্টার হওয়া, আর সিগারেট বিসর্জন দিয়ে হলিউডে পদার্পণ, ব্যাপারটা একই। নিজেকে নতুন ভাবে আবার নতুন করে তৈরি করা। আজ এসেছে নতুন স্বপ্ন নিয়ে। কী রূপে সাজতে হবে, ভবিতব্যই বলে দেবে, সে কে? "দ্য ফ্যাগ ইজ ডেসার্টেড ফ্রম নাউ। লেটস হিয়ার ইওর স্টোরি অর দ্য এসেন্স অফ মাই ক্যারেক্টার। মোর রেলেভ্যান্ট, ইজন্ট ইট? হাউ আই গট দ্য ব্রেক। অফ কোর্স, আই ও ইট টু ইউ, অ্যাস দ্য মিডিয়েটর"

মার্ক সুইটের সোফায় গা এলিয়ে বলল "ক্যান আই অর্ডার এ ড্রিঙ্ক? হোয়াট উড ইউ প্রেফার?"

"এনিথিং... হোয়াটেভার সুটস ইউ"

"ওয়েল দে ওয়ার প্ল্যানিং এ মুভি অন ইন্ডিয়ান সাব-কন্টিনেনট অ্যাস দে আর রিয়ালাইজিং, দ্যাট মোস্ট অফ দ্য হলিউড ফ্লিক্স হ্যাভ বিকম এ টেকনিক্যাল এক্সারসাইজ, দ্যান দ্য কোয়ালিটি অফ দ্য স্টোরি। অ্যাস দে ওয়ার হুইজিং থ্রু এ সেট অফ বুকস বাই ইন্ডিয়ান অথারস, দে কেম অ্যাক্রস অ্যান ইন্টারন্যাশল থ্রিলার উইথ প্রিডমিনেন্স অফ ইন্ডিয়া, এ বুক নেমড পারসুইট, বাই সাম চ্যাপ অনিরুডা বোস..."

"দ্য নেম সাউন্ডস বেঙ্গলি" দেওয়ালি ব্লু মুনে চুমুক দিল।

"প্রেসসাইসলি। দ্য স্টোরিলাইন ড্রু দেয়ার অ্যাটেনশন। দো দ্য বুক ইজ এ হাই পেসড ইন্টারন্যাশনাল থ্রিলার উইথ মেনি মার্ডারস, দ্য কি থিম ইজ এ স্ট্যাগারিং ইন্টারন্যাশনাল কন্সিপিরেসি অ্যাডমিকসড উইথ হাইলি কমপ্লেক্স ইন্টারন্যাশনাল জিও-ইকনমিক্স অ্যান্ড পলিটিক্স। আই হ্যাভ রেড দ্য বুক অ্যান্ড ব্রট এ কপি ফর ইউ। ইউ সুড রিড দেম বিফর দ্য মিটিং উইথ দেম অন ব্রিফিং"

খুব মোটা নয়, দু-দিনে শেষ করে ফেলতে পারবে। এক সময়, বিশেষ করে স্কুল আর কলেজ জীবনে বইয়ের পোকা ছিল। যেহেতু কলেজ জীবনে কোনও বয়ফ্রেন্ড ছিল না, পড়ার বাইরে যেটুকু সময় পেত, বই পড়ে আর সিনেমা দেখে কাটিয়ে দিত। সিনেমায় ঢোকার পর-ই, বই পড়া বন্ধ হয়ে গেল। স্ক্রিপ্ট পড়া শুরু। আজকাল তো উপন্যাস থেকে বড় একটা সিনেমা হয় না। আজকালকার ডিরেক্টররা নিজেরাই গল্প লেখে, যা আগের দিনে ছিল না। তাই বই পড়ার ইচ্ছে থাকলেও, সময় বা সুযোগ কোথায়? অবশ্য এই বইটা আগে পড়েনি। কিন্তু এটা টলি বা বলিউড নয়, হলিউড। এখানে হোম ওয়ার্ক না করে গেলে ফেইলিওর অবশ্যম্ভাবী।

"ইজ দিস কপি ফর মি?" মার্ককে জিজ্ঞেস করল।

"ফর ইউ। আই বট ইট ফ্রম অ্যামাজন। দিস ইজ ইওর ফার্স্ট ইন্টারন্যাশনাল ব্রেক। আই ওয়ান্ট ইউ টু ডায়জেস্ট দ্য ক্যারেক্টার বিফোর ইউ মিট দেম। আই হ্যাভ বিন ইন দিস বিজনেস ফর কোয়াইট এ হোয়াইল। ব্রেক্স ডোন্ট কাম অফেন। ইফ ইউ হ্যাভ ওয়ান, বি সিন্সিয়ার অ্যান্ড মেক দ্য মোস্ট আউট অফ ইট। ইউ নেভার নো, হোয়াট ইজ ইন স্টোর"

ইউ নেভার নো হোয়াট ইজ ইন স্টোর... কতটুকুই বা আমরা ভবিতব্যকে জানি? যেটুকু তাস আমাদের হাতে, তাই নিয়েই তো খেলতে হবে। দেওয়ালি খুব ভাল করেই বোঝে।

মার্ক উঠে পড়ল "আই হ্যাভ টু ড্যাশ অফ। ফ্রেশেন আপ, টেক রেস্ট অ্যান্ড ক্যারি অন ইওর হোমওয়ার্ক"

মার্ককে দরজায় এগিয়ে জিজ্ঞেস করল "হোয়াই মি?"

"রিড দ্য নভেল। ইউল আন্ডারস্ট্যান্ড এভ্রিথিং। দ্য প্রোটাগনিস্ট অফ দ্য নভেল ইজ ফ্রম ইওর পার্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। আই থট ইউ ফিটেড ইন পারফেক্টলি। সো ডিড দ্য প্রোডাকশন হাউস" দুষ্টু হাসি ছুড়ে বেরিয়ে গেল।

এত ঘণ্টার জার্নি, সঙ্গে জেট ল্যাগ। স্নান সেরে শর্টস আর স্লিভলেস গেঞ্জি পরে শুয়ে পড়ল। এখানে মধ্যদিন হলেও, ইন্ডিয়ার হিসেবে এখন মধ্যরাত্রি। ঘুমে চোখ ঢুলু ঢুলু। নরম বিছানায় পড়তে না পড়তেই ঘুম। যখন ভাঙল, জানলার পর্দা ফাঁক করে দেখল, সন্ধে হয়ে গেছে। সুইমিং পুল ছাড়িয়ে সান্ধ্য বেশে সেজে উঠেছে লস এঞ্জেলস। নিমেষে দিনের আলোকে দূরে ঠেলে অন্ধকার নেমেছে। গাড়িগুলো হুস হুস করে ছুটছে ম্যানহ্যাটন বিচের স্বল্পালোকিত রেস্তরায়। অ্যামেরিকান সভ্যতা অযথা ফিরে তাকাতে জানে না। অত ভাবার সময় নেই। এটাই জীবনের প্রবাহ। স্রোতের মাদকতায় ভেসে ছুটে এসেছে...

আসার আগে অনিন্দ্য দেওরার স্ত্রী লিজার সঙ্গে দেখা করে অনুরোধ করেছিল, দিগ্বিজয় ভট্টাচার্যকে ক্ষমা করে দিতে...

"ওনলি অন ওয়ান কন্ডিশন, হি মাস্ট রিটার্ন দ্য মানি। দ্য মানি ইজ নট দ্যাট ইম্পরট্যান্ট। হি মাস্ট প্রমিস নট টু লিক ফলস স্কুপস, উইদাউট ডবলি অ্যাসারটেনিং ইটস অথেন্টিসিটি। দোজ রিপোর্টারস ডাই ইন গ্রিড" অনিন্দ্য ভদ্রভাবে বলেছিল।

"আই উইল ইনফর্ম হিম অ্যাস ইউ সে"

"আই অ্যাম স্পেয়ারিং হিম অ্যাট লিজাস রিকোয়েস্ট, জাস্ট বিকস সি ইজ এ ফ্রেন্ড অফ ইওরস। অ্যান্ড হি মাস্ট পাবলিকলি অ্যাপলোজাইজ কনফারমিং হিস মিস্টেক। মাই ক্রেডিবিলিটি অ্যাস অ্যান এমপি ইজ অ্যাট স্টেক। উই ডোন্ট ফাক অ্যারাউন্ড লেডিস, উই হ্যাভ মোর ইমপরট্যান্ট থিংস টু ডু দ্যান স্ক্রুইং উইমেন"

আসার আগে, দিগ্বিজয় ভট্টাচার্যকে ফোন করে সুসংবাদটা জানাতে ভলেনি।

"তোমাকে যে কী ভাবে ধন্যবাদ দেব..."

"দরকার নেই। শুধু কথাগুলো মনে রাখবেন"

খিদে পেয়ে গেছে। দেওয়ালি রুম সার্ভিসে ফোন করে জে ডব্লিউ স্টেকহাউস থেকে ওদের ফিক্সড মেনু অর্ডার দিল। খাওয়া থাকা যখন প্রোডাকশন কম্প্যানির সৌজন্যে, তখন ভালমন্দ খেয়ে অনিরুদ্ধ বোসের পারসুইট বইটা বসে মন দিয়ে পড়বে।

এ লা কার্টে মেনু ছেড়ে, ফিস্কড মেনুই অর্ডার করল। লবস্টার বিসক, ফিলেট মিগনন মেডালিয়ন্স, স্রিম্পস উইথ সিপটলে বাটার সস। সঙ্গে আলু আর ভেজিটেবলস। ডেসার্টে চিজ-কেকের সঙ্গে ফ্রেস স্রবেরি। সঙ্গে পল মেসন এক্সট্রা ড্রাই ক্যালিফিরনিয়ান ওয়াইন।

সোফার ওপর পা ছড়িয়ে ওয়াইনের গ্লাস হাতে বইটা পড়তে শুরু করল। প্রথম তিরিশ পাতায় একটার পর একটা খুন হয়ে যাচ্ছে। নিশ্চয়ই ভিক্টিমদের রোলে অভিনয় করার জন্য সুযোগ পায়নি। ইন্টারেস্টিং গল্প, অনেক রিসার্চ করে লেখা।

রুম সার্ভিস খাওয়া দিয়ে গেলেও, নভেলটা ছাড়তে ইচ্ছে করছে না। পেটে ছুঁচো ডন মারছে, কিছু তো খেতেই হবে। নভেলটা উলটে রেখে খাওয়ার সময় ভাবছে, এই সিনেমার নেশায় সে কতই না পিছিয়ে পড়েছে। নিজের দেশে, খোদ কলকাতা শহর থেকে উপন্যাস লেখা হয়েছে, সে খবর জানতে হচ্ছে অ্যামেরিকায় বসে মার্কের কাছ থেকে, তাও হলিউডে চান্স পাওয়ার পর।

সাহেবরা কদর না দিলে দেশের লোকের মর্ম বুঝতে শিখিনি। এখনও চিন্তাধারা কত সংকীর্ণ! অবশ্য কবেই বা উদার ছিল? মানসিক পরাধীনতায় বন্দি বাঙালির কাছে এর থেকে বেশি কিছু আশা করা যায়? একশ বছর আগে লেখা গল্প আঁকড়ে সংস্কৃতিকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে। কোমর বেঁধে সতীদাহের অভ্যাসটা এখনও গেল না। মন আজও কৃষিকাজ বুঝে ওঠেনি...

আলু বাদ দিয়ে ভেজিটেবলের সঙ্গে মেন কোর্স খেয়ে নিল। ডেসার্টটা থাক, পরে খাবে। এমনিতেই আলু অ্যাভয়েড করে। ভুঁড়ি বাড়লেই চান্স হারাবে। স্লিম ফিগার চাই। ডাম্পড হতে চায় না, বিশেষ করে হলিউডে।

গ্রিপিং গল্পটা। হঠাৎ এমন সব টুইস্ট নিচ্ছে, যে বুঝেই উঠতে পারছে না, এরপর কী হবে? সত্তর পাতা পড়ার পর বুঝতে পারছে, সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার এলিনা। নিশ্চয়ই এলিনার রোল... যদিও বাঙালি, তবু এলিনার বড় হয়ে ওঠা পাঞ্চেত ডি'জংপার ওয়েস্ট সিকিমের মনাস্ট্রিতে। ইন্টারন্যাশনাল হোমরাচোমরারা, ওয়ার্ল্ড কন্ট্রোলের নেশায় একটার পর একটা খুন করে যাচ্ছে। ছোট ছোট চরিত্রগুলো ওদের কন্সপিরেসির মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে। ডামাডোলের মধ্যে, সিকিমের এই অন্ধ বৌদ্ধ মঙ্ক, ছোট্ট একটা মনাস্ট্রিতে বসে নিমরোদের মতো সব অনুভব করছে। এলিনা চরিত্রটা ইন্টারেস্টিং। বুদ্ধিজম আর হিন্দুত্বর মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে। শুধু মার্ডারগুলোরই ইনভেস্টিগেশন করছে না, প্লটের গভীরে গিয়ে রহস্য উন্মোচন ছাড়াও জীবনের গূঢ় রহস্য সন্ধান করছে।

ছাড়তে পারছে না নভেলটা। টানটান উত্তেজনা। ওয়াইন শেষ। ডেসার্ট শেষ করে আরেকটা বোতলের অর্ডার দিল।

"হ্যাভ ইউ ফিনিশড ম্যাম?"

"ইয়েস" রুম সার্ভিসের বয়ের হাতে দশ ডলার গুঁজে বলল "ইউ ক্যান ক্লিন আপ দ্য টেবিল। অলসো আই হ্যাভ অরডার্ড ফর অ্যানাদার বটল। প্লিজ কিপ ইট অ্যাস এ নাইটক্যাপ"

"সিওর ম্যাম, উইল ডু। এনজয় ইওর স্টে উইথ আস"

রুম সার্ভিস বেরিয়ে যেতেই বইয়ে ডুবে গেল। নভেলটা কন্টিনিউয়াস পড়ে যেতে হবে। না হলে খেই হারিয়ে ফেলবে। চুম্বকের মতো টানছে। এত ভাল গল্প, অথচ নাম শোনেনি। সব-ই পাবলিসিটি।

রাত শেষ হতে চলেছে। জেট ল্যাগের জন্য ঘুম নেই। এখন তো ইন্ডিয়াতে দিন। বইয়ের সঙ্গে ওয়াইনের নেশা মিলেমিশে একাকার। উত্তেজনায় নেশা চড়ছে। শেষের প্যারাটা দুবার পড়ল - ... সি ওয়াজ এ চায়েল্ড এগেন, এ চায়েল্ড হু ওয়াজ জাস্ট বর্ন, বর্ন উইথ অল দ্য ইনোসেন্স, বিমিং উইথ জয় অ্যান্ড লাফটার, আনকন্সাস অফ দ্য আউটসাইড ওয়ার্ল্ড। সি ওয়াজ এ প্রোডাক্ট অফ দ্য মাদার নেচার। দিস টাইম সি হ্যাড বিন বর্ন নট টু সি দ্য ওয়ার্ল্ড, সি হ্যাড বিন বর্ন টু সি হার সোল, হার ট্রু সেলফ...

দেওয়ালিরও মাঝেমধ্যে ফিরে দেখতে ইচ্ছে করে নিজেকে। পাপেটের মতো নেচে যাচ্ছে। এই কী সে? তার নিজস্বতা? তার আমি? স্টারডম যতই চমকপ্রদ হোক না কেন, ঘুম ভাঙা অন্ধকারে চমকে ওঠে! আর কতদূর? যেখানে কেউ নেই, তবু যেন কার অমৃতস্পর্শে দেহ মন আনন্দে শিহরিত হয়ে ওঠে প্রতি মুহূর্তে। ইন্টারন্যাশনাল স্টারডমের দরজায় দাঁড়িয়ে খুঁজছে হারিয়ে যাওয়া দেওয়ালিকে।

ওয়ার্নার ব্রাদারসের ডেভিড স্মিথ সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার আগে এলিনাকে হজম করে ফেলতে হবে। আরেকবার পড়তে হবে নভেলটা। এলিনার চরিত্রের ডিফারেন্ট ফ্যাসেটস নিয়ে আরও ডিটেলসে। যাতে জীবন্ত হয়ে ওঠে গল্পের প্রোটাগনিস্ট।

ভোর হয়ে গেছে। দেওয়ালির ঘুম পাচ্ছে। সারা রাত বইটা এক নাগাড়ে পড়েছে। ঘুমোতে যাওয়ার আগে মার্ককে ফোন করল "আই হ্যাভ বিন রিডিং দ্য নভেল হোল নাইট। আই অ্যাম ইয়েট টু রেকুপারেট ফ্রম দ্য জেট ল্যাগ। আই ওয়ান্ট টু রিড দ্য নভেল ইয়েট ওয়ান্স এগেন, টু ডাইজেস্ট দ্য ক্যারেক্টার অফ এলিনা। ক্যান উই পোস্টপন দ্য মিটিং ফর অ্যানাদার ডে?"

"সিওর" মুখে কিছু না বললেও মার্ক বুঝল, তার চরিত্র পিক করতে ভুল হয়নি।

দ্যাটস হোয়াই, হি ইজ নট ওনলি দ্য বেস্ট ইন হলিউড, হি ইজ দ্য ইনভিজিবল ক্রিয়েটর অফ দ্য ওয়ার্ল্ড অফ গ্লিটজ।

আঠাশ

“দ্যাটস ইট। আমি বলেই এতদিন নিয়েছি নইলে তোমার সঙ্গে কেউ ঘর করতে পারবে না” সমর্পিতা শেষে ব্যাগ আর কুসেঞ্জিতকে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

শুভ্রজিৎ জিজ্ঞেস করতেও সাহস করল না, কোথায় যাচ্ছে। ওদের বাড়ি আর ফ্ল্যাটের তো অভাব নেই। কোথাও গিয়ে উঠতেই পারে। কোথাওই হয়ত উঠবে না। হাওড়ার এই জেদি মেয়েটাকে অনেকদিন ধরেই চেনে। অনুশ্রী বিদায় নিয়েছে। সুপর্ণার সঙ্গেও সম্পর্ক টলমল। তার পরেই বিচ্ছেদ। দুটো বিয়েই চার-পাঁচ বছরের বেশি টেকেনি। তখনই সমর্পিতার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা। এটা তো তেরো বছর টিকল। সমর্পিতাই টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করেছিল। শেষ পর্যন্ত, সেও চলে গেল।

কানাঘুষায় শুনেছিল, ইদানীং এক তামিল ফিল্ম প্রডিউসারের সঙ্গে দহরম মহরম। যদিও স্পষ্ট করে কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস পায়নি। ফ্লোরের বাইরে কতটুকুই বা সময় দিয়েছে?

“কী হবে বল-তো শুভ্রজিৎদা?”

“যা হওয়ার হবে। কে সারা সারা...”

প্রথমে দোলনা, পরে সাউথ পয়েন্ট, প্রেসিডেন্সি থেকে এনভায়রনমেন্টাল ইকনমিক্স। দিল্লি ও ব্যঙ্গালুরু ইংলিশ থিয়েটার থেকে উঠে আসা এই মধ্যবয়সী চিত্র পরিচালককে কোনও সদুত্তর দিতে পারেনি। শুভ্রজিতের হাত ধরেই তার চিত্র পরিচালক হিসেবে যা একটু নাম।

“নিঃশব্দ ছবিটা তো চলল না...”

মুম্বাই থেকে ফিল্ম অ্যাক্ট্রেস আনলেই কী চলে? ছবিটা ডকুমেন্টারির মতো হয়ে গেছে। না সিনেমা, না ডকুমেন্টারি। গল্প না থাকলে সিনেমা চলে?”

“তুমি তো জান আমার গল্প তৈরি করার ক্যালি নেই। আগের ছবিগুলোতে এখান ওখান থেকে ঝেড়ে, একটা গল্প খাড়া করেছিলাম। বাবা তো আর্কিটেকচারে প্রফেসার ছিল, যদিও ভালই কবিতা লিখত। খুব ভালই জানত, এসব ক্রিয়েটিভ লাইন থেকে বেশিদিন রোজগার হয় না। মা-ও অ্যানাটমির প্রফেসর। দুজনেই চেয়েছিল লেখাপড়া নিয়েই থাকি, সিনেমা নয়”

“তো দুম করে পিএইচডি, ব্যঙ্গালুরুর চাকরি ছেড়ে, এ লাইনে ঢুকে পড়লি কেন?”

“প্যাশন... প্যাশন বলেই সব ছেড়েছুড়ে এলাম। দুম করে সত্যজিৎ রায়ের ছবি রিমেক করার চান্সও পেয়ে গেলাম। সে সময় তুমিই তো উৎসাহ দিয়েছিলে, লাইন ফিট করে দিয়েছিলে”

“সে তো পাঁচ বছর আগের কথা। তখন বাংলা সিনেমার হাল অনেক ভাল ছিল, যখন আমিও করেকম্মে খেয়েছি। এখন দেখ আমার অবস্থা। নিজেই সিনেমা পাই না, তোর জন্য কী করব?”

“নতুন যে প্রোডাকশন কম্পানিটা খুলেছ, ওখান থেকে ফাইন্যান্স যদি করতে...”

“অত টাকা কোথায়? কিছু টেলিফিল্ম শুরু করেছি, দেখি কোথায় দাঁড়ায়। সমর্পিতা যখন ছিল, রিয়েলিটি শোর কস্টিউম ডিজাইনিং, সেটস, এসব করে বেশ কামাচ্ছিল। চলে যাওয়ার পর, জানি না এখন কী করব”

“পারমানেন্টলি?”

"তাই তো বলে গেল। ভীষণ হেল্পলেস লাগছে"

"বস তুমি আমি এখন একই পথের পথিক। দুজনেই ব্যাচেলার" বিজিত হাসল।

"তোর বয়েস আর আমার বয়েস এক হল? আমি তোর থেকে পনেরো বছরের বড়। তোর এখনও মেয়ে নিয়ে ফুর্তি করার বয়স আছে। আমার তো নেই"

"পকেটে রেস্ত, আর হাতে ছবি না থাকলে, কোনও মেয়েই পাত্তা দেয় না"

"এক মালদার বাপের মেয়ের সঙ্গে লটকে পড়। রাজত্ব প্লাস রাজকন্যে। সে-ই ফাইন্যান্স করে দেবে। তুই তো আমার মতো অর্ধ শিক্ষিত নয়। লেখাপড়া করেছিস। এমএ, এমফিল। তোর অসুবিধা হবে না। এখন তো আবার সেলিব্রিটি" মুচকি হেসে বলল "বিয়ের বাজারে নেমে পড়"

"তাহলে তো, এ লাইনের মেয়ে ছেড়ে, অন্য লাইনের মেয়ে খুঁজতে হয়"

"ধ্যত, এই লাইনের মেয়েদের কেউ বিয়ে করে? আমাকে দেখে শিখছিস না? তিনটের মধ্যে দু-দুটোই তো লাইনের। টিকল"

"সব-ই কপাল বস। ফোটবার থাকলে ফুটবে। লাইন, বে লাইন, এসব কোনও ব্যাপারই নয়"

ফাঁকা মাঠে, একা ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে ভুলেই গেছে, যে চিরকাল সময় ভাল যায় না। চামুণ্ডেশ্বরীর সঙ্গে একাই টলিউড দাপিয়েছে। কাউকে ঢুকতে দেয়নি।

"তুই কী কিছু নতুন স্ক্রিপ্ট লিখেছিস?"

"তোতাকাহিনি শেষ করলাম, চামুণ্ডেশ্বরীর ব্যানারে। নিঃশব্দ ফ্লপের পর মনিকান্ত বলছে এটার প্রগনোসিস না দেখে, পরেরটার জন্য মালকড়ি ছাড়বে না। তোমার তো এতদিনের বন্ধু। ওদের জন্যে কত হিট দিয়েছ। একবার আমার জন্যে বলবে বস?"

শুভ্রজিতের আর কোনও আগ্রহ নেই। এমনিতেই সমর্পিতা চলে যাওয়াতে ডিস্টার্বড। রিসেন্ট ছবিগুলোতে নতুন সব হিরো-হিরোইন নিয়ে বিজিত ছবি করছে। দু-একটা ক্যারেক্টর রোলও তো লিখতে পারে ওর জন্যে। বিজিতের সাকসেসের পেছনে কী তার কোনও হাত নেই? তার কথা মনে রেখেও তো একটা স্ক্রিপ্ট লিখতে পারে। যে ছবিতে সে অভিনয় করবে না, বিজিতের জন্যে সুপারিশ করে কী লাভ?

"দেখি... ওদেরও তো বাজার ভাল যাচ্ছে না"

চামুণ্ডেশ্বরীর গতে বাঁধা প্রোডাকশনগুলো আর চলছে না। মফসসলে এ ধরনের ছবির একটা মার্কেট ছিল। যাত্রার সাবস্টিটিউট। একসময় সেগুলো কাটত। এখন যাত্রাও চলে না, সেই ধরনের ছবিগুলো তো নয়ই। প্রয়াগ বা রামোজি ফিল্ম সিটিতে বিদেশের সেট বানিয়ে বাইরের শুট করা সিকোয়েন্স বলে চালাত। এখন গ্রামের লোকেরাও চালাক হয়ে গেছে।

অথচ ব্যানারের যে ইমেজ করেছে শুভ্রজিৎ, বিজিতদের জড়িয়ে, সেই ইমেজে কোনও কোয়ালিটি ডিরেক্টর কাজই করতে চায় না। তারা তাদের মতো সিনেমা করবে, ওদের গতের বাইরে। বরং ঘরে বসে থাকবে তবুও ওদের কথা মেনে কাজ করবে না। ওদের কোনও ফরমুলাতেও নয়।

মনিকান্ত বলল "বাজার কা হাল কাফি খারাপ। তামিল রিমেক ভি আজকল নেহি চলতা"

"নই কোই স্টোরি লাগাইয়ে। ফির তো চলেগা" শুভ্রজিৎ গম্ভীরভাবে বলল।

"কেয়া নয়া স্টোরি? হর ডিরেক্টর তো রবীন্দ্রনাথ ঔর ব্যোমকেশকে পিছে পড়া হ্যায়। উসে ছোড়কে বাঙ্গাল কা পাবলিক ঔর কুছ ভি নেহি সোচ সকতা। কেয়া করু?"

"ইংলিশ পিকচার কা রিমেক কিজিয়ে"

"কেয়া বোলতা জিত? ইংলিশ পিকচার? উসকা বাজেট জানতা? কিতনে পড়েগা? হল কলেকশন ছোড় কর, ইলেক্ট্রনিক রাইটস সে ভি পয়সা ওসুল নেহি হোগা। লস মে পিকচার করে?"

"ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক ঠিক কিজিয়ে। বাঙ্গাল মে কুছ হোনে ওয়ালা নেহি হ্যায়। হিন্দি পিকচার সে জ্যাদা কামাই হোতা ইসলিয়ে আয়নক্স ওয়াগারা হল মে ভি, জ্যাদা দিন নেহি রাখতা"

"হামারে ভি তো, ডিসট্রিক্ট মে বোহত হল হ্যায়। উধার ভি চলতা নেহি"

"বাঙ্গাল কে বাহার। মুম্বাই, চেন্নাই, দিল্লি, চণ্ডীগড় মে..."

"আদমি কো, একহি প্রাইস মে ডাবড তামিল পিকচার দেখনে কো মিল জায়, তো কৌন বাংলা মুভি দেখেগা সিরফ বাঙ্গালি ছোড়কে? উনলোগ বিজিতকা মাফিক দো-এক পিকচার দেখ সকতে হ্যায়, লেকিন মহাদেভ, অবন্তীওয়ালা পিকচার নেহি দেখেগা। পাবলিসিটি কা ভি খরচা হ্যায়। ডিস্ট্রিবিউটার মিলে তো ভি ওসুল নেহি হোগা"

"হমলোগ কো ভি তো জিনা হ্যায়..."

"অপনে প্রোডাকশন কম্প্যানি খুলা। দেখ, কিতনা মুনাফা হোতা"

শুভ্রজিৎ কিছু বলতে পারল না। নিজের প্রোডাকশন হাউসই টেলিফিল্ম করে টালমাটাল। সে আর কী বলবে? এখন তো পাশে সমর্পিতাও নেই যে ভরসা দেবে। যেগুলো আছে, সেগুলো ধান্দার পোঁ। কবে সটকে পড়বে, কে জানে? এরা বুঝবে না। একবার মৃদুলের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

মৃদুলের রিয়া সিনেমার ছাদে পার্টি। যেমন প্রায়শই দিয়ে থাকে। একটানা প্রখর প্যাচপ্যাচে গরমের পর কাল রাতে বৃষ্টিটা সেভাবে না হলেও গুমোট অনেকটাই কমেছে। এই দু-সপ্তাহ ধরে এসিতে বসে হাঁপিয়ে উঠেছিল মৃদুল। কংক্রিট জংগল যতই সুখপ্রদ হোক না কেন, খোলা হাওয়ার ঘ্রাণ না নিলে দম বন্ধ হয়ে আসে। প্রাইমারি লেভেলে সেন্ট জেভিয়ারস স্কুল ছেড়ে দার্জিলিং সেন্ট পলস। যাদবপুর ইউনিভারসিটিতে পড়া অবধি আর ফেরত আসেনি। ওখানকার মাটির ঘ্রাণ, বাতাস, পাহাড়, খোলা আকাশ বারবার টানে। ওখানেই যেন জীবনের প্রাণ আছে, উন্মুক্ত আকাশের নীচে, পাহাড়ের কোলে। সন্ধেবেলা লনে বসে হুইস্কি কিংবা হুটহাট করে শিকারে বেরিয়ে যাওয়ার মধ্যে যে চার্ম আছে, কলকাতায় নেই।

সেখানে সন্ধ্যা ধীরে ধীরে ছেয়ে ফেলে হিমেল চূড়াগুলো। গুটি গুটি পায়ে, গাঢ় অন্ধকার নেমে আসে সন্ধ্যাতারার আগরবাতি জ্বালিয়ে শান্ত নীরবতার কোলে। স্থির, শিথিল। ওক, দেওদার, পাইনের সমারহ ছাড়িয়ে, পাহাড়ের বধির বুকে, গেয়ে চলে রাত জাগা গান। সেখানেই সে খুঁজে পায় নিজেকে, কলকাতার ভিড়ে নয়। তবুও কলকাতায় রিয়া এন্টারটেনমেন্টসের সাম্রাজ্য। কদ্দিন পালিয়ে থাকা যায়? তাই মাঝেমধ্যে পার্টি, আড্ডা। কোনও স্বার্থে নয়। খাওয়াতে ভালবাসে, ভালবাসে মানুষকে। আন্তরিকতার জন্যই বুঝি কলকাতার যে কোনও সেলেব এক ডাকে হাজির হয়। ঢালাও ড্রিঙ্কস, অঢেল খাবার, সুন্দরী তো আছেই। তারই ফাঁকে কিছু বিজনেস ডিল।

শুধু রিয়া হল-ই নয়, সাম্রাজ্য কোথায় নেই? বোলপুর, মেমারি, গুশকরা, ইলামবাজার, দুর্গাপুর, হলদিয়া বা রাজেরহাটেই নয়, থিম্পুতেও তার বিস্তার।

রঙিন ফোয়ারার মধ্যে শুভ্রজিৎ এক ফাঁকে মৃদুলকে ছাদের কোনায় টেনে বলল "বাজার ভীষণ মন্দা। নতুন কোনও ছবির কাজও নেই। কিছু করা যায় না?"

"আমার ব্যাবসাই লাটে ওঠার জোগাড়। একসময় ডিসট্রিক্টের রমরম করে চলা হলগুলোও বন্ধ করে দিতে হচ্ছে। রোজই একটার পর একটা হল ছেড়ে দিচ্ছি। পাবলিক কী যে চায়, বুঝতে পারছি না"

"আমারও তো একই দশা। এক সময় ডিসট্রিক্টে মারমার কাটকাট করে ছবিগুলো চলত। এখন কোনও ছবিই লাগছে না"

"এখন আর লোকে সিনেমা দেখে না। ঘরে বসে ফোকটে সিরিয়াল দেখে নইলে ফেসবুক, হোয়াটস অ্যাপ নিয়ে খেলছে। ইকনমির অবস্থাও ভাল নয়। ইনফ্লেশন, রোজগার নেই। হলে গিয়ে কে খরচ করবে?"

"তবুও তো আমাদের টিকতে হবে"

"যেমন টেলিফিল্ম করছ, তেমনই কর"

"ওতে তো স্টারডম নেই। খরচা তুলতেই প্রাণ ওষ্ঠাগত"

"স্টারডমের কথা ভুলে যাও। ওসব দিন পার হয়ে গেছে। এখন নতুন নতুন ছোকরারা আসছে। যা দেবে, তাতেই করে দেবে। মহাদেব, অবন্তীর অবস্থা দেখছ না? এখন আর কেউ স্টার দিয়ে সিনেমা করাতে চায় না, নিজেরাই স্টার হতে চায়"

মৃদুল-ই পারে অপ্রিয় কথাটা সোজাসুজি বলতে। কটু হলেও সত্যি। ইন্ডাস্ট্রিতে যে আর কারও ক্ষমতা নেই, শুভ্রজিৎকে সেই অপ্রিয় সত্যটা মুখের ওপর বলে। পড়ন্ত হলেও, এতকালের একচেটিয়া জনপ্রিয় নায়ক। কার বুকের পাটা আছে, টলি-সম্রাটকে সোজাসাপ্টা অপ্রিয় কথা বলার?

হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে বলল "ভুলে যাও ব্রাদার, পুরনো দিন ভুলে যাও। এখন তোমার যা বয়স তাতে হিরো হিসেবে কেউ নেবে না, এক ক্যারেক্টার রোল ছাড়া। এই ছবি তো আর মফসসলে কাটবে না। আমার হলগুলোতেও নয়। তাই প্রোডাকশন থেকে যা পার কামিয়ে নাও"

ভুল কিছু বলেনি মৃদুল। এটাই রিয়ালিটি। কিন্তু মন যে মানে না। এতকালের সাম্রাজ্য এক নিমেষে হারিয়ে গেলে কী নিয়ে বাঁচবে? যেটুকু অবলম্বন ছিল সমর্পিতা, সে-ও চলে গেল। ব্যস্ততা ছেড়ে নিরবচ্ছিন্ন ঘরে বসে হুইস্কি। না হলে কোনও ওপেনিং আলোকিত করে, খবরের কাগজে ছবি বেরলে মনকে সান্ত্বনা দেওয়া। জিরো ভবিষ্যতে এখনও সে বাংলার এক নম্বর হিরো। সেখানেই যা তৃপ্তি।

"মৃদুলদা আমাদের কথা ভুলেই গেছ" কচি হিরোইনগুলো হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল।

"কেন ভুলব? তোদের ড্রিঙ্কস ঠিকমত দিচ্ছে না?"

"এই তো, ড্রিঙ্কস হাতে। তোমার শিকারের গল্প শুনব। ইওর রিয়াল লাইফ এক্সিপিরিয়েন্সেস" মৃদুল ওদের সঙ্গে ভিড়ে গেল।

শুভ্রজিৎ আলো-আঁধারিতে ছাদের এক কোণে, গ্লাস নিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে। একদিন মনে হত, তারাগুলো কত কাছে। হাত বাড়ালেই ধরা যায়। আজ অনেক দূরে। দু-হাত বাড়িয়ে ধরতে চাইলেও পারছে

না। তিরিশটা বছর হারিয়ে গেছে, মহাশূন্যে। স্বপ্নের স্বর্গটা হারিয়ে গেছে ওই দূর আঁধারে। দূরে... বহুদূরে... তার ধরাছোঁয়ার বাইরে। চাইলেও ছুঁতে পারছে না।

উনত্রিশ

এলিনার চরিত্রে দেওয়ালি। যদিও গল্পের গতিতে অভিনয় দক্ষতা প্রমাণের খুব একটা বেশি সুযোগ ছিল না, তবুও জমজমাট গল্পের বুনুনি, নিখুঁত এডিটিং, আর মন মাতানো বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জায়গার ফটোগ্রাফিতে, প্রথম উইকে ১০০ মিলিয়ন ডলারের ব্যবসা করল।

বিজনেস ডিরেক্টর জন হ্যান্ডারসন দেওয়ালিকে বলল "দ্য মুভি পারসুইট হ্যাস ডান এক্সট্রিমলি গুড বিজনেস গ্লোবালি ইন দ্য ফার্স্ট উইক। ইউ হ্যাভ কন্ট্রিবিউটেড টু আওয়ার এনরমাস রেভিনিউ। আই হ্যাভ প্রোপসড দ্যট উই রিটেন ইউ ইন আওয়ার ফিউচার প্রোডাকশনস"

সাকসেসের সিংহদরজা খুলে গেল। দেওয়ালি যেন স্বপ্ন দেখছে। স্যম্পেন-কর্ক খোলার ফোয়ারা। ভাসিয়ে দিচ্ছে তার অস্তিত্বটাকে। ওপারে বিশাল সমুদ্র, তার কল্পনারও বাইরে। সেই সাগরের তীরে হ্যান্ডারসন উত্তরণের মন্ত্র শোনাচ্ছে।

সেলিব্রেশনটা ওয়ারনার ব্রাদারসের অফিসে নয়। এলএ ম্যরিয়টের সুইটে। মার্ক ডম পেরিগননের বোতল খুলে বলল "চিয়ার্স। আই নিউ ইউ কুড মেক ইট। ইট অ্যাডস অ্যান অ্যাডিশনাল বুসট টু মাই কেরিয়ার অ্যাস ওয়েল"

"আই কুড গেট হিয়ার বিকস অফ ইউ"

"দিস ইজ জাস্ট দ্য বিগিনিং অফ দ্য স্টোরি। আই ওয়াজ গোয়িং থ্রু দ্য আদার নভেলস অফ দ্য অথার। আই ফাউন্ড অ্যানাদার ইন্টারেস্টিং নভেল, ফালক্রাম... হুইচ ইজ অ্যাকচুয়ালি এ মার্ডার মিস্ট্রি সাসপেন্স থ্রিলার, হুইচ হ্যাস দ্য পোটেনশিয়াল অফ বিইং এ হিট। হ্যান্ডেড ওভার দ্য স্টোরি ফর দেম টু রিড। লেটস সি..."

"ইজ দেয়ার এ রোল সুটেবল ফর মি দেয়ার?" দেওয়ালি ডম পেরিগননে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করল।

"ওয়েল দেয়ার ইজ এ সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার ইন্দ্রাক্ষি, হুইচ ইউ ক্যান পোট্রে। অফ কোর্স, দ্য ক্যারেক্টারস ইজ এ উই বিট ওল্ডার দ্যান ইওরস। দ্যাট ক্যান বি টেকেন কেয়ার অফ। ইট হ্যাস মোর অ্যাক্টিং পোটেনশিয়াল দ্যান এলিনা"

"হোয়াইল আই অ্যাম হিয়ার ফ্রি অফ আদার কমিটমেন্টস, আই উড লাভ টু গো থ্রু ইট"

"দে হ্যাভ নট কনফারমড এনিথিং ইয়েট। অফ কোর্স, ইউ ক্যান। বাট দ্য ওনলি কপি আই হ্যাড, আই হ্যাড হ্যান্ডেড ইট ওভার টু দেয়ার প্রাইমারি অ্যাসেসর। হোয়েন আর ইউ লিভিং?"

"ইন এ উইক্স টাইম। জন আস্কড মি টু হ্যং অ্যারাউন্ড ফর এ উইক"

"হোয়াই?"

"হ্যাভেন্ট এ ক্লু"

"দেয়ার মাস্ট বি সামথিং ব্রুয়িং। লেট মি চেক ইট আউট"

দেওয়ালি জানে না কি ব্রু করছে। মার্কের কথায় মনে হল, সামথিং পসিটিভ। নতুন আভাস শুনছে, আগামীর সুরে। মার্ক চলে গেছে ডিনার খেয়ে। দেওয়ালি জামকাপড় ছেড়ে সিল্কের নাইটি জড়িয়ে স্যাম্পেনের গ্লাস হাতে জানলার ধারে দাঁড়াল। আকাশের আলো কমে এসেছে। আকাশের ক্যানভাসে ফুটে ওঠা দূরের তারাগুলো, এখন আর অত দূরের মনে হচ্ছে না। রাতের আঁচলটার আস্তিন ধীরে ধীরে অন্ধকারের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে ধীর শিথিল পায়। আকাশের এঘর ওঘর সেঘরের দরজা খুলে মৃদু তারার মোমবাতি জ্বালিয়ে দিয়েছে।

সুদূরের হলিউড যখন ধরা দিয়েছে, তখন রেড কার্পেটে হেঁটে অস্কার নিতে যাওয়াই বোধহয় পোলস্টার। সেই তারার নিশানায় এগিয়ে যাওয়া। ফালক্রাম-এর ই-বুকটা কালই ডাউনলোড করে পড়ে ফেলতে হবে। এখানে এক সপ্তাহের ব্রেকটা নষ্ট করতে চায় না। মন বলছে, আবার ডাক পাবে। অন্তত মার্কের কথায় তো তাই মনে হল। রাত অনেক হয়েছে। স্যাম্পেনের নেশায় ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। নাইটিটা বিছানার এক ধারে ছুঁড়ে বিবস্ত্র দেহটাকে চাদরের আচ্ছাদনে মুড়ে দিতেই ঘুম।

আবার সেই পুরনো ড্রিম। একটা অন্ধকার গুহার মধ্যে সে একা দাঁড়িয়ে, অভিমুন্যের মতো, গাঢ় অন্ধকারের সঙ্গে লড়ছে। কোথাও এক ফোঁটা আলো নেই... ঘুমটা ভেঙে গেল। আজ তো স্বপ্নের সিঁড়ির নিচে সে দাঁড়িয়ে। তবে কী অন্ধকার গুহার যজ্ঞে সে এখনও পবিত্র হয়নি?

দিন চারেক পর ফালক্রাম শেষ করতে না করতেই মার্কের ফোন "ইয়াহু! দে হ্যাভ সিলেক্টেড দ্য নভেল অ্যাস ওয়ান অফ দেয়ার আপকামিং ভেঞ্চারস। আই হ্যাভ প্রপোসড ইওর নেম। দ্য কাস্টিং টিম আর কন্সিডারিং..."

আনন্দে, আশংকায় ছ্যাঁত করে উঠল বুকটা... পারবে তো? হয়ত চান্স আছে। না হলে জন হ্যান্ডারসন কেনই বা তাকে হল্ট করতে বলল। নাথিং সাকসিডস লাইক সাকসেস।

আরও দুদিন পর যখন রিটার্ন ফ্লাইট কনফার্ম করতে নেট খুলেছে, আচমকা মার্কের ফোন "ডান... ইউ গট ইট। ডু আই গেট অ্যান এক্সট্রা কমিশন ফর মাই হার্ড ওয়ার্ক?"

"এনিথিং ফর ইউ মার্ক। আই ওয়াজ অ্যাবাউট টু বুক মাই রিটার্ন ফ্লাইট"

"হ্যাং অন আনটিল ইউ সাইন দ্য কন্ট্র্যাক্ট। অফ কোর্স ইট মে বি এ হোয়াইল বিফর থিংগস স্টার্ট রোলিং। টিল দেন, ইউ ক্যান ডিসাপিয়ার টু ইন্ডিয়া টু ক্যারি অন ইওর আদার কমিটমেন্টস"

"অ্যাস ইউ সে"

পারসুইটের সাফল্যের পর ফালক্রামের কন্ট্র্যাক্ট সই করে কলকাতায় ফিরতেই ফোনের বন্যা। মিডিয়া সারাক্ষণ পেছনে ছুটছে...

"একটু টাইম দিতে পারবে? একটা লাইভ প্রোগ্রামের জন্যে?" সৈকতের ফোন।

"একদম সময় নেই। কালই মুম্বাই ছুটতে হবে"

"যখন তোমার সুবিধা হবে। লাইভ প্রোগ্রাম ছেড়ে দাও, অন্তত একটা ইন্টারভিউ?"

"তারও সময় নেই সৈকতদা। অনেক ফোন আসছে, রাখছি"

যাওয়ার আগে অন্তত পারসুইটের লেখককে ধন্যবাদ জানিয়ে যেতে হবে। পাবলিশারের কাছ থেকে ফোন নম্বর নিয়ে ফোন করল "একটু দেখা করতে চাই"

"চলে আসুন আমার বাড়ি সল্ট লেকে"

সল্ট লেকের দোতলার ড্রয়িং রুমে বসে চা খেতে খেতে বলল "আপনার গল্পের জন্যই আমার হলিউডের সাকসেস"

"আপনার সাকসেস ঈশ্বরের আশীর্বাদে। আমি ভেহিকেল মাত্র। এই ছবিটা হিট করায় আমারও কিছু রোজগার হল। ওরা ফালক্রামের ফিল্মিং রাইটস সই করিয়ে নিয়ে গেছে। ওদের মুখেই শুনলাম, সেখানে আপনাকে ইন্দ্রাক্ষির ক্যারেক্টারে কাস্ট করার কথা ভাবছে"

"ভাবছে না, কনফার্ম করে দিয়েছে। আসার আগে কন্ট্র্যাক্ট সই করেই এলাম"

"যেহেতু আমি কনসার্নড নই, তাই আমায় জানায়নি"

"এ খবরটা এখানে কেউ জানে না একমাত্র আপনি আর আমি ছাড়া। প্লিজ কাউকে জানাবেন না"

"এখন জানাবার তো কিছু নেই। যখন জানবার, এমনিই জানবে। ভাল অভিনয় করুন। আরও এগিয়ে জান। বয়োজ্যেষ্ঠ হিসেবে এই কামনা করি। ওই গল্প নিয়ে ভায়াকম ১৮-র সঙ্গে কথাবার্তা চলছে হিন্দিতে ছবি করার। অবশ্য এখনও ওরা কনফার্ম করেনি। করলে আপনার নাম প্রপোস করতে পারি?"

"অফ কোর্স"

"যখন ওয়ারনার ব্রাদার্স থেকে দুটো ছবির রয়ালটি পেয়েছি, ভাবছি আমার গল্প ক্যানভাসে ছবিটা বাংলায় করব। তার হিরোইন নন্দিনীর রোলে আপনাকেই ভেবে রেখেছি। করবেন তো?"

"নিশ্চয়ই। আই ও দিস টু ইউ"

মুম্বাইর ফ্লাইটে বসে ভাবছে কোথায় ছিল, আর ঝট করে কোথায় পৌঁছে গেল। একেই বলে ভাগ্য। তকদির কা খেল। লোখান্ডওয়ালার ফ্ল্যাটে প্রোডিউসারদের লাইন। দেওয়ালি এখন অনেক বেশি সতর্ক। উঠতে যতক্ষণ লাগে, পড়তে তার দ্বিগুণ। ষাট-সত্তরের এক বিখ্যাত নায়কের কথা মনে পড়ে। বড় কষ্টে চলে গেছেন। এখন স্ক্রিপ্ট শুনতেই সময় কেটে যাচ্ছে। সাকসেসের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আরও বেশি করে মাটি আঁকড়ে ধরেছে। হাওয়ায় ভাসার একটুও শখ নেই।

"আই হ্যাভ অনাদার এক্সকুইজিট রোল ফর ইউ" ফোনে বসুন্ধরা "ফর ইউ অ্যান্ড ইউ ওনলি। ক্যান আই কাম অ্যালং উইথ দ্য স্ক্রিপ্ট?"

"ইউ নো, ইউ আর ওয়েলকাম এনিটাইম। আই সাপোস ইট উইল টেক এ ডে টু গো থ্রু দ্য স্ক্রিপ্ট?"

"ইফ ইউ ক্যান স্পেয়ার..."

"শ্যাল উই সে আফটার টুমরো, স্যাটারডে?"

"ফাইন। আই উইল কুক সাম লাঞ্চ ফর ইউ"

"ইলেভেন ও'ক্লক শার্প"

দেওয়ালি উদগ্রীব আগ্রহে রান্না স্নান শেষে যেই বেরিয়েছে, সিকিওরিটি জানাল বসুন্ধরা এসে গেছে। "আই ওয়াজ ওয়েটিং ফর ইউ টু বি ব্যাক ফ্রম এলএ। ওনলি ইউ, ফিট ইনটু দ্য ক্যারেক্টার"

“বসুন্ধরাজি, দ্যটস সো কাইন্ড অফ ইউ টু থিংক অফ মি। ইউ গেভ মি মাই ফার্স্ট বিগ ব্রেক। হাউ ক্যান আই ফরগেট দ্যাট? নেভার। নাউ হোয়াট হ্যাভ ইউ ইন স্টোর ফর মি?”

“দিস ইজ মাই ওউন ইন্টারপ্রিটেশন অফ দ্য গ্রিক মিথলজি অ্যাবাউট প্রমিথিয়াস। হ্যাভ ইউ হার্ড অফ প্রমিথিয়াস?”

“নো”

“মেরি সেলিজ ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন ওয়াজ দ্য দেন মডার্ন অ্যাডাপ্টেশন অফ দ্য গ্রিক মিথলজি। সিওরলি ইউ হ্যাভ হার্ড অফ ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন?”

“অফ কোর্স। আই হ্যাভ রেড ইট”

“ওয়েল লেট মি ফার্স্ট টেল ইউ এ বিট অ্যাবাউট দ্য গ্রিক মিথলজি। প্রমিথিয়াস ইজ বেস্ট নোন ইন গ্রিক মিথলজি, অ্যাস দ্য গ্রেটেস্ট বেনিফ্যাক্টর, হু ব্রট ফায়ার টু ম্যানকাইন্ড। হি সাইডেড উইথ ঝিয়াস অ্যান্ড আদার অলিপম্পিয়ান গডস, ইন দ্য কসমোলজিক্যাল স্ট্রাগল উইথ ক্রোনস অ্যান্ড আদার টিসিয়ান্স; বিইং অন দ্য কঙ্কারিং সাইড, ইন দ্য ড্রেডফুল ওয়ার উইথ দ্য গ্রিক গডস, লাইক টাইট্যানোম্যাকি অ্যান্ড আদারস। আলটিমেটলি ডিফিটিং ক্রোনস অ্যান্ড আদার টিসিয়ান্স”

গল্পটা শুনতে ভাল লাগছে। কিন্তু দেওয়ালি বুঝতে পারছে না, হঠাৎ বসুন্ধরা গ্রিক মিথলজি নিয়ে পড়ল কেন? যদ্দুর শুনেছে তাতে তো প্রমিথিয়স পুরুষই মনে হচ্ছে। বলিউডে কী গ্রিক মিথলজি চলবে?

বসুন্ধরা বলে চলেছে “প্রমিথিয়স, হ্যাপেন্ড টু বি দ্য সন অফ টিটান, আয়েপেটাস অ্যান্ড ক্লাইমিন, ওয়ান অফ দ্য ওসেনয়েডস। হি হ্যাড এ ব্রাদার নেমড এপিমেথিয়াস” দেওয়ালিকে চুপ করে থাকতে দেখে বলল “ইউ মাইট বি ওয়ান্ডারিং হোয়াই আই অ্যাম ন্যারেটিং এ গ্রিক মিথলজি। ইট হ্যাস রেলেভ্যান্স টু মাই স্ক্রিপ্ট। অ্যাপারেন্টলি প্রমিথিয়াস সিগ্নিফায়েজ ফোর থট, অ্যান্ড এপিমেথিয়স সিগ্নিফায়েস আফটার থট। ওয়ান ডে, হি ওয়েন্ট টু ঝিয়াস অ্যান্ড আস্কড হিম হোয়াই হি ওয়াজ নট গিভিং ফায়ার টু ম্যানকাইন্ড? ঝিয়াস রিপ্লায়েড দ্যাট ম্যান ওয়াজ হ্যাপি, অ্যান্ড উড নট বি সো, ইফ দে গট ফায়ার, অ্যাস দে ডোন্ট হ্যাভ এ ক্লু হাউ টু ইউজ ইট। ঝিয়াস রিফিউসড টু গিভ দেম ফায়ার। প্রমিথিয়াস স্টোল ফায়ার ফ্রম মাউন্ট অলিম্পাস অ্যান্ড গেভ ইট টু হিউম্যানিটি, মাচ টু ডিসকন্টেন্ট অফ ঝিয়াস” থেমে বলল “হাউ ওয়াজ দ্য স্টোরি?”

“ইন্টারেস্টিং” এতক্ষণ এক নাগাড়ে শুনছিল। এবার সিগারেট ধরিয়ে বলল “হোয়াট রেলেভ্যান্স হ্যাস ইট উইথ দ্য স্ক্রিপ্ট? সিওরলি ইউ আর নট মেকিং এ মিথলজিক্যাল স্টোরি!”

“ডেফিনিটলি নট। কামিং টু ইট। ম্যান হ্যাড বিন ফ্রাইটেন্ড অফ ফায়ার। সো দে রেস্পেক্টেড ঝিয়াস। ওয়ান্স দে গট দ্য গিফট অফ ফায়ার, দে রিয়েলাইজড, হোয়াট ইট কুড ডু। মাচ টু দ্য র‍্যাথ অফ ঝিয়াস, হু রিয়েলাইজড, হি হ্যাড লস্ট হিস পাওয়ার অ্যান্ড দ্য অ্যাডরেশন দ্যট অ্যাকম্প্যানিড ইট। ইন আওয়ার ভেদিক মিথ টু, দেয়ার দ্য ওয়ার্ড ‘প্রমথ’ হুইচ মিন্স টু স্টিল। দেয়ার ইজ এ সিমিলারিটি উইথ দ্য গ্রিক মিথলজি। ফ্রম দ্য ওয়ার্ড প্রমথ কেম ‘প্রমন্থ’ হুইচ ওয়াজ এ টুল টু ক্রিয়েট ফায়ার” থেমে বলল “আই নিড এ ড্রিঙ্ক”

“লেট মি গেট ইউ এ ক্যান অফ বিয়ার”

বিয়ারে চুমুক দিয়ে বলল "ইন রিগ ভেদা মাতারিসভন ইজ দ্য নেম অফ অগ্নি, হু ব্রিংস দ্য ডিভাইন ফায়ার টু দ্য ভৃগুজ। মেরি সেলি ক্রিয়েটেড ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন অন দ্য সেম কনসেপ্ট। দ্য ব্লেসিং অফ গুড। মাই সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার ইন দ্য স্ক্রিপ্ট, ইজ নট প্রমিথিয়াস অর প্রমথ অর ভিক্টর, বাট দেওয়ালি, অ্যান্ড... দ্যাট ইজ, ইউ"

এবার দেওয়ালির কাছে পরিষ্কার। বসুন্ধরা বর্তমানের প্রেক্ষাপটে একই ভাষায় কোনও গল্প বলতে চাইছে, যা আগুনের স্ফুলিঙ্গ হয়ে সমাজকে আবার নতুন জীবন দেবে। এতক্ষণ বুঝতেই পারছিল না, কেন বসুন্ধরা তাকে স্ক্রিপ্ট না শুনিয়ে গ্রিক মিথলজি শোনাচ্ছে। একই মন্ত্র, যার ভিত্তিতে ফ্র্যাঙ্কেন্সটাইন লেখা হয়েছিল, সেটা আজকের দিনেও প্রযোজ্য।

বসুন্ধরা বলল "ইজ দ্যাট ক্লিয়ার হোয়াই আই ওয়াজ সিঙ্গিং এ প্রেলুড অফ মিথস, বিফোর ন্যারেটিং মাই স্ক্রিপ্ট? দ্য স্টোরি ইজ দ্য সেম, ইভন টুডে। দ্য রোল অফ ফায়ার, কিন্ডলিং হিউম্যানিটি। বি ইট প্রমিথিয়াস, অর ভিক্টর, অর ইন মাই স্টোরি দ্য প্রোট্যাগনিস্ট, হুম আই হ্যাভ পোট্রেইড অ্যাস এ ফিমেল। আই ওয়ান্ট ইউ ফর দ্য লিড রোল। দ্য ট্রুথ ইন রিয়ালিটি, ইন টুডেস কন্টেক্সট। আই হ্যাভ মেইড এ নাইস স্ক্রিপ্ট"

এ জন্যেই বসুন্ধরা অন্যান্য পরিচালকদের থেকে স্বতন্ত্র। তাই বিদেশে ওর ছবি সমাদৃত হয়। তাই ওর ছবি করে দেওয়ালি কান্স-এর রেড কার্পেটে হাঁটতে পারে। হলিউড ব্লকবাস্টার মিলিয়ন ডলারের ছবি করতে পারে। কিন্তু একজন ইন্ডিয়ানের-ই ক্ষমতা আছে সেই দর্শন দেওয়ার, যা এতক্ষণ শোনাল বসুন্ধরা।

"আরন্ট ইউ হাংরি?"

"আই অ্যাম ফ্যামিসড"

"দেন লেটস হ্যাভ লাঞ্চ, বিফোর আই হিয়ার ইওর স্টোরি"

যখন বসুন্ধরা গেল, তখন রাত হয়ে গেছে। শুনতে শুনতে, চরিত্রের গভীরে প্রবেশ করতে গিয়ে অনুভব করল, এমন ছবি সে এতদিন পায়নি। চরিত্রটাকে পুরোপুরিভাবে হজম করলে দারুণ কাজ হবে। ঠিকমতো করতে পারলে অনেক অ্যাওয়ার্ড গ্যারান্টিড। ভেতরে রোমাঞ্চ। বলিষ্ঠ লয়ে নতুন আঙ্গিকে...

লোখান্ডওয়ালার বাইরের কোলাহল ম্লান। একাকী ঘরে নতুন চরিত্রের গভীরে। সুরটা ভেতরেই ছিল, আজ এই গল্পের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসেছে শুধু... টু এক্সেল, ইউ হ্যাভ টু বি ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য রেস্ট...

হলিউডে প্রথম ছবি মিলিয়ন ডলারের বিজনেস করে তাকে অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র করে দিয়েছে। কিন্তু চূড়াটা এখনও অধরা। মাউন্ট অলিম্পাসের চূড়ায় সম্রাটের মতো...

শুধু প্রমিথিয়াসের মতো একটু বুকের পাটা চাই। নরকের তোয়াক্কা না করে সেই উচ্চতা থেকে একটু আগুন এনে ভরিয়ে দিতে হবে নিজেকে।

ত্রিশ

"আজকাল প্রোগ্রাম খুব কমে গেছে" ঋষিকার আক্ষেপ।

"সত্যি ঋষিকাদি। তুমি তো এবার অ্যামেরিকার বঙ্গ সংস্কৃতিতে গেছ। আমার তো সেটাও জোটেনি। এখন প্রোগ্রাম বলতে কিছু এন আর আই মাঝেমধ্যে বাইরে থেকে এলে নিজেদের দেশি গরজ প্রমাণ করতে উইভারস স্টুডিও বা আইসিসিআর-এ আমার ডাক পড়ে" পরাজিত, দুর্জয় মেয়েলি ভঙ্গিমা।

"কী যে করব বুঝতে পারছি না। এখন আর লোকে এসব ট্র্যাডিশনাল গানের প্রোগ্রাম স্পন্সর করতে ইচ্ছুক নয়"

"তুমি তো অন্তত গানের স্কুল খুলে কিছু পাচ্ছ"

"খুলেছি বটে, তেমন আর চলছে কই? গুটিকয়েক স্টুডেন্ট"

"তুমি প্যাকেজিংটা পাল্টাও। এবার পঞ্চকবি থেকে নবম কবি, কিংবা ওরকম কিছু একটা বার কর"

"নবম কবি পাব কোত্থেকে? যখন জন্মায়নি!"

"ইনভেন্ট কর। খুঁজে খুঁজে বার কর আর কোথায় কোন কবি আছে, যার কথায় গাওয়া যায়। তোমার তো নিজের গান কিছু নেই, যা দিয়ে বাজারে টিকে থাকবে"

শুনতে খারাপ লাগলেও কথাটা তো মিথ্যে নয়। এতদিন নেশার মতো পঞ্চকবি প্যাকেজটা ভালই চালাচ্ছিল। এমনিতেই বাজারের যা হাল, তাতে ওই সেকেলে অশ্রুমোচন আর কেউ নিতে চাইছে না। কদ্দিন আর এই নিয়ে চলবে। মনে পড়ে, বহুদিন আগে অরিজিৎদা বলেছিল 'নতুন কিছু কর'। তখনও ক্ষমতা ছিল, করতেই পারত। শোনেনি। ব্র্যান্ডিং-এর আশায় আর পাবলিসিটির নেশায় সেই উপদেশ বর্জন করেছিল। আজ কথাগুলো শেল হয়ে বিঁধছে। মানুষ যখন নাম, খ্যাতি, অর্থ, প্রতিপত্তির পেছনে ছোটে, সময় হয় না নিজেকে দেখার।

"ইনভেন্ট করার থাকলে কী আর অন্যদের গান গাইতাম? নিজের গান নিয়েই বাজারে নামতাম"

দুর্জয়ের মনে হল, আচমকা বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে সত্যি কথাগুলো বেরিয়ে এসেছে। বেশ বুঝতে পারছে, সেও একইভাবে স্খলনের পথ বেছে নিয়েছে, নিজেকে কাল্টিভেট না করে। তৈরি করার মতো কিছুই তো ছিল না। কিংবা থাকলেও, দেখার চেষ্টা করেনি। দেখতে চায়নি। বুঝতেই চায়নি।

"কিছু যদি মনে না কর, একটা কথা বলি। আমি তো কয়েকটা সিনেমায় ছোটখাটো রোল করেছি, কয়েকটা সিরিয়ালও। ভাবছি সিরিয়ালেই নেমে পড়ব। অন্তত কিছু করার তো থাকবে, ইনকামও হবে। আমার সঙ্গে সিরিয়ালে নামবে?"

চমকে উঠল ঋষিকা। কোন্নগর থেকে এত বছর ধরে কত চড়াই-উতরাই পার হয়ে, ঘর খুইয়ে, পেয়ে, আবার আধো হারিয়ে, এখানে পৌঁছেছে। এতদিনের সাধনা কী মাঠে মারা যাবে? শেষ পর্যন্ত সব ছেড়েছুড়ে সিরিয়াল! লাইমলাইটে থাকতে গেলে এছাড়া আর কোনও গতি নেই। গান অর ফান। অন্তত জনসমক্ষে থাকতে পারবে, কিছু রোজগারও হবে। এখন এছাড়া আর কী উপায়? জনমত, জনগণ, ছাড়া যে তার অস্তিত্বটাই টালমাটাল। কোনওদিনও যেটা খোঁজার চেষ্টা করেনি, ভাবতে শেখেনি।

“কথা বলে দেখ। কী রোল দেবে জানি না!”

“মা-মাসির কিছু একটা রোল জুটে যাবে। আমার ওপর ছেড়ে দাও। চিন্তা কর না”

দুর্জয় চলে যাওয়ার পর সোজা গাড়ি নিয়ে রূপজিতের ফ্ল্যাটে “হঠাৎ, এই সময়, না বলে?”

“তোমার ফ্ল্যাটে আসতে গেলে কি পাঁজিতে দিনক্ষণ দেখে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আসতে হবে?” ঝাঁঝিয়ে উঠল ঋষিকা।

“আমি কী তাই বলেছি?” বুঝতে পারছে ঋষিকার মুড অফ।

“আমাকে জড়িয়ে ধরে ভীষণভাবে আদর কর”

ঋষিকাকে জড়িয়ে মুখটা তুলে বলল “কী হয়েছে বল-তো?”

“তোমাকে বড় প্রয়োজন। আমাকে জড়িয়ে ধরে কাছে টেনে নাও। আরও... আরও... আরও... জোরে। শক্ত করে...”

বুঝতে অসুবিধা হল না, ঋষিকা একটা আশ্রয় খুঁজছে।

“বিয়ে না করলে সব ফাঁস করে দেব” শঙ্করীর চমকানিতে ঘাবড়ে গেল অঞ্জন।

সারা জীবন এত মহিলার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করেছে, বিয়ের প্রশ্ন তো আগে ওঠেনি। দু-দুবার বিয়ে করতে গিয়েও যখন হয়নি, বিয়ে নিয়ে আর মাথা ঘামায়নি। না করেই যদি সব পাওয়া যায়, তবে বিয়ে কেন? অনেক দায়। একজনের সঙ্গে লেগে থাকতে হবে। লাগাতে লাগাতে লাগানোটাই ধর্ম হয়ে গেছে। এই বুড়ো বয়েসে সেই ধর্ম ছেড়ে কি না ঘরসংসার করা! তাও আবার ঝিয়ের সঙ্গে! অধর্মের চূড়ান্ত। তবু ওর বাচ্চাটা যদি নিজের হত। এই উঠতি চৌবাচ্চা ঘরে তুলে হ্যাপা কে সামলাবে? শঙ্করী না হয় সিকিউরিটি খুঁজছে, অঞ্জনের সম্পত্তির ভাগীদারি। ঝি-এর কাছ থেকে আর বেশি কী আশা করা যায়?

“বিয়ে! হঠাৎ বিয়ে করব কেন? নয় তোমার সঙ্গে একটু ফুর্তিই করেছি। সে তো অনেক মেয়ের সঙ্গেই করে থাকি। নতুন কী?”

“সোজা বলে দিলাম, বিয়ে না করলে সব ফাঁস করে দেব”

বুঝতে পারছে না, কী ফাঁস করবে? কী যে ভীমরতি হয়েছিল ওর সঙ্গে... এমন তো অনেক দিন যায়, যেখানে কিছুই জোটে না। শোভনের ম্যাগনো ইন্ডিয়ার কত কর্মচারীকেই তো প্রপোস করেছে। সবাই তো আর রাজি হয়নি। সেদিনও তো অফিস শেষ হওয়ার পর অভ্যাস মতো দীপশিখাকে “আজ রাতে ফ্রি?”

“নাঃ। আর থাকলেও, আপনার মতো বুড়ো হাবড়ার সঙ্গে শোব কেন? আমার কি খরা পড়েছে? হাত নাড়লেই, অনেক ছোকারা লাফিয়ে উঠবে। এই চেহারায় ওদের দাঁড় করাতে বেশি সময় লাগবে না” দীপশিখার তির্যক উত্তর।

রাগে, দুঃখে গা ঘিনঘিন করেছিল। এত বড় অপমান! ওদের বস আর অফিসের অন্যান্য স্টাফরা কত সম্মান করে, ও কি ভুলে গেছে? সে তো আর যে সে লোক নয়, অঞ্জন স্যার! তাকে ছাড়া শোভনও অসহায়। তাকেই কি না প্রত্যখ্যান? জিজ্ঞেস করে দেখুক না ইমাকে। মোটেই সে হাল-দাঁড়হীন নৌকো নয়। ইমা প্রেগন্যান্ট হওয়ার পর নিশ্চয়ই তাকে ঢোঁড়া সাপ বলবে না। অপমানে, রাগে ফুঁসছে। তাকে ছোকরাদের সঙ্গে তুলনা! এত বড় সাহস!

শঙ্করী তখন সবে অফিসের বাবু-দিদিমণিদের কাপ-প্লেটগুলো গুছিয়ে কিচেনে নেওয়ার উদ্যোগ করছে। সোজা শঙ্করীর কাছে গিয়ে বলল "আজ রাতে আমার বাড়িতে থাকবে?"

অঞ্জনের গুণ শঙ্করীর জানা। তবে তার মতো কাউকে ডাকবে, ভাবতেও পারেনি। ভয় করছে, না বললে যদি বাবুকে বলে দেয়, চাকরিটাই যাবে। এই বাজারে চাকরি গেলে মেয়ে নিয়ে কোথায় দাঁড়াবে? স্বামী ছেড়ে যাওয়ার পর, একাই সংসার টানছে, মেয়েকে বড় করছে। কতদিন হল কোনও পুরুষের সঙ্গ পায়নি। তারও তো চাহিদা আছে, সাধ, আহ্লাদ আছে। অঞ্জন-বাবু বলে কথা। খুশি করতে পারলে বকসিসও মিলে যেতে পারে। দিনকাল যা পড়েছে।

"কাজগুলো শেষ করে নিই"

"গাড়িতে অপেক্ষা করছি, অফিসের বাইরে, পাশের গলিতে। হয়ে গেলে চলে এস। কতক্ষণ লাগবে?"

"এই আধ ঘণ্টা"

অঞ্জনের ভজন ব্যঞ্জনা রসপূর্ণভাবে শেষ করে ভাবল, একটু বকশিস নিয়েই বা খালাস হবে কেন? আনন্দ দিয়েছে, আনন্দ নিয়েছে। এই আনন্দর রেশটাকে যদি ধরে রাখা যায়, মন্দ কী? কাঞ্চন, সুখভোগ, রসস্রাব শুধু নয়, সঙ্গে স্থায়ী আচ্ছাদন হলে মায়ে-ঝিয়ের পাকাপাকি হিল্লে যাবে। মেয়ে বড় হচ্ছে। ওর জন্য গুছিয়ে রেখে যেতে হবে, বৈকি। তাই বিয়ে।

বেগতিক দেখে অঞ্জন শোভনকে কথাটা পাড়ল। হাজার হোক মনিব বলে কথা। তার কথা অমান্য করলেও, মনিবের কথা অত সহজে টালতে পারবে না। শোভন ইতস্তত করছিল। মালিক হয়ে নিম্নতম কর্মচারীকে কী করে বলে, অঞ্জনদাকে ছেড়ে দিতে। যখন বলেছে, কিছু তো করতেই হয় "টাকা নিয়ে ব্যাপারটা ভুলে যাও"

"না বাবু, আমি পোয়াতি। আমার ইজ্জতের কি কোনও দাম নেই?" শঙ্করী নাছোড়বান্দা।

"বিয়ে ছাড়া আর কী করলে ছাড়বে?"

"মেয়েমানুষের ইজ্জত। তাহে কী টাকা দিয়ে কিনবে? না বাবু, বিয়ে করতেই হবে বলে দিলুম"

মহা ফ্যাসাদ। অঞ্জন বুঝে উঠতে পারছে না কি করে ঘাড় থেকে নামাবে। সে যে ঝি-এর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করেছে, বাজারে রটলে মহা ফ্যাসাদ। এতদিনের সাজানো বাগান পুড়ে ছাই।

শোভন হেসে বলল "বিয়ে করে নাও। বয়েস তো হয়েছে। এই বয়েসে ফ্রি দেখাশোনা রান্নাবান্না করার লোক পাবে"

"তা বলে ঝি?"

"মডার্ন বউদের চেয়ে ঝি-রাই ঘরের কাজ ভাল করে" শোভন মুচকি হাসছে।

হাফ-টাক চুলকিয়ে বলল "শেষ পর্যন্ত দেখছি করতেই হবে"

"করলেই ভাল। অসুখে বিসুখে সেবা শুশ্রূষা করতে পারবে। ওর মেয়েটাও তো সোমত্ত। অফ টাইমে ফুর্তিও দেবে। হে... হে... হে..."

"আমি কিনা ঝামেলায় মরছি, আর তুমি হাসছ?"

"ঈশ্বর যা করেন, মঙ্গলের জন্যেই করেন"

ঈশ্বরের আশীর্বাদ হয়ে, মায়ে-ঝিয়ে অঞ্জনের নাকতলার বাড়ি আলোকিত করল।

ডাঃ দেবাশিস রায়ের দিকে তাকিয়ে শুভ্রজিৎ বলল "আমার কী হয়েছে বলুন তো? কিছুই ভাল লাগছে না"

"ডিপ্রেশন। অ্যাকিউট ডিপ্রেশন অ্যান্ড আইডেন্টিটি ক্রাইসিস"

"আগে তো কখনও ছিল না"

"আগে তো সাকসেস ছিল, সমর্পিতা ছিল, সামনে ভবিষ্যৎ ছিল। এখন ওগুলো নেই। আপনি তো এ লাইনে অনেকদিন আছেন। একদিন গ্ল্যামার থাকবে না, এটা আপনি জানেন না?"

"জানা এক জিনিস আর বাস্তবে ফেস করা আরেক। বোধহয় ফেস করতেই অসুবিধা হচ্ছে"

সিনিয়ার সাইক্যাট্রিস্ট ডাঃ দেবাশিস রায় ভারী ফ্রেমের ফাঁক দিয়ে শুভ্রজিৎকে দেখল। জীবনে তো কম সেলিব্রিটি হ্যান্ডেল করে তাদের আবার সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে দেয়নি। হতে পারে এক নম্বর হিরো। কিন্তু দেবাশিসের কাছে শুধুই পেশেন্ট, অ্যানাদার ওয়ান।

"ভারচুয়ালিটি যখন রিয়ালিটিতে নেমে আসে, তখনই প্রবলেম। সো কমন উইথ দ্য সো-বিজ। অবশ্য অন্যরা আপনার থেকে আলাদা। তাদের সাকসেসটা আপনার মতো লং-ড্রন নয়। তাই অনেক তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসতে পারে। আপনি যেহেতু অনেকদিন ধরে পিকে ছিলেন, স্টারডমটা আপনার কাছে অনেকটা কম্পালসিভ অবসেশনের মতো - না পারছেন ধরে রাখতে, না পারছেন ছেড়ে বেরতে। ইট মে বি এ হোয়াইল টু গেট ওভার, বাট নট ইম্পসিবল"

"কতদিন?"

"থ্রি টু সিক্স মান্থস। ইট ইজ কলড অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার। আপনি একা নন - পল গ্যাসকয়েন, হ্যারিসন ফোর্ড, এমিলি লয়েড, মিচেল ফাইফার, উইওনা রাইডার, অনেকেই এই অবসেশনে ভুগেছেন। অফ কোর্স ইচ কেস ইজ ডিফারেন্ট"

"সব সময়ই তো স্টারডমের পিকে থেকেছি একমাত্র আর্লি ফেজে কয়েকটা বছর বাদে। ইট হ্যাস বিকাম এ পার্ট অ্যান্ড পার্সেল অফ মাই লাইফ। হঠাৎ সব কিছু খালি..."

"এই ভয়েডকে ফিল করতে কোনও হবি?"

"নাঃ, সেরকম কিছু নেই"

"বই পড়া?"

"সেগুলো আর হয়ে ওঠেনি। তিনটে সিফটে কাজ করে যখন বাড়ি ফিরতাম, আই ওয়াজ এক্সহসটেড। কিছু যে করব, এনার্জিও ছিল না"

"তাই অবসেশন, বারবার ওই গ্ল্যামারে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা। গ্ল্যামার তো আর্টিফিশিয়াল মেক-বিলিভ ওয়ার্ল্ড। অন্যদের তৈরি করা, আনরিয়ালিটি। এই ডেলিউশন থেকে বেরিয়ে আসার একটাই উপায় - ভুলে যেতে হবে আপনি কী ছিলেন। রিয়ালিটিতে দাঁড়িয়ে শুধু মানুষ হিসেবে জীবন কাটাতে হবে। জাস্ট লাইক এনি আদার কমনার"

"ভারচুয়ালিটি বলুন আর ডেলিউশন বলুন, এ ছাড়া তো আমার আর কোনও দুনিয়াই নেই"

“স্ত্রী চলে গিয়েই ব্যাপারটা আরও বেশি প্রমিনেন্ট হয়ে উঠেছে। আসলে আপনি নিজেকে দেখতেই শেখেননি”

“তার মানে?”

“অন্যের চোখ দিয়ে নিজেকে দেখার চেষ্টা করেছেন, মেক-বিলিভ ওয়ার্ল্ডের চশমা পরে। অন্যরা যে ভাবে আপনাকে এতদিন দেখতে শিখিয়েছে”

“তিরিশটা বছর তো এভাবেই দেখেতে শিখেছি। এখন কি আবার নতুন করে দেখা সম্ভব?”

“কেন নয়? নো এজ ইজ আউট অফ বাউন্ডস অফ রিঅ্যাসেসিং সেলফ। আমরা সকলেই করে থাকি। উইথ ম্যাচিওরিটি, আওয়ার পারসেপশনস চেঞ্জেস”

তাহলে কী শুভ্রজিৎ এখনও ম্যাচিওরড হয়নি? ভীষণ অসহায় লাগছে। যে বাঁ আঙুলে এতদিন ধরে টলিউড ইন্ডাস্ট্রির ওপর ছড়ি ঘুরিয়েছে, ম্যাচিওরড না হলে কি তা সম্ভব ছিল? ডাঃ রায় কোথাও ভুল করছেন না তো? ভেতরের অঙ্কগুলো জানেন না বলেই হয়ত অন্য পারস্পেক্টিভে দেখার চেষ্টা করছেন।

“আর ইউ সিওর ডাঃ রায়?”

“পসিটিভ। এটাই আমার প্রফেশন, এটা করেই খাই। কিছু ওষুধ লিখে দিচ্ছি। টাইম মতো খাবেন। আর প্রতি ফর্টনাইটে আমার সঙ্গে দেখা করে যাবেন। অ্যাট লিস্ট ফর ফার্স্ট থ্রি মান্থস”

চেম্বার থেকে বেরিয়ে এল। সব কিছু মেনে নিতে না পারলেও, কাউকে তো বিশ্বাস করতে হবে। এখন ডাঃ রায় ছাড়া তার জীবনে কে আছে? উনি তো আশ্বাস দিয়েছেন সব ঠিক হয়ে যাবে। শুধু সমর্পিতাই নয়, অনুশ্রীর জন্যেও তো সেভাবে টাইম দেয়নি। কেরিয়ারের ইন্টক্সিকেশনে বিয়ে করেও ঘর চিরকালই সেকেন্ডারি থেকে গেছে। হয়ত টাইম দিলে তিন-তিনবার এভাবে বিয়ে ভাঙত না। ইট ইজ টু লেট নাউ। এখনও কোথাও গিয়ে দাঁড়ালে মিডিয়ার ফ্ল্যাশ তার ওপর পড়ে। ডে-নেক্সট কভার স্টোরি হয়ে যায়। কতটা তাকে লাইমলাইটে রাখার জন্য, আর কতটা মিডিয়ার টিকে থাকার, এখন আরও বেশি প্রকট। যখন রোশনাই নিভে যায়, ঘরে ফিরে নিরালা নিঝুম অন্ধকার। তার পাশে কোনও বনলতা সেন নেই। প্রাচুর্যের মধ্যেও বিশাল একটা ভয়েড তাকে জায়েন্ট শার্কের মতো গিলে ফেলে। সেখানে স্টুডিওর প্রখর আলো নেই। ফ্ল্যাশের ঝলকানি নেই। ফ্যান আর ফলোয়ারের উন্মাদনা নেই। ক্ল্যাপ থেকে ক্ল্যাপস্টিক... কিছুই নেই। রিদম মেলাবার জন্য মিউজিকের বিট নেই... সকালে ড্রেসিং রুমে ঢুকে মেক-আপের ব্যস্ততা… সব হারিয়ে গেছে... এখন মনে হচ্ছে ডাঃ রায় হয়ত ঠিকই বলছিলেন। এখন আবার সময় হয়েছে নিজেকে নতুন করে কাছ থেকে দেখার।

একত্রিশ

একটা অস্কার অ্যাওয়ার্ড!

ডলবি থিয়েটারের রেড কার্পেটের ওপর স্টেজে যাওয়ার সময় যখন হাজার ফ্ল্যাশ ঝিলিক দিচ্ছিল, যখন দুনিয়ার সব চ্যানেলের ক্যামেরা ক্লোজ আপে তাকে ধরার চেষ্টা করছিল, সেই মুহূর্তে মনে হচ্ছিল, স্বপ্নে দেখা ধ্রুবতারাটা লস এঞ্জেলসের এই আসরে নেমে এসে তার ওপর অদেখা ম্যাজিক ওয়ান্ড বুলিয়ে দিচ্ছে।

মুম্বাইতে থাকাকালীন মার্ক ফোনে জানিয়েছিল "আই হ্যাভ এ নিউজ ফর ইউ। বিফর দ্যট বি সিওর টু ব্রিং এ বটল অফ ক্রুগ ক্লস ডি' অ্যাম্বনায় উইথ ইউ হোয়েন ইউ কাম টু এলএ। দো আই উড হ্যাভ প্রেফারড গাউট ডি ডায়মন্টস, আই নো ইউ ক্যান্ট অ্যাফরড ইট। ইট কস্ট, ওনলি টু-মিলিয়ন ডলারস" ওপাশ থেকে হাসছে। দেওয়ালি মার্কের ভাষা বুঝতে পারছে না। কী সব নাম বলছে! বাপের জন্মে শোনেনি।

"হোয়াট আর দোস?"

"স্যাম্পেনস। এক্সপেন্সিভ স্যাম্পেনস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। ক্রুগ ক্লস ডি' অ্যাম্বনায় ইজ নট দ্যট এক্সপেন্সিভ। ওনলি ২৫০০ ডলারস। আই অ্যাম সিওর ইউ ক্যান অ্যাফরড দ্যট"

"ইজ ইট সামথিং স্পেশাল দ্যট উই শুড সেলিব্রেট?"

"ইউ উইল জাস্ট জাম্প। বিফর আই ডিসক্লোজ, প্রমিস টু গেট মি এ বটল"

"এনিথিং ফর ইউ মার্ক। হোয়াটস দ্য রিজয়সিং ফ্যাক্টর?"

"ইউ হ্যাভ বিন নমিনেটেড ফর দ্য বেস্ট সাপোর্টিং অ্যাক্ট্রেস ফর ইওর রোল ইন ফালক্রাম"

"ইউ মাস্ট বি জোকিং। ইউ আর আউট অফ ইওর মাইন্ড। আর ইউ রানিং হাই রাইট নাউ?"

"নাইদার অ্যাম আই জোকিং, নর অ্যাম আই আউট অফ মাই মাইন্ড। ইট ইজ ট্রু। গেট রেডি টু ফ্লাই টু এলএ, আফটার এ মান্থ। আই বিলিভ দ্য সেরিমনি উড বি হেল্ড অ্যাট ডলবি থিয়েটার"

দেওয়ালি বিশ্বাস করতে পারছে না, কলকাতার মতো ছোট্ট শহর থেকে আসা একটি বাঙালি মেয়ে, কোনও ব্যাকিং ছাড়াই, কোথাও একটা জায়গা করে নিতে পেরেছে। একে ভাগ্য ছাড়া আর কী বলা যায়? মার্কের সঙ্গে যোগাযোগটা ঠিক যেভাবে ভাগ্যই করিয়ে দিয়েছিল। ফালক্রামে ইন্দ্রাক্ষি চরিত্রটা ডিফিকাল্ট ছিল। অন্য ধাঁচে খুনের গল্প, প্রথাগত ডিটেকটিভ কাহিনি থেকে আলাদা। দেশি ও বিদেশি চিরায়িত গত ভেঙে এই গল্পের খুনগুলো সাইন্টিফিক। অনেক চরিত্রের মধ্যে, ইন্দ্রাক্ষি চরিত্রটারও অনেক ব্যঞ্জনা ছিল। বিশেষ করে একজন মডার্ন ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হয়েও যখন ক্রনিক অবসেসিভ সাইকোসিস ডিসঅর্ডারের রোগী। দেওয়ালি বেশ কয়েকজন সাইকিয়াট্রিস্ট-এর সঙ্গে দেখা করেছিল, চরিত্রটাকে বোঝার জন্য। মানসিক রোগী হলেও নতুন আঙ্গিক আছে চরিত্রটির মধ্যে।

এমনিতে আজকাল খুব একটা বই পড়ে না। তবুও ইন্দ্রাক্ষি চরিত্রটিকে বুঝতে, তাকে প্লেটোর দর্শনের কিছু অংশও বুঝতে হয়েছে। দিনের পর দিন তালিম, আয়নার সামনে নিজেকে বারবার তৈরি করা, শটের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত। যদিও পারসুইটের মতো বক্স অফিসে অত হিট করেনি, ব্যাবসা ভালই করেছিল।

পারসুইট যতটা ফাস্ট পেসড, এই গল্পটা অনেক বেশি অ্যানালিটিক্যাল। সেদিকে দিয়ে অভিনয় দেখানোর সুযোগও পারসুইটের থেকে অনেক বেশি।

"ইফ হোয়াট ইউ সে ইজ ট্রু, সিওরলি আই ও ইউ এ বটল"

"ক্রুগ ক্লস... আই উইল কিপ ইউ ইনফরমড"

এলএ ম্যরিয়টের সুইটে বসে আরেকটা স্যম্পেনের অর্ডার দিল। যদিও পোস্ট অ্যাওয়ার্ড ব্যাঙ্কয়েটে খেয়েছে, সেটা নেহাতই সৌজন্যমূলক। নমিনেশন পাওয়া এক জিনিস, আর সাপোর্টিং রোলে অস্কার পাওয়া অন্য। উত্তেজনায় ভালভাবে কিছু খেতেও পারেনি। একজন এশিয়ান হয়ে রেড কার্পেটে হেঁটে, ডায়াসে উঠে অস্কার নিয়ে আসা? ভাবতেই পারেনি। সব কিছুই আবছা। মনেই পড়ছে না, দু-একটা কথা বলেছিল মাইক হাতে। বাকি সেরিমনিটা চুপচাপ বসে থাকলেও, ঠিক ফলো করতে পারেনি। ভেতরে ভেতরে কেঁপেছে, মুখে কম্পসড ভাব রেখে, পুরো অনুষ্ঠানটাই কাটিয়ে দিল। যে ড্রেসটা পরেছিল, সেটা কোনও নামি ডিসাইনারের নয়, কলকাতার অনামিত্রাদির। মার্কের কাছ থেকে খবর পাওয়ার পর কলকাতায় গেলেও, কাউকে জানায়নি খবরটা। অনামিত্রাদিকেও নয়। পালিত স্ট্রিটে গিয়ে শুধু বলেছিল "একটা এক্সকুইজিট ডিসাইনার ড্রেস করে দিতে পারবে?"

"কীসের জন্য?"

"হলিউডের একটা পার্টির জন্য। টিপিক্যালি ইন্ডিয়ান। হোয়ার আই স্ট্যান্ড আউট অ্যামং দ্য ফরেনার্স"

অনামিত্রার বুঝতে অসুবিধা হয়নি, দেওয়ালি কী চাইছে। র সিল্ক, ক্রিমের ওপর লাল ডোরাকাটা স্লিভলেস বডি হাগিং গাউন। ওপরের অংশের লাল ডোরাগুলো ব্রায়ের সাপোর্টের মতো সেমিসারকেল করছে ওপরের দিকে। কোমরের কাছে ল্যাটার্যালি সেন্ট্রিফিউগ্যালি বাইরের দিকে ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে। পিউবিক রিজিয়নে ওভাল লাল প্যাচ। কুচকি থেকে হাঁটু অবধি লাল প্যাচগুলো ক্রিস-ক্রস, অনেকটা মৎস্যকন্যার মতো। হাঁটুর নীচে কিছু স্ট্রিক্স থাকলেও, মেইনলি ক্রিম রঙের আফটার টেল হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। এক্সকুইজিট!

বেশ কয়েকবার ট্রায়ল অ্যান্ড মডিফিকেশনের পর ফাইন্যাল ট্রায়েলের সময় অনামিত্রা বলল "করে তো দিলাম। ভাল কি মন্দ লোকে বলবে। এটা পরে চলতে পারবে তো?"

স্টুডিওতে বেশ কয়েকবার পায়চারি করে বলল "ঠিকই তো মনে হচ্ছে"

"যদি অসুবিধা হয়, টেলটা আরেকটু ছোট করে দিচ্ছি। দেখ, আবার হোঁচট খেয়ে পড়ো না"

"এখন ঠিকই লাগছে। কয়েকবার হেঁটে প্র্যাকটিস করে নিই"

সেই ডিসাইনার ড্রেসে দেওয়ালি। পোস্ট অ্যাওয়ার্ড ব্যাঙ্কয়েটে স্বচ্ছন্দভাবে হেঁটে চলে অন্যান্যদের কংগ্র্যাচুলেশন নিয়ে মৃদু হাঁসির প্রলেপ মেখে ঘুরে বেরিয়েছে। স্যম্পেনের গ্লাস হাতে প্রশ্নের জবাব দিয়েছে। শ্যামলা মুখে স্মিত হেসে লস এঞ্জেলেসের অ্যাওয়ার্ড সেরিমনি নির্বিঘ্নে উতরে, হোটেলের সুইটে ফিরেছে। ড্রেসটা সযত্নে ওয়ার্ডরবে রেখে অস্কারটা বুকে আগলে নিঃশব্দ ঘরে একাকী উপভোগ করেছে। কত দিনের স্বপ্ন, কত দিনের সাধনা, কত দেওয়া-নেওয়ার পালা... শেষমেশ কনভারজ করল অস্কার।

"ম্যাম, হিয়ার ইজ ইওর স্যম্পেন"

"অন দ্য লাউঞ্জ টেবল প্লিজ"

টিপস গুঁজে রুম সার্ভিস বেরিয়ে গেল। দেওয়ালি আধো অন্ধকারে স্যাম্পেনের কর্ক খুলে ফ্লুটে ঢালল। কপালে ফ্লুটটা ঠেকিয়ে, টোস্ট অফার করল, টু হার মাদার লাক 'চিয়ার্স'। হার ওউন সেলিব্রেশন ইন সলিচুড। এ রেস্টিটিউট অ্যাট রিজয়সিং হার ভিক্টরি ইন হার ওউন ওয়ে।

অনেকটা পথ পার হয়ে এসেছে। লরেটো বউবাজার থেকে সায়েন্স কলেজ হয়ে লস এঞ্জেলস। ভৌগলিক দূরত্ব খুব বেশি না হলেও, মানসিক পরিধি অনেকটা। মাঝে ধ্রুবতারার রং পাল্টে গেছে, দিকটাও। স্ট্যাটিক? ওই তারাটা কী তবে এলিউসিভ? অ্যাস্ট্রনমারদের কাছেও আধো চেনা...

অন্যদের কথা বলতে পারবে না। কিন্তু নিজের ক্ষেত্রে তো তাই। ধ্রুবতারার ঠিকনাটা বারবার পাল্টেছে। হাতে স্যাম্পেনের ফ্লুট, বুকে অস্কার আগলে ভাবছে, এটাই কী তার আল্টিমেট? তাই যদি হয়, এত আনন্দের মধ্যে, বিষাদ কেন? তারার সাজে সেজে, তারাকে কাছে পেয়ে, বুকে আগলেও, কোথায় যেন একটা শূন্যতা। দোলাচলে স্যাম্পেনের বোতলটা যখন প্রায় নিঃশেষ, তখন বিছানায় শুয়ে ঘুম। তখন একটাই স্বপ্ন, যা তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে তাকে, তার অবচেতনের অলিন্দে।

বসুন্ধরার ছবিটা তাকে নতুন চেতনায় দীক্ষিত করছে। স্বপ্নে দেখা ওই তপ্ত অগ্নিপিণ্ড থেকে প্রমিথিয়াসের মতো তাকেও তুলে আনতে হবে একমুঠো আগুন। তুলে দিতে হবে আগামী প্রজন্মের হাতে। তাতে যদি তাকে ঝিয়াসের রোষে পড়ে উচ্ছিষ্ট হতে হয়, ক্ষতি নেই। তবুও এটাই হবে। অস্কার বুকে নিয়ে, মসগুল হওয়ার জন্যে ঈশ্বর তাকে বরমাল্য পরায়নি।

তার মধ্যেই... তার স্বপ্নের সমাধি, তার অবচেতনের পূর্ণতা, তার নিজেকে পাওয়ার পরিতৃপ্তি। সেই তো প্রমিথিয়াস, সেই তো ভিক্টরের ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন, সেই তো আগামীর স্ফুলিঙ্গ। চেতনায় আলোড়ন। স্বপ্ন তো আগামীর কল্পনায় গাঁথা ছবি। সেখানেই বসুন্ধরার ভাবনার স্ফুলিঙ্গ নতুন রূপ পাবে।

প্রমিথিয়াস মিথ থেকে আবার বাস্তবে...

বোতলটা নিয়ে বাকি স্যাম্পেনটুকু ফ্লুটে ঢালল। এতদিন ধরে ভাবছিল, গন্তব্যে পৌঁছনোর সার্থকতা কোথায়? এখন বুঝতে পারছে, হয়ত ঠিক বোঝেনি। এই চেতনার মধ্যে সে বুঝে নিল অজানা, অচেনা, এক অপূর্ণতাকে। যে তাকে ডাকছে নতুন সাজে। আভরণ, মাদকতা ভুলে, নতুন ছন্দে, ফ্লিটিং হরাইজনের সীমান্ত পেরিয়ে যেতে হবে জাগতিক চাওয়া-পাওয়ার বাইরে। অস্কারের উন্মাদনায়, স্যাম্পেনের ফ্লুটে নয়... গড হ্যাস এন্ট্রাস্টেড হার উইথ এ ডেস্টিনি। দ্যট ইজ হার ফিউচার ফর হুইচ সি ওয়াজ বর্ন টু সার্ভ হিউম্যানিটি লাইক প্রমিথিয়াস। সি হ্যাস বিন এন্ডাউড উইথ ডিভাইন লাইট টু টিউন দ্য মাস্টার ক্যাডেন্স অফ টুমরো। নট ইন পেটি অ্যাওয়ার্ডস অ্যান্ড অ্যাপ্লসেস। সি হ্যাজ বিন বর্ন উইথ এ মোটিভ অফ গড। অ্যান্ড ইট ইজ হার ডিউটি টু ফিল হার অব্লিগেশন টু হার ক্রিয়েটর। দ্য অস্কার ইজ এ টেম্পরারি গিফট ফ্রম হার গডমাদার টু কয়েঞ্চ হার মেটিরিয়াল লাস্ট। দেয়ার ইজ এ লাইফ বিয়ন্ড মেটিরিয়াল পারসুইটস। হার পারসুইট, নট দ্য হলিউড ফ্লিক দ্যট সেলস...

"কংগ্রাটস। হ্যাভ আই কট ইউ অ্যাট দ্য রং হাওয়ার?" বসুন্ধরা, বহুদূর দেশ থেকে।

"নট অ্যাট অল। ইন ফ্যাক্ট আই হ্যাড জাস্ট ওকেন আপ উইথ এ নিউ ড্রিম অ্যাকিন টু ইওর মুভি"

"দ্যাটস এ কমপ্লিমেন্ট ইন্ডিড। মাই মুভিস হ্যাভ নাউ কাম ইন ইওর ড্রিমস টু" বসুন্ধরা হাসছে।

কানিলিঙ্গাস-এর সিন দিয়ে, যার হাত ধরে বিদেশি মার্কেটে প্রবেশ, তারই নতুন ছবি স্ফুলিঙ্গ অবচেতনে অন্য মন্ত্রে দীক্ষিত করেছে। মন্ত্রটা এখন নিজস্ব ক্ষুদ্র গণ্ডির সীমা উত্তীর্ণ করে বৃহত্তর ব্যাপ্তিতে। ফালক্রামে ইন্দ্রাক্ষি চরিত্রের ব্যঞ্জনা, যেখানে প্লেটোর দর্শনের ছোঁয়ায় অন্য মাত্রা পেয়েছে।

"সিওরলি ইউ আর কামিং ফর আওয়ার ক্যালকাটা প্রিমিয়র"

"হোয়েন ইজ দ্যট?"

"নেক্সট মান্থ, অন ফ্রাইডে দ্য থারটিন্থ"

"আর ইউ প্রেপিং ফর এ হ্যালোউইন স্কেয়ার?"

"নট কোয়াইট। থার্টিন ইজ সাপোজড টু বি এ লাকি নাম্বার, দো ইট হ্যাস বিন রংলি প্রিচড অ্যাস অ্যান আনলাকি ওয়ান"

"হোয়ার ডিড ইউ গেট দ্যট ইনফরমেশন?"

"ইফ ইউ রিড অ্যাবাউট স্যাটার্ন, ইউ উইল কাম টু নো। স্যাটার্ন ইজ দ্য গেটওয়ে টু হেভেন বিয়ন্ড মেটিরিয়্যাল রেল্মস"

"সিওর আই উড বি দেয়ার"

বসুন্ধরা ফোন কাটার পর দেওয়ালি ওর কথাগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। লোকটা প্রচুর পড়াশোনা করে। মেটিরিয়াল গণ্ডির তো একটা সীমা আছে। ওটা টপকাতে পারলেই, আরেক দুনিয়া, অসীম। সেখানেই সাফল্যের পুরস্কার। অস্কারের ঊর্ধ্বে।

এবার তাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার পালা।

বত্রিশ

“আমার মজুরি আরও দু-লাখ বাড়াতে হবে” সৈকত ধূর্জটির উল্টো দিকের চেয়ারে বসে ঘোষণা করল।

“আরও দু লাখ?! অন্যান্য চ্যানেলের সিইওদের থেকে তোমায় তো অনেক বেশি দিচ্ছি। এর পরেও?”

“জিনিসপত্রের দাম যা বেড়েছে, কুলিয়ে উঠতে পারছি না”

“এমনিতেই চ্যানেল ভাল চলছে না। অনেক স্টাফের ডিউসও ঘাড়ে। এই সময় বাড়ালে তো টোটাল লসে রান করব”

“তুমি আর চ্যানেল চালাচ্ছ কোথায়? চালাচ্ছি তো আমি। তুমি খালি ইনভেস্ট করেই খালাস। তাও যদি পুরো চ্যানেলটা কেনার ক্ষমতা থাকত। ২০% স্টেক ধরে ছড়ি ঘুরিয়ে যাচ্ছ” সৈকতের কথাগুলো মোটেই ভাল লাগছিল না। এভাবে তো সৈকত কথা বলে না। আজ হলটা কী? হঠাৎ এমন দাবি কেন?

“চা না কফি?”

“কফি। ব্ল্যাক, চিনি ছাড়া”

ধূর্জটির একটুও ভাল লাগছে না, কিন্তু কিছুই করার নেই। চ্যানেলের মালিক হয়েও সৈকত ছাড়া চালাতে অপারগ। কম্পিউটারের ব্যাবসাটা যদিও বা একটু রপ্ত করেছিল, চ্যানেলটা তরুণের বুদ্ধিতেই কিনেছিল। বিপাক বুঝে সে-ও হাত গোটাল। এখন মালিক হয়েও একা চ্যানেল টানার ক্ষমতা নেই। অবশ্যই ৮০% স্টেক হোল্ডার চ্যানেল এক্সকে ডেকে আনতে পারে। তাহলে তো পুরপুরি সাইড-লাইন্ড হয়ে যাবে। নিজের কোনও সে থাকবে না। নামেই শেয়ার হোল্ডার। বেগরবাই করলে ২০% স্টেকও ওরা কিনে নেবে। মনে মনে ব্যালেন্স করছিল, হুইচ ইজ লেসার অফ দ্য টু ইভিলস।

“আরও টিআরপি বাড়াও, অ্যাড থেকেও কিছু আসুক। তারপর ভেবে দেখা যাবে”

“কোত্থেকে টাকা তুলব? যে ভাবে চিটফান্ড নিয়ে ছানবিন শুরু করেছে, সব স্পন্সরশিপ বন্ধ। বাজারে কোনও টাকা নেই। যেটুকু আছে, বড়বাজার খেয়ে নিচ্ছে। ওদের অরগ্যানাইজেশন অনেক স্টেডি, অনেক বেশি ডাইভারসিটি। ওখানে স্পন্সর করলে বেশি মাইলেজ পাওয়া যায়, অ্যাডের লোকেরা ভালই জানে”

“তুমিই যখন স্বীকার করছ, বাজার মন্দা, এই অবস্থায় কী হিসেবে মাইনে বাড়াতে বলছ?”

“আমার হিসেবটা তো আমাকেই দেখতে হবে। আর কে দেখবে?” সৈকত নাছোড়বান্দা।

“নাও, কফি খাও। পরে পয়সার কথা হবে”

“পরে নয়, এখনই”

মহা মুস্কিল। কিছুতেই ঘাড় থেকে নামাতে পারছে না “থাক না। পরে এ ব্যাপারে কথা হবে”

“না এখনই” সৈকত দৃঢ়ভাবে বলল “হ্যাঁ বলে কাগজ এখনই সই করে না দিলে, তোমার ভিডিওগুলো ফাঁস করে দেব। ভুলে যেও না, ওগুলো এখনও আমার কাছে”

কেউ না জানলেও ধূর্জটি খুব ভালই জানে, ওগুলো সৈকত সযত্নে আগলে রেখেছে। যদিও কোনওদিন কিছু বলেনি। খুব ভালই জানে, ওই ভিডিওগুলোতে কী আছে। তাকে শ্রীঘরে পাঠানোর পক্ষে কাফি। সময় বুঝে দুধকলা দিয়ে পোষা সাপ ফণা তুলে হিসহিস করছে। শুধু ছোবলটাই বাকি। মারলে বাংলা টিভি

কোথায় যাবে, আর সৈকত কোথায় দাঁড়াবে। তবে নিজে যে ফাঁসবে, সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই। সৈকত ধোয়া তুলসীপাতা নয়, ভাল করেই জানা। তবে সাপের বাচ্চা যে আচমকা এমন ফোঁস করে উঠবে, ভাবতেও পারেনি!

"ফাঁস করলে তোমার কী ফয়দা হবে? তোমার সিনেমা করার বারোটা বাজবে, চ্যানেলটাও ডুববে। তখন চ্যানেল এক্স কব্জা করে তোমার পেছনে তিন লাথি মারবে"

"আমি এতদিন মিডিয়াতে আছি। না হয় তোমার মতো টাকা তোলার ক্যালি নেই। কিন্তু খেলাটা তোমার থেকে বেশি জানি"

সৈকত নাছোড়বান্দা দেখে ধূর্জটি বলল "বেশ। আজকের দিনটা সময় দাও। অ্যাকাউন্টসগুলো একবার দেখে নিই"

"শুধু আজকের দিন। কালকে ডেফিনাইট উত্তর চাই, হ্যাঁ"

"আরে ইয়ে ফিল্মকে ধান্দা কুছ ঠিক নেহি চল রহে হ্যায়। এক কে বাদ এক ফ্লপ। পাবলিসিটি দে কর ভি ফায়দা নেহি আ রহা হ্যায়। ইয়ে চামুণ্ডেশ্বরী তো বেওসা কে লিয়ে কিয়া থা" গজেন্দ্রর হো চি মিন সরণির ফ্ল্যাটে মনিকান্ত মোহতার আক্ষেপ।

"তো কেয়া করে? বন্দ কর দে?"

"ঔর কেয়া করনে কা? হমে তো ধন্দে মে কামানা হ্যায়। দুসরে ধন্দে সে মুনাফা হোনে সে ভি ইয়ে ফিল্ম বিজনেস মে অব কোই ফায়দা নেহি। লোগ হল মে-ই নেহি যাতা। উসদিন হম ব্যাল্যান্স সিট দেখ রহা থা। লস হি লস। লাস্ট দো বরস মে কুছ ভি প্রফিট নেহি। পার্টি লাগাও, মিডিয়া কো খিলাও, অচ্ছে রিভিউ লিখনে মে। বস, লস হি লস"

"সয়েদ তামিল রিমেক ছোড় কর নই স্টোরি লে তো কুছ ফায়দা হোগা..." গজেন্দ্র বোঝাবার চেষ্টা করল "বিজিত তো নই স্টোরি লে কর কুছ করনে কা কোশিশ কর রহা হ্যায়"

"নই স্টোরি কাঁহা? দুসরে লোগ তামিল সে লেতা। ঔর ওহ অংরেজি স্টোরি পাঞ্চ করকে বাজার মে ছোড়তা। ফির ভি লাস্ট পিকচার ভি তো ফ্লপ হুয়া। সিরিফ বড়ে বড়ে ইন্টেলেকচুয়াল বাত হি বাত। আরে হামলোগ ইহা ধন্দা করনে আয়া। ইন্টেলেকচুয়ালিজম বেচনে নেহি"

"তো চামুণ্ডেশ্বরী বন্ধ কর দে?"

"ফয়দা নেহি হোনে সে লস মে কিতনা দিন রান করেগা। ইয়ে লস ভরতে ভরতে আপনে দুসরে ধন্দা ভি চৌপট..."

"ওহ তো সহি বাত হ্যায়। ইয়ে তো আপনকা আসলি ধন্দা কভি নেহি থা"

"রাখি কা এক্সপোর্ট বিজনেস অভি ভি আচ্ছা চল রহা হ্যায়। ঔর পুরানে প্রমোটিং বিজনেস, ইয়ে কলকাত্তা মে ওহি মুনাফা দেগা, ঔর কুছ নেহি"

"বন্দ করনেকে পহেলে, মৃদুলদা সে বাতচিত করে?"

"চলো, উসে ফোন লাগাও"

ইন্দ্রজিৎকে ফোন করল গজেন্দ্র "এখনই আমার হো চি মিন সরণির ফ্ল্যাটে আসতে পারবে?"

"এখনই! ইজ ইট ভেরি আর্জেন্ট?"

“আর্জেন্ট”

“উইল জয়েন ইউ ইন হাফ অ্যান আওয়ার” কুড়ি মিনিট পরে গজেন্দ্রর ফ্ল্যাটে ঢুকে বলল “ব্যাপার কী? আর্জেন্ট তলব?”

“বস, কথা আছে। ড্রিঙ্ক খাবে?”

“নাঃ। ব্যাপারটা খোলসা করে বল-তো”

মনিকান্ত খুব ধীর শান্ত গলায় বলল “আমরা ঠিক করেছি, চামুণ্ডেশ্বরীর প্রোডাকশন উইংটা বন্ধ করে দেব”

“হঠাৎ?”

“বেশ কিছুদিন ধরেই এ নিয়ে কথাবার্তা চলছিল। ফিল্ম প্রোডাকশনে কোনও মুনাফা হচ্ছে না। লস হি লস। এই লস আর টানা মানে, আগুনে ঝাঁপ দেওয়া”

“হল আর ডিস্ট্রিবিউশন?”

“ওগুলো এখনও ছাড়ার কথা ভাবিনি। হিন্দি সিনেমা চালিয়ে এখনও কিছু রেভিনিউ আসছে। দেখা যাক কোথায় দাঁড়ায়। তুমি চামুণ্ডেশ্বরীর প্রোডাকশন উইংটা কিনবে? আউটরাইট ট্র্যান্সফার উইথ অল রাইটস। বন্ধ করার আগে তোমাকে অফার দিলাম”

“আমার অত টাকা কোথায়? কিছু হলের মালিকানা থাকলেও, ফিল্ম প্রোডিউস করে, হলে চালিয়ে, মুনাফা লোটার রেস্ত নেই”

“তাহলে বন্ধ করে দিই?”

“তাহলে তো রিল্যায়েন্স এন্টারটেনমেন্ট একচেটিয়া কন্ট্রোল নেবে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে”

“ওরা অনেক বড় গ্রুপ। রিল্যায়েন্সের কী টাকার অভাব? এত বিজনেসের মধ্যে এটা যদি নাও চলে, ওদের কিসসু যায় আসে না। দে ক্যান অ্যাফরড টু টেক এ রিস্ক, উই কান্ট”

“ইজ দ্যাট ইওর ফাইন্যাল ডিসিশন?”

“ফাইন্যাল। তুমি কিনলে, বন্ধু হিসেবে তোমাকেই দিতাম। না হলে স্টেকটা ওপেন মার্কেটে বিড করব। যে বেস্ট বিড দেবে, তাকেই বিক্রি করে দেব। আগে যদিওবা প্রফিট ভালই হত, এখন এই হাতি পোষা মানে, ডাহা লস”

“তোমরা কী করবে?”

“টাকাটা আমাদের অন্যান্য বিজনেসে ইনভেস্ট করব। অনেক বেশি মুনাফা”

ইন্দ্রজিতের মনে হল চামুণ্ডেশ্বরীর মতো, কলকাতার সব থেকে বড় ফিল্ম প্রোডাকশন ব্যানার যদি সরে যায়, বাংলা সিনেমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। সিনেমার বিনোদন মানুষ আর আগের মতো নিতে পারছে না। রিয়াল লাইফ বাধ্য করছে রিলের রূপকথা থেকে মুখ ফেরাতে। যতক্ষণ না নতুন জেনারেশন ভাল ছবি নিয়ে আসে, পাবলিক হলমুখো হয়। কিন্তু কোয়ালিটি ছবি প্রোডিউস করতে গেলে তো রেস্ত দরকার। এই বাজারে, কার এত আছে, এত টাকার রিস্ক নিয়ে ঢালার?

অন্ধকার হলেও, কোথায় যেন নতুন আলো। পতনের মধ্যেই তো উত্থানের বীজ। নিয়ম মতো কিছুই বেশিদিন শূন্য থাকে না। পূরণ হয়ে যায়। ব্যবসার বাইরেও তার বাঙালি মন বলছে, ভালই হল। বাংলা ছবি

আবার প্রাণ ফিরে পাবে। কিন্তু কী ভাবে? উত্তরটা অজানা হলেও প্রোগনোসিসটা যে মন্দের ভাল, সেই ভাবনাতেই তৃপ্তি। চিটফান্ড আগেই হাত গুটিয়েছে। এবার চামুণ্ডেশ্বরীও। যদি রিল্যায়েন্স এসে কোয়ালটি ছবি প্রোডিউস করতে পারে, ক্ষতি কী? কে গেল, কে এল, কীভাবে হল - এসব ভবিতব্যের ওপরই ছেড়ে দেওয়া যাক।

তেত্রিশ

বসুন্ধরার নতুন ছবি ‘স্ফুলিঙ্গ’-র কলকাতা প্রিমিয়ার। অন্যান্য তারকাদের মধ্যে প্রধান স্টার দেওয়ালিও হাজির। হলিউডে সাকসেস ও অস্কারের পর সব ক্যামেরার ফোকাস তার-ই দিকে। অল্প কিছুদিন হল লস এঞ্জেলস থেকে ফিরেছে। পুরস্কারের পর এই প্রথম কলকাতার রুপোলি দুনিয়ায়। পরিচিত টলিউড শিল্পী মহল ও রুটিন কলকাতার পেজ থ্রি সেলিব্রিটিরা কংগ্র্যাচুলেশনস জানাচ্ছে। মিডিয়া হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। ব্যবসা ধরে রাখার জন্য দেওয়ালির ছবি দরকার। সে এখন প্রতিদিনের পেজ থ্রি আলোকিত করা সেলিব্রিটি নয়। ট্যাবলয়েড ছেড়ে মেইন নিউজ হেডলাইন্স। বাংলার গর্ব। কলকাতার বাঙালি মেয়ে অস্কার জয় করে ফিরেছে। বিদেশে সম্মান পেলেই আমাদের পুজো পাবে। দেওয়ালিই বা বাদ যায় কেন? অস্তিত্ব উপেক্ষা করে, সাহেবদের স্বীকৃতিকে বরণ করে নেওয়া শতাব্দীর প্রথা। যে সে ব্যাপার নয়!

উৎসুক জনতাকে পেছনে ফেলে, লেন্সের ঝলকানি কাটিয়ে, আপার ব্যালকনিতে পৌঁছল। ছবি শুরু হওয়ার আগে বসুন্ধরা ছবিটা ইন্ট্রডিউস করতে গিয়ে বলল “দিস ইজ অ্যান এজ ওল্ড কনসেপ্ট, ডেপিক্টেড ইন গ্রিক মিথলজি, অ্যাবাউট প্রমিথিয়াস স্টিলিং ফায়ার ফ্রম মাউন্ট অলিম্পাস, ফর দ্য সার্ভিস অফ হিউম্যানিটি। দো দ্য কনসেপ্ট ইজ ইউনিভারসল, আই হ্যাভ অ্যাটেম্পটেড টু প্রেজেন্ট ইট উইথ মাই ওন স্টোরি, ইন দ্য লাইট অফ টুয়েন্টি-ফার্স্ট সেঞ্চুরি। আই হোপ ইউ উইল এনজয় মাই রেন্ডিশন। মে আই টেক দিস অপারটুনিটি অফ কংগ্র্যাচুলেটিং দ্য লিড অ্যাক্ট্রেস ইন দিস ফিল্ম দেওয়ালি, ফর হার রিসেন্ট উইনিং অফ অস্কার ইন হার হলিউড পারফরমেন্স ইন ফালক্রাম। অন বিহাফ অফ দ্য প্রোডাকশন টিম অ্যান্ড রেস্ট অফ আস হু আর প্রেজেন্ট হিয়ার, লেটস গিভ হার এ বিগ হ্যান্ড অফ অ্যাপ্লজ”

হাততালি। সিনেমা শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যেই দেওয়ালির মনে হল, প্রমিথিয়াসের স্ফুলিঙ্গ আনার গল্পকে সে এই ভারচুয়াল দুনিয়ার সামনে এনে কী প্রমাণ করতে চাইছে? এ তো অভিনয়। ছবির শেষে হাততালি পড়বে, ভাল রিভিউ লেখা হবে, প্রাইজও পেতে পারে। যে স্ফুলিঙ্গ সে খ্যাতির শিখরে বসে লস এঞ্জেলস থেকে তুলে এনেছে, সে তো শুধুমাত্র পুরস্কার নয়, আগামীর বুনিয়াদ। প্রমিথিয়াসের গল্পের মতো সেই স্ফুলিঙ্গ যদি জীবনেই প্রয়োগ করতে না পারল, তাহলে কী লাভ মুকুট পরে? সময়ের বিবর্তনে পুরস্কারের রোশনাই একদিন ম্লান হয়ে যাবে। পড়ে থাকবে কিছু স্মৃতি, বিস্মৃতির অতলে। সেখানে তার নাম না থাকলেও সে অনন্ত দেওয়ালি।

হল থেকে বেরিয়ে এল। কে ছবি দেখছে, কে তার গতি-প্রকৃতি অনুসরণ করছে, দেখার দরকার নেই। এগিয়ে যাওয়ার মধ্যে, অতীতের ধ্বংসের মধ্যেই ভবিষ্যতের ছবি। সময় হয়েছে। স্ফুলিঙ্গটা এবার দাবানল হয়ে জ্বলবে। এখনই উচ্ছ্বাস নয়। গাড়িতে বসেই প্রকাশদাকে ফোন “ফ্রি আছ? আমার ফ্ল্যাটে আসতে পারবে?”

প্রকাশকে ইতস্তত করতে দেখে বলল “বেহালা থেকে অনেক দূর, তাই না? ঠিক আছে। তুমি বেহালা চৌরাস্তার মোড়ে চলে এস। ওখান থেকে পিক করে নিচ্ছি”

আজ তো দেওয়ালির প্রিমিয়রের দিন। প্রকাশ বুঝতে পারছে না, এমন কী হল, দেওয়ালি দেখা করতে চায়? তবু যখন চেয়েছে, যেতেই হবে। মেয়েটার সঙ্গে যতবারই কোনও মিডিয়া কভারেজ করতে গিয়ে দেখা হয়েছে, ওর চোখে এমন কিছু দেখেছে, যা অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র। অস্কার তার নমুনামাত্র। এবার নিশ্চয়ই অন্য কিছু ভাবছে, প্রথার বাইরে। দেখাই যাক না...

ফ্ল্যাটে বসে বলল "ড্রিঙ্কস"

"হুইস্কি দিতে পারো" চুমুক দিয়ে বলল "প্রথমেই কংগ্রাচুলেশন জানাই অস্কার পাওয়ার জন্য"

"অস্কারের চেয়েও বড় কাজের জন্য তোমায় ডেকেছি। টাকা আর সম্মান তো আর ঘাটে নিয়ে যাব না। মরার আগে কিছু করে যেতে হবে"

"বালাই ষাট। মরতে যাবে কেন?"

"তোমাদের এই বাংলা টিভি চ্যানেলটা নিয়ে গণ্ডগোলের কথা শুনেছিলাম। কার কত স্টেক আছে"

"এখন আমার চ্যানেল নয়। ওখান থেকে বেরিয়ে ফ্রিল্যান্স করছি। চেন্নাই-এর চ্যানেল এক্সের ৮০% শেয়ার। বাকি কুড়ি বোধহয় ধূর্জটি রায়ের। তরুণ পাঁজারও শেয়ার ছিল ওর মধ্যে। জানি না, এখন আছে কি না। শুনেছিলাম ধূর্জটিকে বিক্রি করে সরে গেছে। সঠিক বলতে পারব না"

"আমি যদি চ্যানেলটা কিনে তোমাকে সিইও করি, তোমার পুরনো টিম দিয়ে চালাতে পারবে?"

"কেন পারব না? পুরনো টিমের সবার সঙ্গেই যোগাযোগ আছে। কিন্তু তুমি চ্যানেল কিনতে যাবে কেন?"

"এই সিস্টেমটায় ঘুণ ধরে গেছে। এটা সিস্টেমলেস। ভেঙে ফেলতে হবে। আমার একটা চ্যানেলের মালিকানা দরকার"

প্রকাশ বুঝল, দেওয়ালি কোনও বড় দাঁও চাইছে। যখন সে স্ট্রাগ্লিং দেওয়ালিকে প্রথম দেখেছিল তার থেকে অনেক তফাত। এখন ইন্টারন্যশনালি তার ফেম। টাকাও যথেষ্ট। শুধু বুঝতে পারছে না, কেন এখানে ঢালতে চাইছে।

"চ্যানেল এক্সের ফাইন্যান্স ডিরেক্টর কুট্টির সঙ্গে আমার অনেক দিনের পরিচয়। ওদের এই ইনভেস্টমেন্টটা ভেস্টেড। এখান থেকে ওদের কোনও রেভিনিউ নেই। ছেড়ে দিতে পারলে খুশি-ই হবে। আমি তোমার সঙ্গে কুট্টির একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফিক্স করে দিতে পারি। যদি এগ্রি করে, তোমার কাছে ৮০% এসে যাবে। বাকি রইল ২০%"

"ওটাও আমার চাই। দরকার হলে বেশি টাকা দেব ধূর্জটিকে। আমার ১০০% কন্ট্রোল চাই"

"তুমি আগে কুট্টির সঙ্গে কথা বল। রাজি হলে ৮০% স্টেক কিনে নাও। আমি ধূর্জটি সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়ে দেখি, কীভাবে ওর কাছ থেকে রাইটসটা কিনতে পারবে" সেকেন্ড পেগটা ঢালতে গিয়ে বলল "একটা কথা মাথায় ঢুকছে না, তুমি হঠাৎ এর মধ্যে জড়াচ্ছ কেন?"

"কাউকে তো একদিন স্টেপটা নিতেই হবে। এখনকার পজিশনে আমিই নিতে পারি, যদি তুমি পাশে থাক"

"আছি। কথা দিলাম"

প্রকাশ আলো দেখছে। মনে মনে অনেকদিন ধরেই ভাবছিল, এই ঘুণ ধরা অবস্থার পরিবর্তন দরকার। জ্বালিয়ে তছনছ করে দিতে হবে। দেওয়ালিই সেই স্ফুলিঙ্গ।

চেন্নাইতে ওদের হেড কোয়াটার্সে কুট্টির সঙ্গে দেখা করার সময় প্রকাশও ছিল। সব শুনে কুট্টি বলল "হোয়াই নট? উই আর গেটিং নাথিং ফ্রম আওয়ার ইনভেস্টমেন্ট দেয়ার। নো রেভিনিউজ। নো কন্ট্রোল টু রান ইট ইন আওয়ার ওন ওয়ে। নাইদার গেটিং আওয়ার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাক। উই আর অ্যাওয়ে ফ্রম ক্যালকাটা। ইট ইজ ডিফিকাল্ট টু টেক কন্ট্রোল ফ্রম হিয়ার। ইফ ইউ পে আওয়ার বেসিক ইনভেস্টমেন্ট, উই উড বি মোর দ্যান হ্যাপি টু সেল আওয়ার স্টেক। অফ কোর্স, আই হ্যাভ টু চেক উইথ দ্য চেয়ারম্যান। আই ডোন্ট থিংক দ্যাট উইল বি এ প্রবলেম"

"প্লিজ ডু অ্যান্ড কনফার্ম। আই ওয়ান্ট টু ফিনিশ দ্য ডিল হিয়ার বিফর আই ফ্লাই টু ক্যালকাটা"

মুম্বাই থেকে উকিলকে চেন্নাইতে ডেকে ইন্টারব্যাঙ্ক টাকা ট্র্যান্সফার করল। ডিল কমপ্লিট। দেওয়ালি বাংলা টিভির ৮০% স্টেক হোল্ডার।

রিটার্ন ফ্লাইটে প্রকাশ বলল "তরুণ শেয়ার ধূর্জটিকে বিক্রি করে কেটে পড়েছে। ওর সম্বন্ধে যেটুকু খোঁজ পেলাম, ওর সঙ্গে ওদের সিইও সৈকতের কোনও একটা ব্যাপারে কনফ্লিক্ট। এটাই রাইট টাইম। ও এই ঝামেলা এড়াতে চ্যানেলটা বিক্রি করে দিতে পারে। ওরও যখন বিশেষ ফায়দা হচ্ছ না। ওর এখন কম্পিউটারের ব্যবসায় বেশি লাভ"

"ফিডার পাঠিয়ে দেখ না যদি ছেড়ে দেয়। কিছু বেশিই দেব"

যদিও সৈকতের কাছে চব্বিশ ঘণ্টার সময় চেয়েছিল, ওকে এড়াবার জন্য কাজের ছুতো দেখিয়ে দিল্লি চলে গেছে। ভাবছিল এই আপদকে ঘাড় থেকে কী করে নামায়। মুখ খুললে, বড় রকম ফাঁসবে। অথচ ওর স্যালারি বাড়াতে গেলে লসে রান করা চ্যানেল আরও ডুববে। ঠিক সেই মুহূর্তে দেওয়ালির অফার এল।

"ফাইন। উনি যদি আমায় বেশি টাকা দেন, ওনাকে বিক্রি করতে কোনও আপত্তি নেই। তবে আমি ডিলটা কলকাতায় করব না। ঝামেলা হতে পারে। ওনাকে দিল্লিতে আসতে হবে"

দিল্লিতে স্টেক ছেড়ে টাকাটা নিয়ে ধূর্জটির মনে হল, ঘাড় থেকে আপদ নামল। এবার দেওয়ালির পাঁঠা। সৈকতের সঙ্গে বুঝে নিক। অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। যে রংবাজি সৈকত ওর সঙ্গে করছে ওর ভিডিওগুলো নিয়ে, সে তো আর দেওয়ালির সঙ্গে করতে পারবে না। মরুক গে। ওর কী?

বাংলা টিভির অফিসে চেয়ারম্যানের কাউচে দেওয়ালি সেক্রেটারি কাজরিকে বলল "এখন থেকে এই চ্যানেলের একশো ভাগ মালিক আমি। এই আমার পেপার্স" কাগজের কপিগুলো ওর হাতে দিয়ে বলল "প্রকাশবাবু এখন থেকে এই চ্যানেলের নতুন সিইও। এক ঘণ্টা পরে বোর্ডরুমে ডিউটি স্টাফ ছাড়া আর সবাইকে ডাক"

খবরটা পেয়ে সৈকত আর মৃন্ময় হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল।

"আই হ্যাভ টেকেন ওভার রাইটস অফ দিস চ্যানেল। ইওর সার্ভিসেস আর নো লঙ্গার রিকোয়ার্ড। থ্যাঙ্ক ইউ ফর ইওর সার্ভিসেস। ডিসমিসাল ডিউস উড বি পেইড"

"ধূর্জটি তো আমাকে কিছু বলেনি"

সৈকতের দিকে তীক্ষ্ণভাবে তাকিয়ে বলল "ওর সঙ্গে কথা বলে নিতে পারেন। পেপার্সের ফটোকপি কাজরির কাছে দেওয়া আছে। বোর্ড মিটিং-এ দেখিয়ে দেওয়া হবে। পুরনো স্টাফদের মধ্যে কে থাকবে, সেটা প্রকাশবাবু ঠিক করবেন। আপনারা আসতে পারেন। কিছু প্রশ্ন থাকলে, বোর্ড মিটিং-এ জানাবেন"

সৈকতের মাথায় বাজ পড়ল। এতদিন ধরে ছড়ি ঘুরিয়েছে। আজ এই বয়েসে চাকরি নেই। অস্কার জিতে মেয়েটা মাথা কিনে নিয়েছে। ওর ঘর থেকে বেরিয়ে মনে হল, ধূর্জটি চুপিচুপি তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। কিছুই করার নেই। ধূর্জটিকে শূলে চড়িয়েও লাভ হবে না। বরং তার সিনেমার প্রোডাকশনগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। যদিও ভেতরে ভেতরে রাগে ফুঁসছে, তবু চুপ করে মেনে নেওয়া ছাড়া কোনও গতি নেই।

মৃন্ময় জিজ্ঞেস করল "আমার কী হবে বস?"

"আগে নিজের গতি করি, পরে তোমার কথা ভাবব। এখন তোমাকে নিয়ে ভাবার সময় নেই"

"অমর্ত্যদাকে বললে হয় না?"

"অমর্ত্য এর মধ্যে জড়াবে না, যখন লিগ্যালি ওই মেয়েটা পুরো চ্যানেলকে কব্জা করেছে। বোর্ড মিটিং-এ শুনি কী বলার আছে। তারপর ভাবা যাবে"

বোর্ড হলে সবাই শুধু অস্কার পাওয়া নায়িকাকে দেখছে না, দেখছে তাদের নতুন মালকিনকে। এ মেয়ে শুধু স্ফুলিঙ্গতে অভিনয় করতেই জানে না, তাদের জীবনেও স্ফুলিঙ্গ।

ধ্রুবতারাও হতে পারে...

চৌত্রিশ

বাংলা টিভির অফিসে নিজের ঘরে সেক্রেটারিয়েট টেবলের উল্টো দিকে দেওয়ালি "কয়েকটা বেসিক পলিসির ব্যাপারে তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলার জন্য ডেকেছি"

"স্টাফিং-এর স্ট্রাকচারটা মোটামুটি ঠিক করে নিয়েছি। পুরনো সব মাস্টার লোকগুলোকেও ডেকে নিয়েছি। নাম্বার্স-এর ওপর জোর না দিয়ে কোয়ালিটির ওপর এম্ফাসিস দিয়েছি" প্রকাশ ইন শর্ট কাজের হিসেব দিল।

"ও দিকটা পুরোপুরিভাবে তোমার। তুমি যা ভাল বুঝবে, তাই করো। আমি শুধু তোমায় ডেকেছি, যে কারণে চ্যানেলটা কিনেছি, বলার জন্য"

"অনেকদিন ধরেই ভাবছিলাম। তুমি তো সিনেমার লোক, এখন হলিউডের অস্কার পাওয়া নায়িকা, হঠাৎ চ্যানেল কিনলে কেন? পরে মনে হল, সময় হলে নিজেই বলবে"

গলায় পার্লের নেকলেসটা নাড়াচাড়া করতে করতে বলল "চ্যানেলটা একটা আউটলেট মাত্র। এই স্ট্রাকচারে কিছুই হচ্ছে না। খালি পিঠ চাপড়ানো আর তোষামোদি। আমি চাই না, এই চ্যানেল নিজেদের কালচারাল পভার্টিকে ঢাকতে আরেকটা সেলিব্রিটি ইন্ডাস্ট্রি তৈরি করুক। প্রত্যেক স্ফিয়ারে অসংখ্য ট্যালেন্ট রয়েছে, যারা ব্রেক চায়। এই সব হাইপড সেলিব্রিটিদের পলিটিক্সের জন্য কোনও আউটলেট পাচ্ছে না"

ইন্টারকমে কফির অর্ডার দিয়ে বলল "যে কোনও ফিল্ড ধর, গান, সাহিত্য, সিনেমা, এই আপকামিং নেগলেক্টেড ট্যালেন্টদের ফোরফ্রন্টে আনো, যারা আর কোথাও ব্রেক পাচ্ছে না। আমি বিশ্বাস করি না, সে যুগেই ট্যালেন্ট ছিল, আর এ যুগে নেই। এ যুগেও আছে। খালি প্ল্যাটফর্ম দরকার"

"সে করা যাবে। তুমি কিন্তু বিশাল এক কমিউনিটির সঙ্গে ডিরেক্ট কনফ্লিক্টে যাচ্ছ"

"আমার কিচ্ছু আসে যায় না। ওদের আমি হ্যান্ডেল করে নেব। ওটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। তুমি শুধু খুঁজে বার কর, সেই ট্যালেন্টগুলো। যেমন ধর, যারা ভাল সুর দিচ্ছে, নতুন মিউজিক কমপোজ করছে। অথবা লো বাজেটে নতুন ভাল টেলিফিল্ম করতে পারে। ফাইন্যান্স আমি করব। যে সব কর্পোরেটের বাইরে উঠতি সাহিত্যিক, যারা লিটল ম্যাগাজিন বা ছোট প্রকাশনায় লিখছে, তাদের সামনে তুলে ধর। দলবাজি করে কালচারাল ডিগ্রেডেশন আজকের এই মিডিওক্রিটিরাই তৈরি করছে। ওদের সিন থেকে হাটাতে হবে। আমাদের চ্যানেলই পাবলিকের কাছে পৌঁছানোর একটা অ্যাভিনিউ"

"তাতে যদি স্পন্সারশিপ না পাওয়া যায়..."

কফিটা প্রকাশদার দিকে এগিয়ে বলল "নাও। তুমি যা বলছ ঠিক। স্পন্সারসিপ তো ব্র্যান্ডের ওপর আসে। তোমাদের ভাষায় যে ব্র্যান্ড বাজারে খাচ্ছে, সেটা কোনও পজিটিভ ব্র্যান্ড-ই নয়। আর্টিফিশিয়াল। আমরা ব্র্যান্ড তৈরি করব। আওয়ার এক্সক্লুসিভ অথেনটিক অরিজিনাল ক্রিয়েটিভ ব্র্যান্ড"

প্রকাশ বুঝতে পারছে, দেওয়ালি ঠান্ডা মাথায়, দাবার ঘুঁটি সাজাচ্ছে। শান্ত, দৃঢ়, ফোকাসড। প্রথমে ভেবেছিল হুজুগে চ্যানেলটা কিনে ফেলেছে। সদ্য অস্কার পেয়েছে, হলিউডে ছবি করে কিছু কামিয়েছে। হয়ত সেই যোশে দুম করে একটা চ্যানেল। এখন মনে হচ্ছে, না। ঝোঁকের বশে করেনি। ঠান্ডা মাথায় একের পর এক চাল সাজাচ্ছে। এ শুধু ভিত। গোড়াপত্তন। দেওয়ালির সেই সাহস আছে, ভেঙে আবার

গড়তে পারে। কথায় নয়, কাজেও। হঠাৎ সাকসেস আর পাঁচজনের মতো মাথাটা ঘুরিয়ে দেয়নি। সিনেমার ভারচ্যুয়ালিটি থেকে রিয়ালিটিতে দাঁড়িয়ে আছে।

মুচকি হেসে বলল “যেদিন তোমার প্রথম কভারেজ ছিল, সেদিন একজন স্ট্রাগ্লিং নায়িকাকে দেখেছিলাম। আজ এত সাকসেসের মধ্যে আমি কিন্তু তোমাকে আবার নতুন করে চিনছি। তোমার স্বপ্নে কদ্দুর সাহায্য করতে পারব জানি না। তবে সেন্ট পারসেন্ট চেষ্টা করব”

“সেজন্যেই তো প্রিমিয়ার ফেলে তোমাকে ডেকেছি। জানি, তুমি পারবে। আমি থাকতে কেউ তোমায় কিছু করার সাহস পাবে না। এখানে টাকা আর প্রতিপত্তি কথা বলে”

এ তো যে সে মেয়ে নয়। “আজ কফি খাওয়ালে। আমি একদিন স্যাম্পেনের বোতল খুলব” প্রকাশ চলে গেল।

মুচকি হাসল দেওয়ালি। প্রকাশদা কিছুটা চিনলেও, পুরপুরি চিনে উঠতে পারেনি।

সবাই তাকিয়ে আছে। সল্ট লেকের ম্যাগনো ইন্ডিয়ার অফিসে শোভনের ঘরের দিকে এগিয়ে চলেছে দেওয়ালি। চাপা নীল জিনস, সাদা টপস। সানগ্লাসটা গলার বেষ্টনী থেকে গাঢ় নীল পুতির মালার ওপর ঝুলছে। পরিচিত চিত্রাভিনেত্রী। ফিরে তাকানোই স্বাভাবিক। আগে যে এ অফিসে কোনও হিরোইন আসেনি, এমন নয়। দেওয়ালি আলাদা। বলিউড, হলিউড বিজয়ী আর কোনও অভিনেত্রীকে তো এর আগে এ অফিসে দেখেনি।

শোভন অবাক “তুমি! ফোন করনি তো?”

“এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম একবার দেখা করে যাই”

লক্ষ করল শোভনের সেক্রেটারিয়েট টেবিলের এপাশে মায়া ভট্টাচার্য। দেওয়ালিকে দেখে বলল “আস্কার পাওয়ার জন্য কংগ্র্যাচুলেশনস”

মোনালিসার মতো মিস্টিক হাসি “শোভনের সঙ্গে কিছু পারসোন্যাল কথা আছে” মানে কেটে পড়। মায়া বুঝেও না বুঝে, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে শোভনের দিকে তাকাল।

শোভনও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলল “এখনই?”

“হ্যাঁ এখনই”

“মায়া...” শোভনের ইঙ্গিত বুঝতে অসুবিধা হল না। তার জলহস্তীর মতো শরীরটাকে চেয়ার থেকে তুলে বলল “আমি তাহলে আসি। পরে দিগ্বিজয় তোমার সঙ্গে কথা বলে নেবে”

মায়া বেরিয়ে যেতেই, শোভন বলল “চা না কফি?”

“কফি ব্ল্যাক, চিনি ছাড়া”

“কেমন আছ? তোমার বলিউড-হলিউড করার জন্য তো আজকাল দেখাই হয় না”

“তাই জন্যেই তো নিজে দেখা করতে চলে এলাম” ভণিতা না করে শোভনের দিকে তাকিয়ে জোর দিয়ে বলল “যদি রাজীবদা অঞ্জনবাবুর মনীষীদের নিয়ে কেচ্ছা ছাপানো বন্ধ না করে, মোকাবিলাটা তোমার সঙ্গে হবে। তোমার রাজীবদাকে ব্যাক করা বন্ধ করতে হবে”

“আমি বললেই রাজীব শুনবে?”

“আলবাত। আজকের দিনে টাকা কথা বলে। তোমার ফাইন্যান্স বন্ধ হলে ওর অনেক বেশি ক্ষতি। ঠিক শুনবে। সেই সঙ্গে, অঞ্জনবাবুকে দিয়ে নিজের নামে বই লেখানো বন্ধ কর” একটু থেমে বলল “আই মিন ইট”

যেন আল্টিমেটাম দিচ্ছে। এই কী সেই দেওয়ালি, যাকে নিয়ে সে এক সময় ফুর্তি করত? কত পাল্টে গেছে। একদিন সে টাকা ছড়াত, দেওয়ালি তালে তাল মেলাত। আর আজ সেই দেওয়ালি তাকে আল্টিমেটাম দিচ্ছে। ভাবতেই পারছে না!

“হঠাৎ আল্টিমেটাম? সে তো তোমার কোনও ক্ষতি করেনি”

“আমার ক্ষতি করার ক্ষমতা অঞ্জনবাবুর নেই। কিছু সস্তা পপুলারাটির লোভে আগামী প্রজন্মের সর্বনাশ করছে। তুমি থামাবে, না আমি বন্ধ করব। আমি ফিল্ডে নামলে খুব ভাল হবে না। কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়বে” শোভন শুনেছে দেওয়ালি এখন বাংলা টিভির কর্ত্রী।

রণমূর্তি দেখে ঘাবড়ে “নাও, কফিটা খাও। ব্যাপারটা কী?”

“ব্যাপার কিছুই নয়। টাকার জোরে যে বদরক্ত ছাড়াচ্ছে তা এবার বন্ধ হওয়ার দরকার। তোমার আইডেন্টিটি ক্রাইসিস থাকতে পারে, সকলের নয়। যা তোমাদের ক্ষমতায় নেই, তাই টাকার জোরে মানুষের ওপর চাপাবার চেষ্টা করছ কেন? এটা কালচার নয়। শুধু জোর করে টিকে থাকার খেলা”

“কে না টিকে থাকতে চায়?”

“সবাই চায়। কিন্তু যে টিকে থাকার নেশায় একটা গোটা প্রজন্মকে পঙ্গু করে দিচ্ছ, এবার সময় হয়েছে তাতে দাঁড়ি টানার”

“তুমি কী হুমকি দিচ্ছ?” শোভন উত্তেজিত।

“এখনও নয়, ভালভাবে সত্যিটুকু বলছি। ভুলে যেও না, বালিতে যখন বাঁচা-মারার মাঝখানে খাবি খাচ্ছিলে, তখন আমিই তোমার পাশে ছিলাম”

“সে কথা ভুলি কী করে? কোনওদিন ভুলতে পারব না”

“অন্তত সেই কৃতজ্ঞতায় কথাটুকু রাখ। এতে তোমারই ভাল। নইলে এই আর্টিফিশিয়াল হাইপে একদিন আত্মহত্যা করবে। যা তোমার ক্ষমতায় নেই, তাকে নিয়ে ঢাক পিটিয়ে লাভ নেই। কিছু মোসাহেব টাকার জন্য মাথা নাড়বে। কিন্তু নিজের কাছ থেকে পালাবে কোথায়? শেষে, ওটাই কাল হবে। এখনও সময় আছে। তোমার ভালর জন্যে বড় সর্বনাশের হাত থেকে বাঁচবার জন্যেই”

সেদিনের উঠতি তারকা আজ দার্শনিকের মতো কথা বলছে। কম তারকা তো ঘাঁটেনি, ফুর্তি করেনি। একে ঠিক চিনতে পারেনি। যে সময় বালিতে জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে পাঙ্গা লড়ছিল, তখনই বোঝা উচিত ছিল। কৃতজ্ঞতা থাকলেও, চিনতে পারেনি। তাই বুঝি আজ চোখে আঙুল দিয়ে চেনাতে এসেছে। দেখছে... উত্তেজনা কমে যাচ্ছে, শ্রদ্ধা বাড়ছে।

“তোমার কী নেই? টাকা, বউ, ছেলে, সংসার সব-ই তো আছে। ওদের নিয়ে থাক না। এই চক্করে যাওয়ার কী দরকার? যা তুমি নও, কখনও হতে পারবে না। চেষ্টা করলে নিজের সর্বনাশ ছাড়া আর কিছুই হবে না”

আজ নক্ষত্র বলেই কি বড় বড় জ্ঞান দিচ্ছে? যদি না হত, তাহলেও কী এই কথাগুলোই বলত? কী হলে কী হত, ভেবে লাভ নেই। যা সামনে, সেটাই সত্যি। দেওয়ালি প্রমাণ করে দিয়েছে সে নক্ষত্র। শোভন নয়। চলে যাওয়ার পর চুপচাপ অফিসে বসে ভাবছে, মেয়েটা যে কথাগুলো বলে গেল, সত্যি হলেও, মন মানছে না। সজানো সাম্রাজ্য ছেড়ে তার বেরোবার ক্ষমতাই নেই। মুখে যাই বলুক না কেন, দেওয়ালি পারবে?

দিগ্বিজয়কে ফোন করল "তোমার বউ এই গেল। দেওয়ালি এসেছিল। প্রায় জোর করেই তাকে চলে যেতে বলল। ও আমাদের এসব বন্ধ করে দিতে চাইছে। এস সবাই মিলে একসঙ্গে ওকে কোণঠাসা করি"

"আমি নেই" দিগ্বিজয় হাত তুলে দিল।

"তুমি নেই মানে? সব সময় তো তোমরাই আমার পাশে ছিলে। আজ বলছ, তুমি নেই!"

"আজও আছি, তবে দেওয়ালির ব্যাপারে নয়। ছেড়ে দাও না। ও যা বলছে মেনে নাও। তাতেই আমাদের মঙ্গল"

ফোনটা রেখে বুঝতে পারছে না, হঠাৎ কী হল। কেউ দেওয়ালিকে ঘাঁটাতে চাইছে না কেন! চেনা অঙ্কগুলো গুলিয়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারছে না, কী সেই জাদু, যা দিয়ে সবাইকে বস করেছে। নিশ্চয়ই দেহ নয়।

"নাও, তোমার উপন্যাস রেডি" অঞ্জন রাজীবের দিকে ম্যানাস্ক্রিপ্টটা এগিয়ে দিল।

"কী উপন্যাস?"

"ওই যে বলেছিলাম না, জাম্পেস করে একখানা নভেল লিখব। নাম দিয়েছি 'রানির কোলে কৃষ্ণ'। দারুণ খাবে। গ্যারান্টিড বেস্টসেলার। এর আগে কেউ ছোঁয়নি"

"তুমি বরং প্রদীপ প্রকাশনীকে ছাপাতে বল"

"কেন? তুমি ছাপাবে না?"

"না... মানে ওদেরও একটু সুযোগ দাও"

"তুমি ছাপালে যা পাবলিসিটি পাবে, ও তার ধারে কাছে নয়"

"আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়"

"কেন? হঠাৎ কী হল? এর আগে তো আমার সব বই-ই..."

"আগের কথা ভুলে যাও। আর নয়"

"গল্পটা পড়ে দেখ। জমিয়ে লিখেছি। পরকীয়া দর্শনে..."

"বললাম তো, এসব আর হবে না। তাতে যদি প্রফিট না হয়, তবু ভাল। বিজনেসটাকে তো আর তুলে দিতে পারি না"

অঞ্জন বুঝতে পাচ্ছে না, হঠাৎ রাজীবের কী হল। এর আগে তো এভাবে কথা বলেনি। কোথাও থেকে কী হুমকি এসছে? কার অদৃশ্য হাত খেলছে বোঝা না গেলেও, বড় কোনও চাপে যে রাজীব কুপোকাত, বুঝতে পারছে। অথচ এতকাল এ সব কেচ্ছা ছাড়া আর বিশেষ কিছু লিখতেই পারেনি। এখন আবার নতুন করে কী লিখবে? হোয়েন ইট রেইন্স, ইট পোরস। শুধু রয়ালটি, ঘরে স্বকন্যা শঙ্করী, বুড়ো বয়সে জিরোবার জো নেই।

"বিয়ে করেছ, সুখে ঘর-সংসার কর" রাজীব আর কথা বাড়াল না। শোভনের প্রতিধ্বনি রাজীবের মুখে। ভদ্র হলেও, ভাষাটা খুব স্পষ্ট, এবার ফোট। কিন্তু যাবে কোথায়?

রাজীবের অফিস থেকে যখন বেরল, তখন সন্ধে। টিপটিপ বৃষ্টি ক্রমশ গাঢ়। চারদিক অন্ধকার। চেকমেট সিচুয়েশন। শোভন, রাজীব, সবাই এক। কালচারাল জোকার। সবই রিং-এর মধ্যে। কী কুক্ষণেই না মেয়েটার সঙ্গে ফুর্তি করতে গেছিল। ঘরের কাজকম্ম করুক, তবুও ভাল। শোবার কথা ভাবলেই অস্বস্তি হয়।

"খালি পেটে বেশি খেয়ে আউট হয়ে যেও না" শঙ্করীর চেতাবনি। অসহ্য...

"কিছু খাবার দিলেও তো পার"

"সারাদিন গা'টা ম্যাজম্যাজ করছিল। রান্না করা হয়নি। বাইরে যা বাদল, চুমকিকে কিছু আনতে পাঠাব, সে অবস্থাও নেই। রাতে পুষিয়ে দেব"

বাইরে ঝড় আরও তীব্র, আরও ভয়াবহ। ভেঙে পড়তে চাইছে। আরও কয়েকটা পেগ। তড়িঘড়ি শুয়ে পড়ল।

"খাবে না?" জবাব নেই। গোসা হয়েছে ভেবে শঙ্করী নিবিড়ভাবে পাশে শুয়ে জড়িয়ে ধরল। বাইরের ঝড় যেন ভেতরে। শাড়ি সায়া খুলে ফেলেছে। হাতছানি, বাসনার রুদ্ধদ্বারে। নেশার ঘোরে অঞ্জনের মনে হল, এ তো প্রেমের চুম্বন নয়। সাপের নিঃশ্বাস। সিভাস রিগ্যাল তখন মগজে আগুন ঢালছে। পালাতে হবে। মুক্তি চাই। আচমকা অনুভব করল, তার আর কোনও প্রলোভন নেই, ক্ষমতাও নেই। প্রয়োজন ফুরিয়েছে। ঘূর্ণির দাপটে দিশাহারা। কানের কাছে, আপদের হিসহিস। শক্তিও নেই। শরীরী বিষের ছোবলে খড়কুটোর মতো ভেসে যাওয়া ছাড়া গতি নেই। ঢোড়া সাপের মতো অসহায়। নেতিয়ে পড়ল।

পঁয়ত্রিশ

রাজাবাজার সাইন্স কলেজ থেকে যখন দেওয়ালি বেরিয়ে এল, তখন সন্ধে হয়ে গেছে। প্রসাধন প্রায় নেই। বেণিটা ছড়ানো। পায়ে হাওয়াই। কাঁধে শান্তিনিকেতনি ঝোলা। দেখে মনেই হয় না, হলিউডের অস্কার পাওয়া নায়িকা।

মাথাটা ঝিমঝিম করছে। নতুন কিছুই পড়েনি। এত বছর পরে, ভুলে যাওয়া কেমিস্ট্রিটা আবার ঝালিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিল। একদিনে তো হবে না। বেশ কিছুদিন লাগবে, সব কিছু ঝালিয়ে, আবার পুরনো রুটিনে ফিরে যেতে। অনেকগুলো বছর পার হয়ে গেছে। বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে না...

"কোন দিকে যাব?"

"গঙ্গার ধারে"

ট্র্যাফিক জ্যামের মধ্যে গাড়িটা যখন শামুকের মতো এগোচ্ছে মনে মনে ডাঃ সংঘমিত্রা চক্রবর্তীকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারল না।

"হঠাৎ এত বছর পর? তুমি তো সিনেমা করে অনেক নাম কুড়িয়েছ। ফিরে আসতে চাইছ কেন?"

"ছোটবেলা থেকে ডক্টরেট হতে চেয়েছিলাম, পোস্ট-ডক রিসার্চ নিয়ে থাকতে চেয়েছিলাম, হিরোইন হতে নয়। মাঝখানে হঠাৎ কী যে হয়ে গেল। সিনেমায় সুযোগ। ভাগ্যও ফেভার করল। এখন মনে হচ্ছে, এখানেই আমার জায়গা"

"এত বছর পরে রি-ইনস্টেট করা ডিফিকাল্ট। দেখি, প্রো-ভিসি বিশ্বজ্যোতি ব্যানার্জি আর ভিসি নিরঞ্জন দত্তর সঙ্গে কথা বলি। ওরা যদি স্পেশাল কেস হিসেবে অ্যালাউ করে" এইচওডি বললেন। সংঘমিত্রাদির তাদারকিতে শেষ পর্যন্ত ইউনিভার্সিটি পুনর্বহাল করল। ফুল টাইম দিতে হবে। তাতেই রাজি দেওয়ালি।

স্ট্র্যান্ড রোডে পৌঁছে ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল "কোথায় যাব?"

বাঁ দিকে ছড়ানো নদীর দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ চুপ "ফ্লোটেল"

নদীতে ভাসমান ফ্লোটেলের দ্য অ্যাংকরেজে আলো-আঁধারি কোনায় বসে পড়ন্ত বেলায় শুনতে পাচ্ছে, জলের শব্দ... আঃ...

কতদিন এভাবে বসেনি। অ্যাপয়েন্টমেন্টস, পার্টি, ডেটস, শুটিং, অ্যাওয়ার্ডস... সোনার খাঁচায় বন্দি জীবন। প্রতি মুহূর্তে হিসেব মেপে পদক্ষেপ... অ্যাম্বিয়েন্সটা ভালই লাগছে। স্টুয়ার্ড অর্ডারের অপেক্ষায় "ভাল ফ্রেঞ্চ ওয়াইন কী আছে?"

"ভিগ্নেস ডি' পল ভ্যালমন্ট ব্ল্যাংক বা লং স্যাম্পস ব্ল্যাংক"

"ব্ল্যাংকের সঙ্গে স্ন্যাক্স কী পাওয়া যাবে?"

"স্মোকড চিকেন টারট দিই। খেয়ে দেখুন, ভালই লাগবে"

"বেশ, তাই দাও"

স্টুয়ার্ড অর্ডার নিয়ে চলে যেতে, ফিরে তাকাল জলের দিকে। কিছুক্ষণ আগে জমে ওঠা মেঘটা সরে গেছে। দিনের আলো হারিয়ে যাচ্ছে সন্ধ্যার আকাশে। গঙ্গার ওপর বিদায়ের শেষ আভা। নিঃশেষ অর্থহীন

আলোর বর্ণ। অন্ধকার সেজে উঠছে, নতুন রূপে, আভরণে। তারাগুলো সন্ধ্যার আঁচলে মায়াময়।

গ্লাসে ওয়াইন... কিছুক্ষণ...

গঙ্গার জলে কালচে ঝিলিক। দূরে নৌকোটা আবছায়ায় ক্রমশ ক্ষীণ। আজ কী পূর্ণিমা? এখানে কোনও পাগলের মুনলিট সোনাটা নেই। মাঝির গলা ফাটানো ভাটিয়ালি নেই। তবু ভরপুর...

ওয়াইনে অলস চুমুক। বিস্তীর্ণ অন্ধকারের মধ্যে টিমটিম আলোগুলো জ্বলছে। তার চাওয়া, নতুন স্ফুলিঙ্গ, উত্তরণের সোপান। এখানে অনেক কম্ফর্ট। দূরে কোথাও একটা সাইরেন, লঞ্চের ভোঁ তোড়জোড় চলছে কোথাও যাওয়ার। দেওয়ালির তাড়া নেই। আবর্ত থেকে স্ফুলিঙ্গের মতো ছিটকে বেরিয়ে এসেছে। মহাশূন্যে। শান্তির কোলে। শুধু পূর্ণতার ক্যাডেন্সে শ্যাম কল্যাণ বাজছে। নতুন আমেজ।

"স্মোকড চিকেন টারট" বেয়ারা সাজিয়ে দিল "আর কিছু?"

"এখন না। পরে..."

রাস্তার ওপাশের ঝলমলে স্টেট ব্যাঙ্কের আলোর দিকে ফিরে তাকাতে মন চাইছে না। ছোটার টানে ভুলেছিল গন্তব্য। বসুন্ধরার প্রমিথিয়াসের 'স্ফুলিঙ্গ' চিনিয়েছে তাকে। র‍্যাট রেসের বাইরেও একটা নিশানা আছে, যা জ্বলতেও পারে। অবক্ষয়ী উন্মাদনার বাইরে মহাবিশ্বের অজানা তারা হয়ে। দূরে দিগন্তে তাকিয়ে। সে আবিষ্কার করেছে পূর্ণতাকে। কে বুঝল বা বুঝল না, তাতে কী?

ব্যাগ থেকে মোবাইলটা বার করে সিএলআই দেখল, প্রকাশদা।

ক্রিং... ক্রিং... ক্রিং... বেজেই চলেছে।

কয়েক মুহূর্ত...

মোবাইলটা ছুড়ে দিল। গঙ্গার জলে।